মাসুদ রানা

হামলা

দুইখণ্ড একত্রে

কাজী আনোয়ার হোসেন

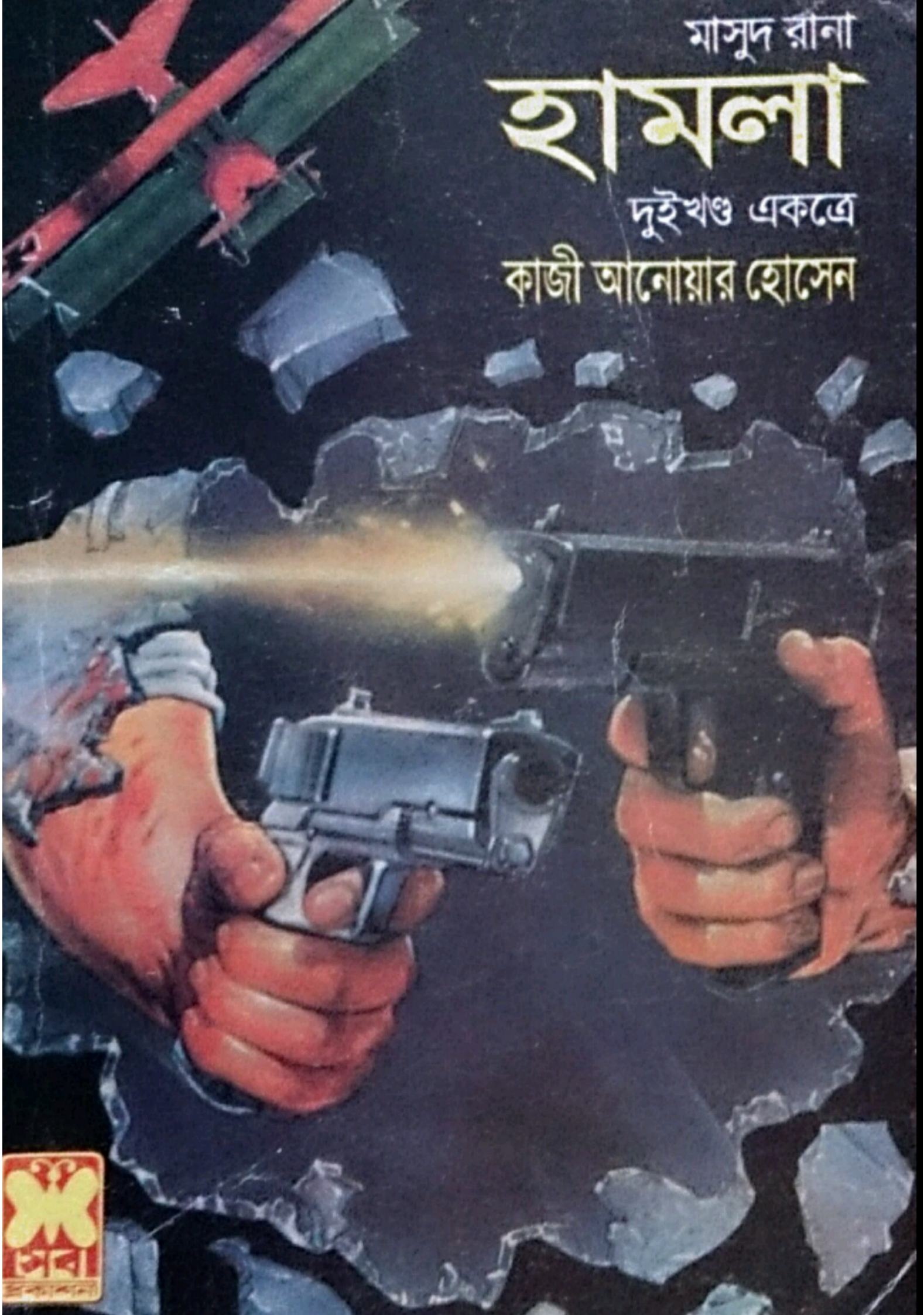

সেবা

মাসুদ রানা

হামলা

[দুইখণ্ড একত্রে]

কাজী আনোয়ার হোসেন

ফ্লাইং বোট ক্যাটালিনা চালিয়ে ঈজিয়ান সাগরে
নোঙর ফেলা একটা জাহাজের দিকে যাচ্ছিল মাসুদ রানা।
এমনি সময়ে বেতারের মাধ্যমে এল সাহায্যের
আকুল আবেদন। গ্রীক দ্বীপ থাসোসে অবস্থিত
মার্কিন বেশ 'ব্র্যাডি এয়ারফিল্ড' নাকি আক্রান্ত হয়েছে।
মান্ধাতা আমলের এক অজ্ঞাত-পরিচয়
বাই-প্লেন নাকি হামলা চালিয়েছে—
একের পর এক ধ্বংস করে দিচ্ছে গ্রাউণ্ডে দাঁড়ানো
ওদের অত্যাধুনিক প্লেনগুলো। অবিশ্বাস্য!

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
সেবা শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
প্রজাপতি শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মাসুদ রানা

হামলা

(দুইখণ্ড একত্রে)

কাজী আনোয়ার হোসেন

সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০
ISBN 984-16-7105-0

প্রকাশক
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

সর্বস্বত্ব: প্রকাশকের

প্রথম প্রকাশ: ১৯৮২

রচনা: বিদেশী কাহিনি অবলম্বনে

প্রচ্ছদ: বিদেশী ছবি অবলম্বনে
মনবীর আহমেদ রিপন

সমন্বয়কারী: শেখ মহিউদ্দিন

পেস্টিং: বি. এম. আসাদ

মুদ্রাকর
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

হেড অফিস/যোগাযোগের ঠিকানা
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৮৩১ ৪১৮৪
সেল্ফ ফোন: ০১১-৯৯-৮৯৪০৫৩
জি. পি. ও. বক্স: ৮৫০
mail: alochonabibhag@gmail.com

একমাত্র পরিবেশক
প্রজাপতি প্রকাশন
২৪/৪ কাজী মোতাহার হোসেন সড়ক
সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০

শো-রুম
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৭২১-৮৭৩৩২৭
প্রজাপতি প্রকাশন
৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবাইল: ০১৯১৮-৯৯০২০৩

Masud Rana
HAMLA
Part: I & II
A Thriller Novel
By: Qazi Anwar Husain

সেবা প্রকাশনী

আটান্ন টাকা

হামলা-১

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

এক

জামাই আদর বোধহয় একেই বলে! না চাইতেই তিন বেলা রাজকীয় খানাপিনা। সিগারেট আর মদ এক রকম ছেড়েই দিয়েছে মাসুদ রানা, তবু ঘরে ওসবের কোন অভাব রাখা হয়নি। মেঝেতে দামী কার্পেট, দেয়ালগুলো মখমলের পর্দা দিয়ে আড়াল করা। সংলগ্ন বাথ, সেখানে ঠাণ্ডা এবং গরম দু'রকমের শাওয়ারের ব্যবস্থা। ঘরটাও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। শুধু ইন্টারোগেশনের সময়টা ছাড়া সি.আই.এ. অফিশিয়ালরা সবাই অত্যন্ত নম্র আর ভদ্র ব্যবহার করছে ওর সাথে। ঘরের ভেতর খাট, নরম বিছানা—ইচ্ছে করলে সারাটা দিন শুয়ে বসে কাটাতে পারে ও, কেউ আপত্তি করবে না। চিত্তবিনোদনের জন্যে একটা হাই-ফাই থ্রী-ইন-ওয়ান স্টেরিও সেট এবং একগাদা ক্যাসেট আর রেকর্ড দেয়া হয়েছে, সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে গান শুনতে কোন অসুবিধে নেই। এক দিকের প্রায় পুরোটা দেয়াল জুড়ে মস্ত বুক শেলফ, তাতে ঠাসা রয়েছে রাজ্যের মজার মজার বই। কালার টিভিও আছে, স্টেশন বেছে নিয়ে যে কোন ছবি বা গানের অনুষ্ঠান দেখা যেতে পারে। জামাই আদর আর কাকে বলে? কিন্তু রানার ধারণা ঠিক উল্টো। ওর আশঙ্কা, এত আদর-যত্ন করা হচ্ছে ওকে মেরে ফেলা হবে বলেই।

ওয়াশিংটন। সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর হেডকোয়ার্টার।

আজ তিন দিন হলো সি.আই.এ-র হাতে আটকা পড়েছে সে। একটু লম্বাটে, মাঝারি আকারের একটা কামরা। পিছনে হাত বেঁধে কার্পেটের ওপর অনবরত পায়চারি করছে ও। কপালে চিন্তার রেখা। মাঝে মধ্যে আড়চোখে তাকায় টেলিফোনটার দিকে। আজও বার কয়েক চেষ্টা করে দেখেছে, কিন্তু হেডকোয়ার্টারের বাইরে লাইন চাইলেই অপরপ্রান্ত থেকে 'দুঃখিত' বলে রিসিভার নামিয়ে রেখেছে অপারেটর। জানালা এবং দরজাগুলোও পরীক্ষা করে দেখেছে ও, বাইরে থেকে বন্ধ সব। শুধু তাই নয়, করিডরে সশস্ত্র পাহারাও আছে। তার মানে, বাইরের দুনিয়ার সাথে যোগাযোগ করবে, তার কোন উপায় নেই। সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারে বন্ধুর সংখ্যা কম নয় রানার, কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে এখানে পৌঁছে অবধি তাদের কারও ছায়াও দেখতে পায়নি ও। চক্ষুলজ্জা বা অন্য যে-কোন কারণেই হোক, তারা কেউ ওর কাছে ঘেঁষতে রাজি নয়। বুঝতে অসুবিধে হয় না, নিজ দেশের স্বার্থের ব্যাপারে সি.আই.এ. এজেন্ট বা অফিশিয়ালরা সবাই আপোষহীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বেঈমানী করেছে রানা, কর্তৃপক্ষের এই ধারণার সাথে তারাও সম্ভবত সবাই একমত। কাজেই যতই কিনা বন্ধুত্ব থাকুক,

ওকে শায়েস্তা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হলে সিদ্ধান্তটাকে একবাক্যে সমর্থন জানাবে তারাও। ভেবেচিন্তে তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার আশা আটচল্লিশ ঘণ্টা আগেই ত্যাগ করেছে রানা।

সাহায্য অবশ্য কোথাও থেকেই পাবার কোন আশা নেই। বি.সি.আই. বা রানা ইনভেস্টিগেশন জানেই না ঠিক এই মুহূর্তে কি অবস্থায়, কোথায় আছে ও। বন্ধু-বান্ধব, শুভানুধ্যায়ী সবাই জানে রানা কোন একটা ব্যাপারে সাহায্য করছে সি.আই.এ-কে। অটারে চড়ে আর্কটিক থেকে গ্রীনল্যান্ডের থিউলে, সেখান থেকে মার্কিন বিমান বাহিনীর একটা জেটে চড়ে ওয়াশিংটন পৌঁছায় ও। গোটা ব্যাপারটা গোপন রাখা হয়েছে। রানা যে ব্যর্থ মিশন নিয়ে ফিরে এসেছে সেটা কাকপক্ষীকেও টের পেতে দেয়নি সি. আই. এ.।

ওকে নিয়ে ঠিক কি করা হবে, এখনও পরিষ্কার বুঝতে পারছে না রানা। সি.আই.এ. কর্মকর্তাদের ধারণা, তাদের সাথে বেঈমানী করেছে রানা। কিন্তু ওটা শুধু একটা ধারণা মাত্র, ওদের হাতে কোন তথ্য-প্রমাণ নেই। কিন্তু তথ্য-প্রমাণ না থাকলেও ওরা যদি নিঃসন্দেহে উপলব্ধি করে যে বিজ্ঞানী সেসলভের যুগোস্লাভিয়া চলে যাবার পিছনে রানার হাত ছিল, তাহলে এর একটা ব্যবস্থা ওরা নেবেই। গোটা ব্যাপারটা প্রথম থেকে আরেকবার স্মরণ করল ও। আশা, ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করলে কপালে কি আছে তার হয়তো একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।

অস্ত্রের মুখে নির্জন আর্কটিক বরফের ওপর পাইলটকে প্লেন নামাতে বাধ্য করল পেরী কংকর। সেই নোভাইয়া জেমলাইয়া থেকে প্রায় দুশো মাইল পাড়ি দিয়ে এসেছে মিশনটা, সারাটা পথ স্কি-ডুতে এমন ঘুমই ঘুমিয়েছেন প্রফেসর সেসলভ যে কুম্ভকর্ণও হার মানবে, অথচ প্লেন ল্যান্ড করতেই ঘুম থেকে জেগে উঠে দিব্যি পায়ে হেঁটে নেমে গেলেন তিনি। কেউ লক্ষ্য করল না, যাবার আগে রানার উদ্দেশ্যে একটা চোখ টিপল কংকর। কাছেই অপেক্ষা করছিল একটা যুগোস্লাভ প্লেন, তাতে গিয়ে চড়ল ওরা। দেখতে দেখতে আকাশে উঠল সেটা, দ্রুত গায়েবও হয়ে গেল দিগন্ত রেখার ওপারে। এরপর আর অপেক্ষা করার কোন মানে হয় না, কাজেই অটারের পাইলটও টেক-অফ করল। পথে আর কিছু ঘটেনি, সোজা থিউলে পৌঁছুল প্লেন। সবার সাথে নিচে নামল রানা, সাথে সাথে গ্রেফতার করা হলো ওকে। কারণ জানতে চাইলে বলা হলো, ওয়াশিংটনে পৌঁছুলেই সব জানতে পারবেন। বাকি সবাইকে কিভাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হলো বলতে পারবে না রানা, ওকে শুধু তুলে দেয়া হলো মার্কিন বিমান বাহিনীর একটা জেট প্লেনে। বিপদ টের পেলেও, পালাবার কথা ভাবেনি রানা, ভাবলেও কাজ হত বলে মনে হয় না। প্লেনে চড়ে পাঁচজন সশস্ত্র গার্ডকে আবিষ্কার করেছিল ও। জিজ্ঞেস করেও কোন কথা আদায় করতে পারেনি তাদের কাছ থেকে। ওয়াশিংটনে পৌঁছুল প্লেন, দরজা খুলে গেল, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে শুরু করে রানা দেখল, টার্মিন্যাল ভবন থেকে অনেক দূরে থামানো হয়েছে প্লেনটাকে, কাছেপিঠে সিভিলিয়ানদের ছায়া পর্যন্ত নেই। সিঁড়ির নিচে কালো একটা মার্সিডিজ অপেক্ষা করছিল ওর জন্যে, পিছনের সীটে সাদা পোশাক পরা তিনজন দৈত্য। একজনকেও চিনতে পারল না, কিন্তু দেখেই বুঝল, সি.আই.এ। গাড়িতে তোলা হলো ওকে। বিশ মিনিট পর সেন্ট্রাল

ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর হেডকোয়ার্টারে ঢুকল মার্সিডিজ। দৈত্যরা এই কামরায় রেখে গেল ওকে। বিশ্রামের কোন সুযোগ দেয়া হয়নি, পাঁচ মিনিট পরই দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল চারজন কর্মকর্তা।

শুরু হলো ইন্টারোগেশনের পালা। আরম্ভ হলো সকাল আটটায়, বেলা দুটো পর্যন্ত চলল একটানা। তারপর মাত্র আধঘণ্টা বিরতি দিয়ে আবার শুরু হলো, চলল রাত এগারোটা পর্যন্ত। প্রথমে গল্পচ্ছলে তোলা হলো প্রসঙ্গটা। কিন্তু রানা বুঝেও না বোঝার ভান করছে দেখে সরাসরি প্রশ্ন করল ওরা। প্রফেসর সেসলভকে হাতের মুঠোয় পেয়েও ধরে রাখতে না পারার জন্যে মিশনের লীডার হিসেবে নিজেকে কতটুকু দায়ী বলে মনে করে রানা? রানাও সরাসরি উত্তর দিল, এতটুকু দায়ী নয় সে। প্রশ্ন করা হলো, কিন্তু মি. রানা, তুমিই তো পেরী কংকরকে নির্বাচন করেছিলে? সে বেঈমানী করল, এর জন্যে তুমি দায়ী নও তো কে দায়ী? রানা বলল, কংকরকে নির্বাচন করেছিলাম, কারণ তার মত দক্ষ ড্রাইভার ও মেকানিক হয় না। বেঈমানীর কথা যদি বলো, কেন, তোমরা তার ডোশিয়ার চেক করে দেখোনি? নিশ্চয়ই চূড়ান্ত নির্বাচনের আগে তন্ন তন্ন করে সম্ভাব্য সব রকম খোঁজখবর নিয়েছিলে। কিন্তু সন্দেহ করার মত কিছু পাওনি বলেই মিশনে তাকে নেবার ব্যাপারে তখন কোন আপত্তি তোলোনি। তোমাদের নিজেদের ভুল আমার কাঁধে চাপাবার চেষ্টা করছ তোমরা। সি.আই.এ-র মত এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান ভুল করতে পারে, সামান্য মাসুদ রানা পারে না? আবার প্রশ্ন, আমরা ধরতে পারিনি কংকর যুগোস্লাভ সিক্রেট সার্ভিসের লোক, কিন্তু তুমি জানতে, তাই না? উত্তর, না। প্রশ্ন, যুগোস্লাভিয়ার এতবড় উপকার করে দিলে, নিশ্চয়ই কিছুর বিনিময়ে—কি সেটা? উত্তর, আমি যুগোস্লাভিয়ার কোন উপকার করিনি। প্রশ্ন, প্রফেসর সেসলভ শেষের দিকে ঘুমের ভান করে পড়েছিলেন, তা তুমি জানতে? উত্তর, না। প্রশ্ন, ইচ্ছে করলে কংকরকে তুমি বাধা দিতে পারতে, দাওনি কেন? উত্তর, বাধা দিতে পারতাম না, কারণ আমার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না।

এই ধরনের এক হাজার একটা প্রশ্ন, এবং একটা প্রশ্ন হাজার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করা হলো। প্রতিবার সেই একই উত্তর বেরিয়ে এল রানার মুখ থেকে। ওর দৃঢ়তা দেখে মনে হলো, ভাঙবে তবু মচকাবে না। কিন্তু ওরাও সি.আই.এ-র কর্মকর্তা, হাল ছাড়বার পাত্র নয়। পরদিন সকালে আবার শুরু করল জেরা। এবার অন্য কায়দা ধরল ওরা। প্রথমেই জানিয়ে দিল, রানা যে এখানে আটকা পড়ে আছে সে-কথা বাইরের দুনিয়ার কারও জানা নেই। এটা যে একটা হুমকি, বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার। কথাটা বলে আসলে জানিয়ে দেয়া হলো, ওকে নিয়ে ওরা যা-ই করুক না কেন, বাইরের কেউ কোনদিন সেটা জানতে পারবে না। তারপর আভাস দিল, রানা যদি আসল কথাটা স্বীকার করে তাহলে হয়তো লঘু দণ্ড পেয়ে এ-যাত্রা বেঁচে যেতে পারে। আর যদি ভোগায়, তাহলে ওর কপালে আর বোধহয় বাইরের দুনিয়া দেখার সুযোগ ঘটবে না। এরপর নতুন করে শুরু হলো জেরা। সেই পুরানো প্রশ্ন। রানারও সেই একই উত্তর। তিন ঘণ্টা চেষ্টা করার পর ওরা বুঝল, এভাবে হবে না। নতুন পদ্ধতি ধরল এবার। মেডিসিনের সাহায্য নিল, উদ্দেশ্য রানার ইচ্ছেশক্তিকে দুর্বল করে তোলা। এরপর সম্মোহিত করা হলো

ওকে।

এর জন্যে আগে থেকেই তৈরি থাকে বি. সি. আই. এজেন্টরা। সম্মোহিত অবস্থায় কোন গোপন তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে ভেবে আগেই সবাইকে পোস্টহিপনোটিক সাজেশন দিয়ে রাখা হয়। ফলে ওকে সম্মোহিত করেও কোন সুবিধে করতে পারেনি ওরা।

আজ সকাল থেকে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, কিন্তু বিকেল হতে চলল অথচ এখন পর্যন্ত কারও দেখা নেই। সেজন্যেই মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে ও। ওকে ছেড়েও দিচ্ছে না, নতুন করে জেরাও করছে না, ব্যাপারটা কি? তবে কি চরম কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ওরা? সেজন্যেই কি এত দেরি হচ্ছে? মত-বিরোধ দেখা দিয়েছে নিজেদের মধ্যে? অতীতে সি.আই.এ. তথা যুক্তরাষ্ট্রকে ঠেকায়-বেঠেকায় অনেক সাহায্য করেছে ও, সে-কথা এত তাড়াতাড়ি ওদের ভুলে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সাথে সাথে নিজেকে সাবধান করে দিল রানা, কিছু আশা করা উচিত হবে না। অতীতে যা-ই ঘটে থাকুক, রানার দোষ সম্পর্কে স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই থাকুক, ওরা যদি বিশ্বাস করে রানা ওদের সাথে বেঈমানী করেছে, তাহলে শাস্তি ওরা দেবেই।

অসহায় বোধ করল রানা। কোনভাবে রানা ইনভেস্টিগেশন বা বি. সি.আই-কে যদি একটা খবর দেয়া যেত! পায়চারি থামিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিল ও। অপরপ্রান্ত থেকে জানতে চাইল অপারেটর, বলুন। একটা নাম্বার দিল রানা, বলল, জরুরী, তাড়াতাড়ি কানেকশন দাও। সাথে সাথেই 'দুঃখিত' বলে রিসিভার রেখে দিল অপারেটর।

অদ্ভুত একটা অস্থিরতা পেয়ে বসল রানাকে। পায়চারি করতে করতে দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল টেবিলের ওপর।

বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হলো। তারপর রাত। রাত গভীর হলো। কর্মকর্তারা কেউ ঢুকল না ওর কামরায়। খাবার নিয়ে এসেছিল দু'জন, একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিল না তারা। করিডরে গার্ডের সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে, নিজের চোখেই দেখল রানা। খাবার রেখে চলে গেল তারা, আবার বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

সারাটা রাত পায়চারি করে কাটাল রানা। কেউ এল না। পরদিন সকালেও কারও দেখা নেই। এই প্রথম অন্য ধরনের একটা চিন্তা ঢুকল রানার মনে—ওর ওপর আসলে মানসিক অত্যাচার চালাতে শুরু করেছে ওরা। এরপর ফিজিক্যাল টরচার করবে।

ব্রেকফাস্টের পর অপারেটরকে জানাল রানা, 'সি.আই.এ. ডিরেক্টর এ. পি. কলভিনের সাথে কথা বলতে চাই।'

'এক মিনিট, স্যার,' সময় জানতে চাইল অপারেটর। ঠিক ষাট সেকেন্ড পর জানাল, 'দুঃখিত, স্যার। চীফ অফিসে নেই।'

'কোথায় গেছেন বা কখন ফিরবেন, খবর নিয়ে জানাও আমাকে।'

খানিক পর অপারেটর বলল, 'আপনি স্যার মি. উইলবারের সাথে কথা বলুন।'

উইলবার স্মীথ একজন কর্মকর্তা বটে, কিন্তু তার সাথে কথা বলার কোন ইচ্ছে নেই রানার। সরাসরি এ.পি. কলভিনকে জিজ্ঞেস করতে চায় ও, ওকে

এভাবে আটকে রাখার মানে কি? কিন্তু রিসিভার নামিয়ে রাখার আগেই অপরপ্রান্ত থেকে উইলবারের গলা পেল ও, 'মি. রানা?'

'মি. কলভিনের সাথে কথা বলতে চাই আমি।'

'দুঃখিত, মি. রানা,' উইলবার সবিনয়ে জানাল। 'পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করুন, প্লীজ। উনি এখন আপনার নাগালের বাইরে। আপনার যদি কিছু বলার থাকে, আমাকে বলতে পারেন।'

তার মানে, কলভিন অফিসেই আছেন, কিন্তু রানার সাথে তিনি কথা বলতে রাজি নন।

খটাস্ করে রিসিভার নামিয়ে রাখল রানা। কলভিন কথা বলতে চাইছেন না, তার মানে, ওর ব্যাপারে চরম কোন সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে ওরা। রানাকে অনেক দিন থেকে চেনেন সি.আই.এ. চীফ, নিজেকে দাবি করেন মেজর জেনারেল রাহাত খানের বিশেষ বন্ধু বলে, অথচ সেই ভদ্রলোক মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন! এই প্রথম শুধু উদ্বেগ নয়, রীতিমত ভয় ভয় লাগল রানার। তবে কি অসহায়ভাবে মরতে হবে ওকে? আবার পায়চারি শুরু করল ও। নিষ্ফল রাগে শক্ত মুঠো হয়ে গেছে হাত দুটো।

ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সী। সংক্ষেপে, নুমা। সবাই জানে, সমুদ্র সংক্রান্ত গবেষণা পরিচালনা করাই নুমার কাজ। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা তা নয়। নুমা আসলে ছদ্ম পরিচয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। দেশের প্রেসিডেন্ট ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান আর কারও কাছে দায়ী বা জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়। মান এবং গুরুত্বের দিক থেকে সি.আই.এ.-র চেয়ে খুব একটা কম নয় নুমা। পার্থক্য শুধু এই সি.আই.এ.-র কথা দুনিয়ার তাবৎ লোক জানে, কিন্তু নুমার আসল পরিচয় সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট এবং প্রশাসনের মুষ্টিমেয় কয়েকজন প্রভাবশালী এবং বিশ্বস্ত কর্মকর্তা ছাড়া কেউ কিছু জানে না। নুমা অর্থাৎ ন্যাভাল ইন্টেলিজেন্সের চীফ হিসেবে অনেক গোপন খবরই পৌঁছায় অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটনের কানে। সেই রকম একটা খবর ছিল, সি.আই.এ. আয়োজিত বিশেষ একটা মিশন নিয়ে আর্কটিকের রাশান টেরিটরিতে গেছে মাসুদ রানা।

মিশনের ধরন সম্পর্কে কোন ধারণা ছিল না অ্যাডমিরালের। তেমন কোন কৌতূহলও তিনি বোধ করেননি। কিন্তু ক'দিন পর অনেক খবরের সাথে মিশনটা সম্পর্কে আরেকটা খবর এল তাঁর কানে। জানতে পারলেন রানার নেতৃত্বে যে মিশনটা আর্কটিক গিয়েছিল সেটা ব্যর্থ হয়েছে। খবরটা একটু বিচলিত করে তুলল তাঁকে। অন্য কোন কারণে নয়, তিনি অস্থির হলেন রানার কথা ভেবে। কোথায় রানা? কি অবস্থায় আছে? আহত হয়েছে কিনা?—এই রকম অনেক প্রশ্ন ভিড় করে এল তাঁর মনে। এজেন্টদের নির্দেশ দিলেন, মাসুদ রানা কোথায় কি অবস্থায় আছে খবর নিয়ে জানাও আমাকে।

সেইদিনই রিপোর্ট পেলেন তিনি, রানা সম্পর্কে কোন খবরই যোগাড় করতে পারেনি এজেন্টরা। আর্কটিক থেকে ফিরেছে কিনা সেটাই জানা সম্ভব হয়নি। কেমন যেন বেখাপ্পা লাগল অ্যাডমিরালের। ব্যাপারটা কি? জলজ্যান্ত মানুষটা তো

আর বাতাসে গায়েব হয়ে যেতে পারে না! খবরই নেই, তা হয় কিভাবে? কাউকে কিছু না বলে রানার খবর পাবার জন্যে নিজেই তিনি উদ্যোগী হলেন। মিশনের আয়োজন করেছিল সি.আই.এ, কাজেই সি.আই.এ. চীফ এ.পি. কলভিনকে সরাসরি টেলিফোন করলেন। কলভিনের সাথে সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা যা হলো, তাতে তাঁর বুঝতে অসুবিধে হলো না, মস্ত কোন বিপদে জড়িয়ে পড়েছে রানা। অনুমানে বুঝলেন, সি.আই.এ. বিল্ডিঙেই আটকে রাখা হয়েছে তাকে। এবং কলভিন আভাসে যা বললেন তা থেকে পরিষ্কার বোঝা গেল, রানার ওপর চরম ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সি.আই.এ.।

গোটা ব্যাপারটা উপলব্ধি করে হতভম্ব হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। আগে কখনও টের পাননি, আজ রানাকে জীবনমৃত্যুর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, রানাকে তিনি নিজের ছেলের মতই ভালবাসতে শুরু করে দিয়েছেন, কবে থেকে তা তিনি নিজেও জানেন না! বাংলাদেশের এই অদ্ভুত ছেলেটি কবে কখন কিভাবে তাঁর কঠিন হৃদয়ের মাঝখানে স্নেহের আসনটি দখল করে নিয়েছে, ভাবতে গিয়ে নিজেই বিস্ময় বোধ করলেন তিনি। কতভাবে রানা সাহায্য করেছে নুমাকে, নিজের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে তাঁকে, একে একে মনে পড়ে গেল সব। বিনিময়ে কিছু কাজ সে-ও করিয়ে নিয়েছে নুমাকে দিয়ে, কিন্তু ওর মধ্যে দর কষাকষির মনোভাব দেখেননি কখনও। সাহায্য চাইতে যা দেরি, সাথে সাথে ঝাঁপিয়ে পড়েছে রানা, বিনিময়ে কি পাবে না পাবে তা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। অতীত রোমন্থন করতে গিয়ে আজ তিনি উপলব্ধি করলেন, রানার তুলনা হয় না। ওর সততা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন ওঠে না। অন্তত অন্যায়কে প্রশ্রয় দেবার পাত্র মাসুদ রানা নয়। সি.আই.এ. ওকে বেঈমান ভাবতে পারে, এ-ব্যাপারে নিশ্চয়ই রানারও কিছু বলার আছে।

ভয়ে দুশ্চিন্তায় অনেকটা উন্মাদের মত হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। মিশনটা কেন ব্যর্থ হয়েছে সে-সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহর জন্যে সি.আই.এ-র ভেতর রোপণ করা বিশেষ এজেন্টকে নির্দেশ দিলেন তিনি। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই বিস্তারিত রিপোর্ট এল। এরপর তিনি চিন্তাভাবনা করে দেখতে শুরু করলেন, রানাকে সাহায্য করার আদৌ কোন উপায় তাঁর সামনে খোলা আছে কিনা।

কলভিনকে অনুরোধ করে লাভ নেই। রানাকে চরম শাস্তি দেয়ার সিদ্ধান্তটা তিনি নিজেই নিয়েছেন, অপর এক ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর চীফের অনুরোধে সেটা যে বদল করবেন না, এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার। বিশেষ করে, নুমার সাথে সি.আই.এ.-র সম্পর্ক কোন দিনই ভাল যায়নি। ভেবে-চিন্তে অ্যাডমিরাল দেখলেন, তাঁর সামনে একটাই পথ খোলা আছে। সরাসরি প্রেসিডেন্টকে ধরতে হবে। এই পরিস্থিতিতে একমাত্র প্রেসিডেন্টই এ.পি. কলভিনকে সিদ্ধান্ত বদলাতে বাধ্য করতে পারেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট অ্যাডমিরালের অনুরোধ রাখবেন কেন? রাখবেন, অ্যাডমিরাল যদি যুক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করতে পারেন যে রানা নির্দোষ।

কিন্তু যুক্তি জিনিসটা এক একজনের কাছে এক এক রকম। অ্যাডমিরালের কাছে যেটা যুক্তিসঙ্গত, প্রেসিডেন্টের কাছে সেটা সঙ্গত বলে মনে নাও হতে

পারে। সেক্ষেত্রে খালি হাতে ফিরে আসতে হবে অ্যাডমিরালকে। এবং খালি হাতে ফিরে আসতে হলে, মান-সম্মান বাঁচাবার তাগিদেই নুমার ডিরেক্টরের পদ থেকে ইস্তফা দিয়ে ফিরে আসতে হবে তাঁকে।

কর্ম-জীবনের সবচেয়ে বড় সংকটের মুখোমুখি হলেন অ্যাডমিরাল। একদিকে সন্তানতুল্য বিদেশী এক তরুণকে বাঁচাবার তাগিদ, অন্য দিকে বিরাট একটা পদে বহাল থেকে দেশ-সেবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবার ঝুঁকি। কঠিন সমস্যা। কিন্তু মাত্র পনেরো সেকেণ্ড লাগল তাঁর মন-স্থির করতে।

পরবর্তী আধঘণ্টার মধ্যে প্রশাসনের উর্ধ্বতন মহলে সাইক্লোন বইয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন। তিনি রানার হয়ে মুভ করছেন এ-কথা জানতে পারার সাথে সাথে সি.আই.এ. তাড়াহুড়ো করে রানার ওপর আঘাত হানতে পারে, তাই প্রথমেই তিনি নির্দিষ্ট কয়েক জায়গায় মেসেজ পাঠিয়ে জানিয়ে দিলেন রানা কোথায় কি অবস্থায় আছে। কোথায় কোথায় মেসেজ পাঠানো হবে তার একটা তালিকা তৈরি করা হলো। তারপর শুরু হলো পাঠানো। তালিকায় প্রথম স্থান পেল, রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সী, তারপর বি. সি. আই। মেসেজ পেতে যা দেরি, দুটো সংগঠনের হেডকোয়ার্টার থেকেই জরুরী রেডিও সিগন্যাল পাঠিয়ে সি.আই.এ.-র কাছ থেকে জবাবদিহি চাওয়া হলো।

ওদিকে খোদ প্রেসিডেন্টের সাথে দেখা করে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করে বললেন অ্যাডমিরাল। সবশেষে মৃদু হাসির সাথে জানালেন, রানাকে ছেড়ে দিতে বলে তিনি কোন অন্যায় আবদার করছেন না,' কাজেই তাঁর অনুরোধ রাখা না হলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। বুক-পকেটটা দেখিয়ে বললেন, 'রেজিগনেশন লেটার সাথে করে নিয়েই এসেছি।'

গম্ভীর, চিন্তিত দেখাল মার্কিন প্রেসিডেন্টকে। অ্যাডমিরাল জানেন না, এই মাত্র খানিক আগে প্রেসিডেন্টকে টেলিফোনে পরিস্থিতিটা নিজের মত করে ব্যাখ্যা করেছেন সি.আই.এ. চীফ এ.পি. কলভিন। কলভিন যা বলেছেন তা থেকে প্রেসিডেন্টের বুঝতে অসুবিধে হয়নি, মাসুদ রানা নামে বাংলাদেশী তরুণ যুক্তরাষ্ট্রের মস্ত এক ক্ষতি করেছে। এখন আবার তার পক্ষ নিয়ে আরেক ইন্টেলিজেন্সের চীফ এসেছেন ওকালতি করতে। মাসুদ রানার ভাল-মন্দ নয়, স্ব প্রশাসনের অন্তর্বিরোধ কিভাবে এড়ানো যায় তাই নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন তিনি। নিজেকে তিনি অস্থির হয়ে উঠতে দিলেন না। শান্ত ভাবে বললেন, 'আমারও বিশ্বাস, আপনি কোন অন্যায় অনুরোধ করতে পারেন না। কিন্তু আমাকে ধারণা দেয়া হয়েছে, প্রফেসর সেসলভ আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাবার পিছনে ওই যুবকই দায়ী। সে-ই একজন যুগোস্লাভ ইন্টেলিজেন্স এজেন্টকে মিশনে ভিড়িয়ে নিয়েছিল।'

'ভুল তথ্য দেয়া হয়েছে আপনাকে,' শ্বাস ফেলার সময়টুকু পর্যন্ত নিলেন না অ্যাডমিরাল, প্রেসিডেন্ট থামতেই গড় গড় করে বলে গেলেন, 'রানা শুধু যুগোস্লাভ এজেন্টের নামটা সাজেস্ট করেছিল। আমরাও তাকে চিনি। তার নাম পেরী কংকর। কিন্তু সে যে যুগোস্লাভ এজেন্ট, এই ঘটনার আগে কেউ তা আমরা জানতাম না। আমরা যেখানে জানি না, সেখানে রানা জানত বলে ধরে নেয়াটা কি ঠিক? প্রায় বিশ বছর আগে যুগোস্লাভিয়া থেকে বেরিয়ে আসে কংকর, সেই থেকে

ফ্রেঞ্চ নাগরিকত্ব নিয়ে প্যারিসে বসবাস করে আসছে। পেশাদার রেসিং মটরিস্ট। গ্র্যান্ড প্রি চ্যাম্পিয়ন। রানা তার নাম সাজেস্ট করার পর সি.আই.এ. অত্যন্ত খুঁটিয়ে কংকরের ব্যাক গ্রাউন্ড চেক করে দেখেছিল। কোন খুঁত পায়নি। দোষটা তাহলে কার? রানার, নাকি যারা কংকরের ব্যাক গ্রাউন্ড চেক করে কিছু বের করতে পারেনি সেই সি.আই.এ-র?'

রিভলভিং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। ধীর পায়ে দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেলেন তিনি, তারপর ফিরে এসে ডেস্কের এক কোণে বসলেন। 'একটা প্রশ্ন বটে!' মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি।

'মি. প্রেসিডেন্ট,' মুখে হাসি টেনে বললেন অ্যাডমিরাল, 'এরপর আপনি বোধহয় জানতে চাইবেন রানা যে নির্দোষ তা আমি প্রমাণ করতে পারব কিনা···'

'অবশ্যই!' গমগম করে উঠল প্রেসিডেন্টের ভারী গলা।

'আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন, মিশন ব্যর্থ হওয়ার দায়িত্ব রানা স্বীকার করেনি?'

'হ্যাঁ। কলভিন বলছিলেন, স্বীকার করলে ফেঁসে যাবে তাই···'

প্রেসিডেন্টকে বাধা দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'আসল ঘটনাটা শুনুন তাহলে। রানা যে মিশনের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সেটা হানড্রেড পারসেন্ট সফল হয়। প্রফেসর সেসলভকে রাশিয়ান টেরিটরি থেকে বের করে নিয়ে আন্তর্জাতিক জলসীমায় পৌঁচেছিল মিশন, এই সময় মার্কিন সেনাবাহিনীর একটা দল গোটা মিশনকে নিরস্ত্র করে। এবং প্রফেসর সেসলভের দায়িত্ব নিজেদের হাতে তুলে নেয়। এর বেশ খানিক পর পাইলটকে প্লেন নামাতে বাধ্য করে কংকর। এখন আপনিই বিবেচনা করে দেখুন, রানার মিশনটা ব্যর্থ হলো কিভাবে?'

অনেকক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা সুরে জানতে চাইলেন, 'আপনি কি বলতে চাইছেন, নিজের ব্যর্থতা চাপা দেবার জন্যে রানাকে ফাঁসাতে চাইছে সি.আই.এ.?'

'ঠিক তাই!' দৃঢ়তার সাথে বললেন অ্যাডমিরাল। 'মিশনের অন্যান্য সদস্যদেরকে জিজ্ঞেস করলেই আমার কথার সত্যতা প্রমাণিত হবে। সেসলভের দায়িত্ব যখন রানার হাতে ছিল না, সেই সময় তাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কাজেই এর জন্যে কোনভাবেই রানাকে দায়ী করা যায় না।'

কি কারণে কে জানে, লাল হয়ে উঠল প্রেসিডেন্টের চেহারা। সম্ভবত কলভিন তাঁকে ভুল বুঝিয়েছেন বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য চেপে গেছেন বলেই। অ্যাডমিরালের দিকে তাকালেন না তিনি। হাত বাড়িয়ে টেলিফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কিছু নির্দেশ দিলেন, তারপর রেখে দিলেন রিসিভার। ডেস্কের কোণ থেকে নেমে পায়চারি শুরু করলেন তিনি। সাত মিনিট পর টেলিফোন বাজল। রিসিভার তুলে নিয়ে অপর প্রান্তের কথা শুনলেন তিনি, নিজেও কিছু কথা বললেন নিচু গলায়। তারপর রিসিভার নামিয়ে রেখে জানতে চাইলেন, 'পদত্যাগ করার ব্যাপারে আপনি কি ডিটারমিন্ড, অ্যাডমিরাল?'

বুকটা কেঁপে গেল অ্যাডমিরালের। পদটা হারাতে হতে পারে ভেবে নয়, রানার নিরাপত্তার কথা ভেবে। দৃঢ় সুরে বললেন, 'যদি দেখি নিরপরাধ একজন মানুষ ন্যায়-বিচার পেল না, তাহলে ওটাই হবে আমার প্রতিবাদ জানাবার ভাষা।'

নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন প্রেসিডেন্ট। পেপার ওয়েটটা নাড়াচাড়া করতে করতে বললেন, 'হাসপাতালে ফোন করেছিলাম। মিলটন স্টেনারের সাথে কথা বললাম। জানাল, প্রফেসর সেসলভ কিডন্যাপড হবার আগেই রানাকে নিরস্ত্র করা হয়।' একটু বিরতি নিলেন প্রেসিডেন্ট, তারপর আবার বললেন, 'আরও একটা প্রশ্ন করেছিলাম। উত্তরে জানাল, প্রফেসর সেসলভ স্বেচ্ছায় চলে গেছেন। তার আগে সবাই তাঁকে বলতে শুনেছিল, তিনি যুক্তরাষ্ট্র নয়, যুগোস্লাভিয়াতেই যেতে চান। কাজেই, মাসুদ রানা নির্দোষ।' হাত বাড়ালেন টেলিফোনের দিকে। 'ওদেরকে আমি বলে দিচ্ছি, এখুনি যেন ওরা···'

বাধা দিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'না! রাস্তা-ঘাটে যেখানে খুশি রানাকে ওরা ছেড়ে দেবে, এই ধারণাটাই আমার পছন্দ নয়। আপনি ওদেরকে বলুন, রানাকে নুমা তার হেডকোয়ার্টারে ডেলিভারি নেবে।'

ভুরু কুঁচকে অ্যাডমিরালের মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ও, কিছু কাজ করিয়ে নেবেন? ঠিক আছে, তাই হবে।' রিসিভারে কথা বলতে শুরু করলেন তিনি।

এক মিনিট পর প্রেসিডেন্টকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন।

দশ মিনিট হলো নুমা হেডকোয়ার্টারে পৌঁচেছে রানা, কিন্তু এখনও তার সাথে ভাল করে কথা বলার সুযোগ পাননি অ্যাডমিরাল হ্যামিলটন। পৌঁছেই রেডিও রূমে ঢুকেছে রানা, কথা বলছে ঢাকার সাথে। মেজর জেনারেল রাহাত খান গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট নিচ্ছেন ওর কাছ থেকে।

আরও মিনিট পাঁচেক পর রেডিও রূম থেকে বেরিয়ে এল রানা। ওর জন্যে নিজের খাস কামরায় অপেক্ষা করছিলেন অ্যাডমিরাল, রানাকে ঢুকতে দেখে মৃদু হাসলেন। 'এসো।'

ডেস্কের সামনের একটা চেয়ারে বসল রানা। মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আমার বস বলছিলেন আপনি তাঁকে বলেছেন···'

'হ্যাঁ,' রান্যর মুখের কথা কেড়ে নিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'রাহাতকে আমি বলেছি, তোমাকে ওরা ছেড়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমার বিপদটা কেটে গেছে।'

'এখন আমি ওদের হাতে বন্দী নই,' গম্ভীর রানা। 'কিভাবে আত্মরক্ষা করতে হয়···'

'তা তোমার ভাল করেই জানা আছে। বুঝলাম। কিন্তু আমার ধারণা, মস্ত পরাক্রমশালী এক প্রতিষ্ঠান তার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবার তোমার বিরুদ্ধে। যে-কোন দিক থেকে আসতে পারে আঘাত, যে-কোন সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা। তাই ঈজিয়ান সাগরে পাঠিয়ে দিতে চাই আমি তোমাকে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল রানা। পরিষ্কার বুঝতে পারল ঘুঘুবুড়োর কোন মতলব আছে। নিশ্চয়ই ওখানে কোন গোলমালে পড়েছে নুমা। হাসল। 'বলুন, কি করতে হবে আমার ওখানে?'

'বিশেষ কিছু না,' হালকা সুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'ঈজিয়ান সাগরের উত্তরে একটা দ্বীপ আছে, নাম থাসোস। গ্রীক ম্যাসেডোনিয়ান মেইনল্যান্ড থেকে ষোলো মাইল দূরে ওটা। মাঝখানের পানিটাকে থাসোস স্ট্রেইট বলা হয়। আমি চাই ওই দ্বীপ থেকে ক'দিনের জন্যে বেড়িয়ে আসো তুমি।'

'এত থাকতে ওখানে কেন?'

'ওখানে আমাদের একটা রিসার্চ শিপ আছে, ব্লু লিডার,' বললেন অ্যাডমিরাল।

'আছে। তারপর?'

হেসে ফেললেন অ্যাডমিরাল। 'বুঝতেই পারছ, ওখানে কিছু সমস্যা গজিয়েছে। মাসুদ রানার মনোযোগ দাবি করবে অত বড় সমস্যা নয় বোধহয়। আবার বিশদ কিছু না জেনে এখান থেকে জোর করে কিছু বলাও যায় না। আসলে রোদ পোহাতেই যাবে তুমি, সেই সাথে যদি পারো ওদের সমস্যা নিয়ে একটু মাথা ঘামাবে, এই আর কি।'

'ঠিক আছে,' রাজি হয়ে গেল রানা। 'আমি তৈরি। কবে যেতে হবে বলুন?'

'তাড়াহুড়োর কিছু নেই,' বললেন অ্যাডমিরাল। 'আগে আমাদের রেস্ট হাউসে বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে তাজা ঝরঝরে করে নাও, তারপর···এই ধরো, পরশু দিন বেরিয়ে পড়ো?'

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কিন্তু···'

'কিন্তু কি?'

'আজ এবং কাল—এই দুটো দিন আমি আমার নিজের ইচ্ছেমত যেখানে খুশি কাটাতে চাই।'

'সে কি! সি.আই.এ···'

'আমাকে মুক্ত করে আনার জন্যে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বন্দী অবস্থায় আমি ধরেই নিয়েছিলাম মারা যাচ্ছি। কিন্তু এখন সি.আই.এ-র ভয়ে যদি আমাকে নুমার গর্তে লুকাতে হয়, যদি নিজের কাছে প্রমাণ করতে না পারি যে মুক্ত অবস্থায় যে-কোন প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকার ক্ষমতা আমার আছে—তাহলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।'

অবাক দৃষ্টিতে রানার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন অ্যাডমিরাল অনেকক্ষণ, তারপর মস্ত বড় একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকালেন। 'ঠিক আছে। তাই হবে। পরশু তুমি আমার সাথে দেখা করছ···প্রমিজ?'

'প্রমিজ।'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা, তারপর বেরিয়ে গেল বাইরে।

দুই

রোববার। সাংঘাতিক গরম একটা দিন। ব্যাডি এয়ারফোর্স বেসের কন্ট্রোল অপারেটর এয়ার ট্রাফিক টাওয়ারে বসে একের পর এক সিগারেট ফুঁকছে।

পোর্টেবল এয়ার কন্ডিশনারের ওপর মোজা পরা একটা পা তুলে দিয়ে এয়ারফিল্ডের চারদিকে চোখ বুলাল সে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছে, অথচ কিছুই ঘটছে না। আরও কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কিছু যে ঘটবে না, তাও সে জানে। একঘেয়েমিটা সেজন্যেই অসহ্য লাগছে তার।

সব রোববারেই এই অবস্থা হয়, এয়ার ট্রাফিক থাকে না বললেই চলে। আজও তার ব্যতিক্রম নয়। সকাল থেকে ল্যান্ড বা টেক-অফ, ব্র্যাডি এয়ারফিল্ড থেকে কিছুই হয়নি। আশেপাশে কোথাও এই মুহূর্তে কোন রকম যুদ্ধাবস্থা নেই বা কোন রকম আন্তর্জাতিক সংকট মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি, কাজেই মিলিটারি এয়ারক্রাফটের আনাগোনা আশা করা যায় না। সিভিল এয়ারলাইন্সের কোন প্লেন হঠাৎ ল্যান্ড করলেও করতে পারে, স্রেফ রিফুয়েলিঙের জন্যে। এই ধরনের প্লেনে সাধারণত কোন ভি.আই.পি. থাকেন, ইউরোপ বা আফ্রিকার কোন কনফারেন্সে তাড়াহুড়ো করে যোগ দিতে চলেছেন।

ডিউটিতে আসার পর থেকে ফ্লাইট শিডিউল ব্ল্যাকবোর্ডে এবার নিয়ে বার দশেক তাকাল অপারেটর। আজকের তারিখে কোন ডিপারচার নেই, এবং একমাত্র অ্যারাইভ্যালের আনুমানিক সময় লেখা হয়েছে ষোলোশো ত্রিশ ঘণ্টা—এখন থেকে আরও পাঁচ ঘণ্টা পরে।

বয়স কম অপারেটরের, চোখে-মুখে সদা চঞ্চল একটা ভাব, মাথাভর্তি সোনালী চুল এলোমেলো হয়ে আছে। তার ইউনিফর্মের আস্তিনে চারটে স্ট্রাইপ সেলাই করা রয়েছে, তারমানে সে একজন স্টাফ সার্জেন্ট। আটানব্বই ডিগ্রী টেমপারেচার, কিন্তু এয়ার কন্ডিশনার থাকায় খাকী ইউনিফর্মের কোথাও ঘামের দাগ ফোটেনি। শার্টের কলার খুলে রেখেছে, গলায় টাইও নেই—এয়ারফোর্সের নিয়ম-রীতি অনুসারে এটা একটা শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তবে বেসটা যদি গরম আবহাওয়ার কোথাও হয়, সেখানে এ-ধরনের ত্রুটিকে ক্ষমার চোখে দেখা হয়।

ঠাণ্ডা বাতাস যাতে পা বেয়ে ওপর দিকে উঠে আসতে পারে সেজন্যে এয়ার কন্ডিশনারটা অ্যাডজাস্ট করে নিল সে। মুখের সামনে হাত রেখে একটা হাই তুলল। হাত দুটো মাথার পিছনে বেঁধে চেয়ারের পিঠের ওপর ঢিল করে দিল শরীরটা, তাকিয়ে থাকল মেটাল সিলিঙের দিকে। অষ্টাদশী ফিয়াঁসের মুখ ভেসে উঠল চোখের সামনে। রাস্তার ধারে গাড়ি থামিয়ে পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গভীর, নিবিড় চুমো খাওয়া···আবার কবে আসবে সেই সুযোগ? এক, দুই করে গুণতে শুরু করল সে। আটান্ন। আজ থেকে আটান্ন দিন পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবে সে। বুক পকেটে রাখা কালো লেদার দিয়ে মোড়া নোট বুকটা হাত দিয়ে একবার স্পর্শ করল। একটা করে দিন কাটে, একটা করে লাল কালির দাগ পড়ে নোট-বুকের সাদা পাতায়। এক একটা দিন এক একটা যুগের মত দীর্ঘ লাগে তার। ফুরাতেই চায় না। কিন্তু জানে, একদিন দাগ কাটা শেষ হবে, সেদিন দেশে ফিরে ফিয়াঁসেকে নিয়ে গাড়িতে চড়বে সে।

নড়েচড়ে বসল। আবার একটা হাই তুলে জানালার কার্নিস থেকে অলস ভঙ্গিতে তুলে নিল বিনকিউলার। গাঢ় রঙের অ্যাসফল্টের রানওয়েতে, উঁচু কন্ট্রোল টাওয়ারের নিচে এক সার দাঁড়িয়ে রয়েছে পার্ক-করা এয়ারক্রাফটগুলো। এক এক

করে সব ক'টার ওপর চোখ বুলাল সে।

একশো সত্তর বর্গমাইল জায়গা নিয়ে ঈজিয়ান সাগরের বুকে দাঁড়িয়ে আছে থাসোস। পাথর, টিম্বার আর যীশু খ্রীষ্টের জন্মের এক হাজার বছর আগের তৈরি কিছু ধ্বংসাবশেষ নিয়ে এই দ্বীপ। গ্রীক মেইনল্যান্ড মাত্র ষোলো মাইল দূরে। উনিশশো ষাট সালে যুক্তরাষ্ট্র আর গ্রীসের সাথে একটা চুক্তি হয়, তারই ফলশ্রুতি এই ব্যাডি এয়ারফোর্স বেস। দশটা এফ ওয়ান হানড্রেড-ফাইভ স্টারফায়ার জেট ছাড়া বেসে স্থায়ী ভাবে আর মাত্র একজোড়া দৈত্যাকার সি-ওয়ান হানড্রেড থারটিথ্রী কার্গোমাস্টার ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন আছে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে তাকাতে রুপোর তৈরি মোটাসোটা একজোড়া তিমির মত দেখাল ওগুলোকে, জ্বলন্ত ঈজিয়ান সূর্যের নিচে ঝলমল করছে।

ফিল্ডের ওপর আরেকবার চোখ বুলাল অপারেটর। প্রায় নির্জনই বলা যায়। বেসের বেশির ভাগ লোক পাশের শহর পানাঘিয়ায় বিয়ার খেতে গেছে, কেউ কেউ হয়তো সৈকতে শুয়ে বসে উদোম গায়ে রোদ পোহাচ্ছে। কিছু লোক এই গরমে আর বেরুতে সাহস করেনি, ঠাণ্ডা ব্যারাকে নিদ্রাদেবীর আরাধনা করছে। মেইন গেটের কাছে নিঃসঙ্গ একজন এম-পিকে দেখল সে। দেখা না গেলেও, মানুষের উপস্থিতি আরেক জায়গায় টের পাওয়া যায়—মস্ত একটা সিমেন্ট ব্যাংকারের ওপর অনবরত ঘুরে চলেছে রাডার অ্যান্টেনা। ধীরে ধীরে বিনকিউলার তুলে নীল সাগরের দিকে তাকাল সে। উজ্জ্বল, মেঘমুক্ত দিন, দূরের গ্রীক মেইনল্যান্ডের খুঁটিনাটি অনেক কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। গ্লাস জোড়া পুব দিকে ঘোরাল, চোখ রাখল দিগন্তরেখার ওপর, যেখানে গাঢ় নীল পানি হালকা নীল আকাশের গায়ে মিশেছে। মিট-ওয়েভের কাঁপন ভেদ করে সামনে চলে গেল দৃষ্টি, জাহাজের খুদে একটা সাদাটে আকৃতি ধরা পড়ল চোখে। বো-তে লেখা জাহাজের নামটা পড়ার জন্যে ফোকাস অ্যাডজাস্ট করল সে। ছোট ছোট কালো অক্ষরগুলো কোন রকমে পড়তে পারা গেল—ব্লু লিডার।

নামটা ভালই! আপনমনে মাথা ঝাঁকাল অপারেটর। ব্লু মানে সাগর ধরে নেয়া হলে নামটার একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে। জাহাজটার খোলের গায়ে আরও কি যেন সব লেখা রয়েছে। একটু চেষ্টা করতেই সেগুলো পড়া গেল। লম্বা, খাড়া ভাবে আঁকা চারটে অক্ষর। এন.ইউ.এম. এ.। অক্ষরগুলো চেনা তার, অর্থও জানা আছে। ন্যাশন্যাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সী। নুমা।

জাহাজের পিছন থেকে আকাশে উঠে পানির ওপর ঝুঁকে পড়েছে প্রকাণ্ড একটা ক্রেন, পানির নিচ থেকে গোলাকার কি যেন একটা তুলছে ধীরে ধীরে। ক্রেনের চারদিকে ব্যস্ত মানুষের ছুটোছুটিও লক্ষ্য করল অপারেটর। বেসামরিক লোকজনকেও রোববারে কাজ করতে হয় দেখে খুশি লাগল তার। এই সময় ইন্টারকম থেকে বেরিয়ে এসে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর চমকে দিল তাকে।

'হ্যালো কন্ট্রোল টাওয়ার, দিস ইজ রাডার···ওভার!'

বিনকিউলার রেখে মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিল অপারেটর। 'দিস ইজ কন্ট্রোল টাওয়ার, রাডার। ব্যাপার কি?'

'এইমাত্র দশ মাইল পশ্চিমে একটা কন্ট্যাক্ট পেলাম।'

'দশ মাইল পশ্চিমে?' প্রায় খেঁকিয়ে উঠল অপারেটর। 'এতক্ষণ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছিলে, রাডার? দশ মাইল পশ্চিম বলতে গেলে দ্বীপের মাঝখানটাকে বোঝায়, প্রায় মাথার ওপর!' ঘাড় ফিরিয়ে প্রকাণ্ড ব্ল্যাকবোর্ডের দিকে তাকাল সে। এই সময় কোন শিডিউল ফ্লাইট নেই, জানে, তবু নিশ্চিত হবার জন্যে দেখে নিল আরেকবার। 'পরের বার দয়া করে আরও তাড়াতাড়ি জানাবার চেষ্টা করো, কেমন?'

'কোত্থেকে যে হুট করে চলে এল, বুঝলাম না!' রাডার বাংকার থেকে অবাক সুরে বলল যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর। 'তাজ্জব ব্যাপার! গত ছয় ঘণ্টায় কিছুই দেখা যায়নি স্কোপে। চারদিকের একশো মাইলের মধ্যে একটা শকুন পর্যন্ত ছিল না! হঠাৎ···!'

'হয় ঘুম তাড়াবার ব্যবস্থা করো, নয়তো বাজ পড়া ইকুইপমেন্টগুলো চেক করাও এখুনি,' তিক্ত সুরে বলল অপারেটর। মাইকের বোতাম ছেড়ে দিয়ে বিনকিউলার তুলে নিল সে। উঠে দাঁড়াল। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে তাকাল পশ্চিম দিকে।

ছোট্ট একটা কালো বিন্দু মত দেখাল ওটাকে। খুব নিচু দিয়ে উড়ে আসছে, মনে হলো আরেকটু নিচে নামলে পাহাড় সারির চূড়ার সাথে ধাক্কা খাবে। খুব ধীর গতিতে আসছে, ঘণ্টায় নব্বই মাইলের বেশি নয়। প্রথম কিছুক্ষণ মনে হলো, পাহাড়ের মাথার ওপর স্থির হয়ে আছে ওটা, তারপর হঠাৎ করেই একটা আকৃতি পেতে শুরু করল। একটু বেঁকে গেছে, তাই একটা পাশ পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। বিনকিউলার নামিয়ে হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ রগড়াল অপারেটর। চেহারায় অবিশ্বাসের ভাব ফুটে উঠেছে। ফোকাস অ্যাডজাস্ট করে আবার যখন তাকাল, সাথে সাথে ঝুলে পড়ল মুখ। উইং আর ফিউজিলাজ পরিষ্কার দেখতে পেল সে। ভুল হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। এক ইঞ্জিনের সিঙ্গেল সিটার প্লেন। ল্যান্ডিং গিয়্যারটা স্পোক দিয়ে তৈরি, ভাঁজ করা যায় না। বেরিয়ে থাকা ইন-লাইন সিলিন্ডার হেডটাকে বাদ দিলে ফিউজিলাজটা দেখতে অনেকটা তরল পদার্থের সাবলীল প্রবাহের মত, ক্রমশ সরু হয়ে গিয়ে খোলা ককপিটের দু'দিকে ফিতের মত হয়ে গেছে। পুরানো উইন্ডমিলের মত বাতাস কাটছে কাঠের তৈরি প্রপেলার, প্রাচীন প্লেনটাকে শামুকের গতিতে বয়ে নিয়ে আসছে সোজা ব্র্যাডি এয়ারফিল্ডের দিকে। কাপড়ে মোড়া ডানা দুটোকে বাতাসের ধাক্কায় কাঁপতে দেখল অপারেটর। দুই ডানার ওপর সাদা স্ট্রাইপ আছে, তাছাড়া প্রপেলারের গোড়া থেকে এলিভেটরের পিছনের ডগা পর্যন্ত গোটা প্লেনটা উজ্জ্বল, চকচকে গোলাপী রঙে রঙ করা। কন্ট্রোল টাওয়ারের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সেটা। পরিচিত একটা মার্কিং দেখতে পেল অপারেটর। কালো মলটিজ ক্রস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানীর প্রতীক চিহ্ন ছিল ওটা।

অন্য কোন পরিস্থিতিতে কন্ট্রোল টাওয়ারের মাথা থেকে মাত্র পাঁচ ফুট ওপর দিয়ে কোন প্লেন উড়ে গেলে নিশ্চয়ই ডাইভ দিয়ে মেঝেতে শুয়ে পড়ত অপারেটর। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এই যান্ত্রিক ভূতটাকে দেখে হতভম্ব বিমূঢ় হয়ে পড়ল সে, কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে অটল মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়েই থাকল। টাওয়ারের ওপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় একটা হাত বের করে অপারেটরের উদ্দেশে নাড়ল পাইলট। ককপিটে

বসা পাইলটকে একেবারে কাছ থেকে দেখতে পেল অপারেটর, গগলস আর লেদার হেলমেটের ভেতর তার মুখের খুঁটিনাটি সব পরিষ্কার ধরা পড়ল চোখে। পাইলটের অপর হাতটাও অপারেটরের চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। জোড়া মেশিনগানের বাটে আঙুল বুলাচ্ছে লোকটা।

শালা কোন প্র্যাকটিকাল জোকার নাকি? নাকি গ্রীক সার্কাস পার্টির কোন ভাঁড়? এল কোত্থেকে? একের পর এক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করল অপারেটরের মাথার ভেতর, কিন্তু কোন সদুত্তর মিলল না। আচমকা ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। আলোর দুটো ফোঁটা দেখতে পেল সে। প্রপেলারের পিছন থেকে বেরিয়ে এল। জ্বলছে, নিভছে। পরমুহূর্তে কন্ট্রোল টাওয়ারের জানালার সমস্ত কাঁচ ঝন ঝন শব্দে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল অপারেটরের চারদিকে।

সময় যেন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ব্যাডি ফিল্ডে। কন্ট্রোল টাওয়ারের গা ঘেঁষে আরও নিচের দিকে নেমে গেল প্রথম মহাযুদ্ধের ফাইটার, অত্যাধুনিক জেটগুলোর বিরুদ্ধে একাই যুদ্ধ শুরু করে দিল সে। অপারেটরের বিস্ফারিত চোখের সামনে একের পর এক ফুটো, ঝাঁঝরা হতে থাকল এফ-ওয়ান হানড্রেড ফাইভ স্টারফায়ার জেটগুলো। প্রাচীন নাইন মিলিমিটারের ঝাঁক ঝাঁক বুলেট অ্যালুমিনিয়ামের মোটা আবরণ ভেদ করে ঢুকে গেল জেটগুলোর ভেতরে। ট্যাংক ভর্তি জেট ফুয়েলে আগুন ধরল, প্রায় একই সাথে বিস্ফোরিত হলো তিনটে জেট। লেলিহান আগুনের শিখায় ঢাকা পড়ে গেল সেগুলো। ফিল্ডের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে বারে বারে উড়ে গেল ভৌতিক ফাইটার, খক খক শব্দের সাথে ছুঁড়ে দিল ধ্বংসের বীজ। এরপর বিস্ফোরিত হলো একটা সি-ওয়ান হানড্রেড থারটি-থ্রী কার্গোমাস্টার। বুম করে একটা বিকট আওয়াজের সাথে আকাশের দিকে একশো ফুট ওপরে উঠে গেল আগুনের লেলিহান শিখা।

টাওয়ারের মেঝেতে পড়ে গেছে অপারেটর, কখন তা সে নিজেও বলতে পারবে না। মাথা তুলে বুকের দিকে তাকাল। রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে। অলস ভঙ্গিতে বুক পকেট থেকে কালো নোটবুকটা বের করল সে। কভারের গায়ে, ঠিক মাঝখানে, নিখুঁত একটা ফুটো দেখল সে। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে থাকল সেটার দিকে। চোখের ঠিক সামনেই কালো একটা পর্দা নেমে আসছে, ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে আসছে সব। হঠাৎ মাথা ঝাঁকিয়ে ইচ্ছে শক্তিটুকু ফেরত পাবার চেষ্টা করল সে। ব্যথায় কুঁচকে উঠল মুখ, কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টাতেই উঠে বসতে পারল সে। নেশাগ্রস্তের মত টুলছে। চকচকে কাঁচের টুকরোয় ঢাকা পড়ে গেছে মেঝে, ফার্নিচার, রেডিও ইকুইপমেন্ট। কামরার মাঝখানে নিহত একটা যান্ত্রিক পশুর মত উল্টে পড়ে রয়েছে এয়ার কন্ডিশনারটা। রেডিওর দিকে আবার তাকাল অপারেটর। অলৌকিক ভাবে বেঁচে গেছে ওটা। ধীরে ধীরে ক্রল করে এগোল সে। নাগালের মধ্যে চলে আসতেই মাইক্রোফোনের হাতলটা মুঠো করে ধরল। রক্তে ভেজা হাত লেগে পিচ্ছিল হয়ে গেল হাতল।

চিন্তা করবে, সে-শক্তি ফুরিয়ে গেছে অপারেটরের। বিপদ সংকেত পাঠাবার নিয়মটা যেন কি? কোনমতেই স্মরণ করতে পারল না। এই রকম বিপদের সময় মেসেজের ভাষাটা কি হতে পারে? কিছু একটা বল, গর্দভ!— নিজেকে গালাগাল

দিতে শুরু করল সে।—যা খুশি! যা মনে আসে!

'যারা শুনতে পাচ্ছেন তাদের সবাইকে বলছি! মে-ডে! মে-ডে! এটা ব্র্যাডি ফিল্ড। অজ্ঞাত পরিচয় একটা এয়ারক্রাফট আমাদের ওপর হামলা চালিয়েছে। এটা কোন মহড়া নয়। আই রিপিট, ব্র্যাডি এয়ার ফিল্ড ইজ আন্ডার অ্যাটাক···'

তিন

মাথা ভর্তি কালো চুলের ওপর হেডসেটটা অ্যাডজাস্ট করে নিল রানা, তারপর আলতোভাবে ঘোরাতে শুরু করল রেডিওর চ্যানেল নব। আরও পরিষ্কার, স্পষ্ট আওয়াজ পেতে চাইছে ও। গভীর মনোযোগের সাথে শুনল কয়েক সেকেন্ড, ওর স্বচ্ছ সাদা কালো চোখের জমিনে ফুটে উঠল বিস্ময়ের ছাপ। কপালের টান টান চামড়ায় খুদে ভাঁজ পড়ল গোটা তিনেক।

রিসিভার থেকে বেরিয়ে আসা শব্দগুলো বুঝতে পারল না, তা নয়। আসলে কিছুতেই বিশ্বাস্য বলে মেনে নিতে পারল না। সন্দেহ হলো, শুনতে ভুল করেনি তো? পি-বি-আই ক্যাটালিনার জোড়া ইঞ্জিনের ভোঁতা গর্জন কানের গভীর থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল ও। গলার আওয়াজটা নিস্তেজ হয়ে আসছে। অথচ ঠিক উল্টোটা ঘটার কথা। রেডিওর ভলিউম কন্ট্রোল ফুল-অন করা রয়েছে। ব্র্যাডি ফিল্ডও খুব কাছে, মাত্র ত্রিশ মাইল দূরে। এই পরিস্থিতিতে এয়ার ট্রাফিক অপারেটরের গলার আওয়াজ রানার কানে বোমার মত বিস্ফোরিত হবার কথা। মানেটা কি? পাওয়ার লুজ করছে অপারেটর। নাকি জখম হয়েছে সে? কয়েক সেকেন্ড ইতস্তত করল রানা, তারপর ডান দিকে হাত বাড়িয়ে মৃদু ধাক্কা দিল ঘুমন্ত বেন নেলসনকে। 'বেন!'

প্রকাণ্ড শরীরটা নড়েচড়ে উঠল। চোখ মেলল বেন। একটা হাই উঠতে যাচ্ছিল, সেটাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে জানতে চাইল, 'এরই মধ্যে পৌঁছে গেলাম?'

'প্রায়,' বলল রানা। 'ওই তো, সামনেই থাসোস।'

হঠাৎ ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠল বেনের। 'ব্যাপারটা কি? তুমি আমার ঘুম ভাঙালে কেন? আরও মিনিট দশেক···'

'এইমাত্র একটা মেসেজ পেলাম ব্র্যাডি কন্ট্রোল থেকে,' বলল রানা। 'অচেনা কোন্ এয়ারক্রাফট নাকি হামলা চালিয়েছে ওদের ওপর।'

'কি?' বিস্ফারিত হয়ে উঠল বেনের চোখ জোড়া। পরমুহূর্তে হা হা করে হেসে উঠল সে। 'বুঝেছি! নিশ্চয়ই কেউ ঠাট্টা করেছে তোমার সাথে।'

শান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল রানা। 'মনে হয় না। কন্ট্রোল অপারেটর অভিনয় করলে আরও নাটকীয় হত গলার সুর।' চিন্তিতভাবে নিচের পানির দিকে তাকাল ও। সাগর থেকে মাত্র পঞ্চাশ ফুট ওপর দিয়ে ছুটছে প্লেন। জড়তা এবং আড়ষ্ট ভাব এড়াবার জন্যে শেষ দুশো মাইল একেবারে নিচু দিয়ে উড়ে আসছে ও।

দ্রুত মাথা ঝাঁকিয়ে অবিশ্বাস প্রকাশ করতে যাচ্ছিল বেন, হঠাৎ আবার বড় বড়

হয়ে উঠল তার চোখ জোড়া। 'মাই গড!' বিড়বিড় করে বলল সে। বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল দ্বীপের পুব দিকে। 'ব্র্যাডি কন্ট্রোল বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি, রানা!'

সাগরের পিঠের ওপর ফুলে থাকা একটা বিশাল স্তূপের মত দেখাল দ্বীপটাকে। হলুদ সৈকতটাকে ঘিরে রেখেছে সাদা ফেনা। কোথাও জন-মনিষ্যির চিহ্ন নেই, খাঁ খাঁ করছে। সারি সারি পাহাড়, দেখতে গম্বুজের মত, ঢালের ওপর গাছ-পালা আর সবুজের সমারোহ। থাসোস দ্বীপের পুব প্রান্তে বিরাট একটা কালো ধোঁয়ার পিলার দেখা গেল, বাতাস না থাকায় খাড়া উঠে গিয়ে আকাশ ছুঁই ছুঁই করছে। দ্বীপের আরও কাছে পৌঁছুল ওরা। ধোঁয়ার গোড়ায় কমলা রঙের আগুনের আভাস দেখতে পেল রানা।

মাইক ধরল ও, হ্যান্ডগ্রিপের গায়ে সাঁটা বোতামে চাপ দিল দ্রুত। 'ব্র্যাডি কন্ট্রোল, ব্র্যাডি কন্ট্রোল, দিস ইজ পি-বি-আই-ও এইট-সিক্স, ওভার।' কলটা আরও দু'বার রিপিট করল রানা।

'সাড়া নেই?'

'না।'

'তুমি বললে অচেনা এয়ারক্রাফট, তারমানে কি মাত্র একটা?'

'তাই তো বলল,' ধোঁয়ার দিকে চোখ রেখে জবাব দিল রানা।

'মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝছি না! মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারফোর্স বেসের ওপর একটা মাত্র প্লেন হামলা চালিয়েছে, বছরের সেরা রসিকতা বলে মনে হয় না?'

কন্ট্রোল কলাম সামান্য একটু পিছিয়ে নিয়ে এল রানা। 'হতে পারে উত্যক্ত কোন গ্রীক কৃষকের প্রতিশোধ। বেসের জেটগুলো হয়তো তার গরু-ছাগলের পালকে সন্ত্রস্ত করে তুলছিল। ফুল-স্কেল অ্যাটাক বলে মনে হয় না। তাহলে, ওয়াশিংটনের কাছ থেকে খবর পেতাম আমরা। অপেক্ষা করে দেখা যাক কি হয়।' চোখ রগড়ে ঘুম ঘুম ভাবটা তাড়াবার চেষ্টা করল ও। 'গেট রেডি। প্লেন নিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছি, পাহাড়ের মাথার ওপর চক্কর দেব, তারপর সূর্য থেকে বেরিয়ে সোজা নিচে নামব কাছ থেকে দেখার জন্যে।'

'সাবধান, রানা। পৈত্রিক প্রাণটা হারাতে চাই না। ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর ওটা যদি জেট ফাইটার হয়, আর যদি রকেট ছোঁড়ে...'

'তেমন কিছু দেখলে লেজ তুলে পালাব,' বলল রানা। সামনের দিকে থ্রটল ঠেলে দিল ও, সাথে সাথে বেড়ে গেল প্র্যাট অ্যান্ড হুইটনি টুইন ইঞ্জিনের গর্জন। কন্ট্রোলের ওপর চঞ্চল প্রজাপতির মত উড়ে বেড়াতে শুরু করল ওর হাত দুটো। প্লেনের ভোঁতা নাক সোজাসুজি সূর্য তাক করে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথার ওপর উঠে এসে একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করল ক্যারোলিনা। দ্রুত কালো ধোঁয়ার দিকে এগোল ওরা।

হেডসেটের ভেতর হঠাৎ যেন একটা বিস্ফোরণ ঘটল, কানে তালা লেগে গেল রানার। ঝট করে হাত বাড়িয়ে ভলিউম কমিয়ে দিল ও। এর আগে এই লোকেরই গলা শুনেছে, কিন্তু স্বরটা আগের মত দুর্বল নয়।

'দিস ইজ ব্র্যাডি কন্ট্রোল কলিং। উই আর আন্ডার অ্যাটাক! উই আর আন্ডার

অ্যাটাক। কাম ইন···এনি বডি, প্লীজ রিপ্লাই!' গলার আওয়াজ শুনে দিশেহারা উদ্‌ভ্রান্ত একজন লোকের ছবি ভেসে উঠল রানার মনের পর্দায়। সাহায্যের আশায় ব্যাকুল হয়ে আছে।

'ব্র্যাডি কন্ট্রোল, দিস ইজ-পি-বি-আই ও-এইট-সিক্স। ওভার।'

'থ্যাংক গড!' সশব্দে হাঁপাতে শুরু করল লোকটা।

'এর আগে তোমার সাড়া পাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি, ব্র্যাডি কন্ট্রোল।'

'প্রথম দফার হামলায় জখম হয়েছি আমি···জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলাম। এখন···এখন ঠিক আছি।' কথাগুলো দ্রুত বলল অপারেটর, শব্দগুলো মুখের ভেতর জড়িয়ে গেল।

'ছয় হাজার ফুট ওপরে, তোমার প্রায় দশ মাইল পশ্চিমে রয়েছি আমরা,' ধীরে ধীরে বলল রানা, কিন্তু পজিশনটা রিপিট করল না। 'তোমার অবস্থা জানাও।'

'আমাদের কোন ডিফেন্স নেই। গ্রাউন্ডের সবগুলো এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়ে গেছে। সবচেয়ে কাছের ইন্টারসেপটার স্কোয়াড্রন সাতশো মাইল দূরে। সময় মত পৌঁছুতে পারবে না ওরা। হেল্প আস, প্লীজ!'

অভ্যেসের দরুন এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'নেগেটিভ, ব্র্যাডি কন্ট্রোল। আমাদের টপ স্পীড মাত্র একশো নব্বই নট। সাথে এক জোড়া রাইফেল ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। একটা জেট ফাইটারের সাথে লাগতে যাওয়ার অর্থ হবে আত্মহত্যা করা।'

'জেট নয়! হামলাকারী জেট ফাইটার নয়! আই রিপিট, অ্যাটাকার জেট বোম্বার নয়। ওটা প্রথম মহাযুদ্ধের সময়কার একটা বাইপ্লেন। প্লীজ হেল্প আস! প্লীজ!'

চকিতে পরস্পরের দিকে একবার তাকাল রানা আর বেন। বিমূঢ়, হতভম্ব দেখাল দু'জনকেই। ঝাড়া দশ সেকেণ্ড কথাই বলতে পারল না রানা।

'ও-কে, ব্র্যাডি কন্ট্রোল, আমরা আসছি। কিন্তু তার আগে অ্যাটাকারের আইডেনটিটি আরেক বার চেক করে দেখো। ওভার অ্যান্ড আউট।' বেনের দিকে ফিরল রানা। চেহারায় কোন ভাবের প্রকাশ ঘটল না, শুধু ঠোঁট জোড়া নড়ে উঠল, 'পিছনে গিয়ে সাইড হ্যাচ খোল। কারবাইন তুলে নিয়ে তাজ্জব করে দাও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূতটাকে। জীবনে আর কখনও এমন সুযোগ পাবে না!'

কাপড়ের ওপর দিয়ে উরুতে চিমটি কাটল বেন। ব্যথা পেয়ে উহ্ করে উঠে বলল, 'না, স্বপ্ন নয়!'

'বিশ্বাস আমারও হচ্ছে না,' বলল রানা। 'কিন্তু হেসে উড়িয়ে দিতেও পারছি না। গ্রাউন্ডে ওরা মার খাচ্ছে, ঘটনাটা যদি সত্যি হয়, ওদেরকে আমাদের সাহায্য করা দরকার। যাও, তাড়াতাড়ি করো!'

বিড় বিড় করতে করতে কো-পাইলটের সীট ছেড়ে উঠে পড়ল বেন। টলতে টলতে প্লেনের কোমরের কাছে চলে এল সে। খাড়া করা কেবিনেট থেকে থারটি ক্যালিবারের একটা কারবাইন পাড়ল, রিসিভারে ভরল পনেরো শটের একটা ক্লিপ। সাইড হ্যাচ খুলতেই গরম বাতাসের ধাক্কা খেল চোখে মুখে। গানটা আরেকবার চেক করে নিয়ে বসে পড়ল। শুরু হলো তার অপেক্ষার পালা। মনে মনে জানে,

দক্ষ পাইলটের হাতে রয়েছে প্লেন, সামনে যত বড় বিপদই থাক না কেন, সেটা কাটাবার সমস্ত কৌশল রপ্ত করা আছে ওর।

ধীরে ধীরে সামনের দিকে কন্ট্রোল কলাম ঠেলে দিয়ে প্লেনটাকে নিচের দিকে গোত্তা খাওয়াল রানা। ব্র্যাডি ফিল্ডের আগুন আর ধোঁয়ার দিকে নেমে যেতে শুরু করল ক্যাটালিনা। কালো ডায়ালের ওপর অলটিমিটারের সাদা কাঁটা অলস ভঙ্গিতে উল্টো দিকে ঘুরছে, রেজিস্টার করছে অধোগতি। নেমে যাবার কোণাকুণি ভঙ্গিটা আরও খাড়া করল ও, সেই সাথে বিশ বছরের পুরানো এয়ারক্রাফট থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। লো স্পীড রিকনিস্যান্স, ডিপেনডেবিলিটি এবং লং রেঞ্জের কথা মনে রেখে তৈরি করা হয়েছিল এই প্লেন, হাই স্পীডের জন্যে নয়। মন্থর গতি হলে কি হবে, প্যাসেঞ্জার এবং কার্গো বহন করার জন্যে এর তুলনা ছিল না সে-যুগে। আরেকটা সুবিধে, পানিতেও ল্যান্ড বা টেক-অফ করতে পারে। এই পি-বি-আই ফ্লাইং বোট নুমার খুব কাজে লাগে। কারণ নুমার বেশিরভাগ অপারেশনই ঘটে গভীর সাগরে।

হঠাৎ কালো ধোঁয়ার গায়ে উজ্জ্বল রঙের একটা আকৃতি দেখতে পেল রানা। চকচকে গোলাপী একটা প্লেন। চোখের পলকে কাত হয়ে যেতে দেখে ওটার হাই ম্যানুভারেবিলিটি সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলো রানা। প্রায় সাথে সাথে ডাইভ দিয়ে ধোঁয়ার ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল বাইপ্লেন। তীব্র অধোগতি মন্থর করার জন্যে থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এল রানা। ধোঁয়ার ভেতর থেকে এই মুহূর্তে যদি গুলি করে বাইপ্লেন, ক্যাটালিনার ওপর দিয়ে ছুটে যাবে বুলেট। ধোঁয়া ভেদ করে ওপাশে আত্মপ্রকাশ করল প্রথম মহাযুদ্ধের যান্ত্রিক ভূত। পরিষ্কার দেখা গেল, ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর গুলি ছুঁড়ছে।

'কি আশ্চর্য!' বিড়বিড় করে বলল রানা। 'এ যে দেখছি সেই আদ্যিকালের পুরানো জার্মান অ্যালব্যাট্রস!'

সোজা সূর্যের চোখ থেকে বেরিয়ে এল ক্যাটালিনা, ধ্বংসযজ্ঞে মেতে ওঠা বাইপ্লেনের পাইলট দেখতেই পেল না তাকে। যুদ্ধ যত কাছে এগিয়ে এল, ধীরে ধীরে ক্ষীণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল রানার সারা মুখে। ওর কমান্ড পেয়ে ক্যাটালিনার নাক থেকে গোলা উগরে দেবার জন্যে কোন কামান নেই, মনটা একটু খারাপ হয়ে গেল। রাডার পেডালে চাপ দিল ও, বেনকে সহজে গুলি করার সুযোগ পাইয়ে দেবার জন্যে একটু তেরছা হয়ে গেল ক্যাটালিনা। সগর্জনে নেমে এল সেটা, বাইপ্লেনের পাইলট দেখতে পায়নি এখনও। ইঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে 'কড়াক' শব্দে বিস্ফোরণ ঘটল। গুলি করল বেন।

বাইপ্লেনের পাইলট ওপরে তাকাবার আগেই তার মাথার ওপর পৌঁছে গেল ক্যাটালিনা। খোলা ককপিটের ওপর বিরাট ফ্লাইং বোটকে দেখে নিখাদ বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল হেলমেট পরা পাইলটের মুখ। সূর্যের প্রখর আলোয় ধাঁধিয়ে গেল তার চোখ। দু'পক্ষই টের পেল, পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। শিকারী নিজে এখন শিকারে পরিণত হতে চলেছে। কিন্তু সহজে হাল ছাড়ার পাত্র নয় বাইপ্লেনের পাইলট। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে তিন সেকেন্ডের বেশি লাগল না তার। বিদ্যুৎগতিতে ডিগবাজি খেতে শুরু করে স্যাঁৎ করে সরে গেল দূরে। কিন্তু তার

আগেই পনেরো শটের ক্লিপটা খালি করে ফেলেছে বেন। বাইপ্লেন যে কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফাইটার প্লেন ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর এতক্ষণ একাই কেরামতি দেখাচ্ছিল, কিন্তু ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশে ফ্লাইং বোটের আবির্ভাব ঘটার সাথে সাথে যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেল। বাইপ্লেনের তুলনায় ক্যাটালিনা অনেক বেশি দ্রুতগতি, কিন্তু অ্যালব্যাট্রসের রয়েছে এক জোড়া মেশিনগান এবং তার হঠাৎ ওপরে বা নিচে যাওয়ার বা পাশ ফেরার ক্ষিপ্রতাও ক্যাটালিনার চেয়ে বেশি। ফকারের তুলনায় অ্যালব্যাট্রস তেমন সুনাম অর্জন করেনি বটে, কিন্তু উনিশশো ষোলো থেকে আঠারো সাল পর্যন্ত জার্মান ইমপিরিয়াল এয়ার সার্ভিসের পক্ষ নিয়ে ফাইটার হিসেবে কম কৃতিত্ব দেখায়নি সে।

গোটা তিনেক ডিগবাজি খেয়ে সোজা হলো অ্যালব্যাট্রস, ঘুরল, তারপর সরাসরি নিজের নাক তাক করল ক্যাটালিনার ককপিটে। ক্যাটালিনাকে দিয়ে শূন্যে একটা লূপ করাবার জন্যে কন্ট্রোল কলাম একেবারে কোলের ওপর টেনে নিয়ে এল রানা। মনে মনে দোয়া-দরূদ পড়ল, আল্লা, ঝাঁকি খেয়ে ডানা দুটো যেন ফিউজিলাজ থেকে ছিঁড়ে আলাদা না হয়ে যায়! সাবধান হবার কথা, কিংবা স্বীকৃত ফ্লাইং রুলসের কথা ভুলে গেল ও। ম্যান-টু-ম্যান কমব্যাটের জন্যে তোলপাড় শুরু হয়েছে রক্তে। ক্যাটালিনা যখন চিৎ হয়ে যাচ্ছে, নাট-বল্টুর কাঁপনের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল ও। লূপের শেষ প্রান্তটা কোথেকে কোথায় যাবে তার কোন হদিশই বের করতে পারল না অ্যালব্যাট্রসের পাইলট। বিহ্বল হয়ে পড়ল সে, এবং সুযোগটা পুরোমাত্রায় কাজে লাগাল রানা। লূপ শেষ করেই বাইপ্লেনের দিকে ছুটল ক্যাটালিনা। ঠিক সোজা নয়, তেরছা ভাবে। লূপ শেষ করেনি রানা, এই সময় ক্যাটালিনাকে লক্ষ্য করে গুলি করল বাইপ্লেন। লূপের মধ্যিখান দিয়ে বেরিয়ে গেল বুলেটগুলো। পরমুহূর্তে দেখা গেল দুটো প্লেন পরস্পরের দিকে ধেয়ে আসছে।

ট্রেসার বুলেটগুলো দেখতে পেল রানা। উইন্ডশীল্ডের দশ ফুট নিচে দিয়ে ছুটে গেল। লোকটা লক্ষ্যভেদে পটু নয়, সেটা আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল ওদের জন্যে। একই সরলরেখা ধরে একে অপরের দিকে ছুটছে প্লেন দুটো। তলপেটের ভেতর ঢেউ অনুভব করল রানা। সম্ভাব্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করল ও, তারপর নিচু করল ক্যাটালিনার নাক। সেই সাথে দ্রুত কাত করে নিল প্লেনটাকে। কয়েক সেকেন্ডের জন্যে হলেও অ্যালব্যাট্রসের ওপর অনুকূল পজিশনে পৌঁছুল ওরা। গুলি করল বেন। কিন্তু ডাইভ দিয়ে কারবাইনের লাইন অভ ফায়ার এড়িয়ে গেল অ্যালব্যাট্রস। সোজা ফিল্ডের দিকে নাক করে বিদ্যুৎ গতিতে খাড়াভাবে নেমে যেতে শুরু করল সে।

মুহূর্তের জন্যে অ্যালব্যাট্রসকে হারিয়ে ফেলল রানা। তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়ে ডান দিকে ঘুরল ও, আকাশের গায়ে চোখ বুলিয়ে খুঁজল তাকে। ধাক্কাটা অনুভব করার আগেই বিপদটা টের পেয়ে গেল ও। সামনে কোথাও অ্যালব্যাট্রসকে দেখতে না পেয়ে ছ্যাঁৎ করে উঠল ওর বুক, বুঝল, বাইপ্লেনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে ও। পরমুহূর্তে বুলেট প্রবাহের মাঝখানে পড়ে গেল ক্যাটালিনা। ফ্লাইং বোটের আবরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকে গেল বুলেট। কিন্তু শেষ মুহূর্তে প্রবাহ থেকে বেরিয়ে

আসার জন্যে ঝরা পাতার মত ডাইভ দিয়ে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ক্যাটালিনা। বুলেট লাগল বটে, কিন্তু তাৎক্ষণিক উপস্থিত বুদ্ধির জোরে বুলেটের মূল প্রবাহটাকে এড়িয়ে যেতে পারল রানা।

একটানা আট মিনিট চলল ওদের আকাশ যুদ্ধ। এয়ারফোর্সের লোকেরা ফিল্ডে দাঁড়িয়ে চাক্ষুষ করল এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ধীরে ধীরে ডগফাইট সরে গেল পুব দিকে, তারপর শুরু হলো ফাইন্যাল রাউন্ড।

রানার কপালের মসৃণ চামড়ায় মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটেছে। শত্রুকে ছোট করে দেখছে না ও, তার ক্ষিপ্রতা বরং শঙ্কিত করে তুলেছে ওকে; তবু অস্থির না হয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার পক্ষপাতী ও, যতক্ষণ না বুঝতে পারবে মোক্ষম সময় উপস্থিত হয়েছে তার আগে আঘাত হানতে রাজি নয়। এবং সময়টা যখন এল, সম্পূর্ণ তৈরি তখন রানা।

ওকে ফাঁকি দিয়ে ক্যাটালিনার পিছনে এবং খানিকটা ওপরে উঠে গেছে বাইপ্লেন। ক্যাটালিনার গতি রানা কমালও না, বাড়ালও না, যা ছিল তাই রাখল। উপস্থিত পজিশন জিতে যাবারই নামান্তর মনে করে ক্যাটালিনার উঁচু টেইল সেকশনের পঞ্চাশ গজের মধ্যে চলে এল অ্যালব্যাট্রসের পাইলট। কিন্তু বাইপ্লেনের জোড়া মেশিনগান গর্জে ওঠার আগেই থ্রটল পিছিয়ে নিয়ে এসে ফ্ল্যাপগুলো নিচু করে দিল রানা, গতি কমিয়ে নিয়ে এসে ক্যাটালিনাকে প্রায় দাঁড় করিয়ে ফেলল শূন্যে। বিস্ময়ের আরেকটা ধাক্কা খেল বাইপ্লেনের পাইলট। তার মেশিনগানের গুলি ক্যাটালিনার অনেক ওপর দিয়ে বেরিয়ে গেল। বাঁক নেবার সময় পেল না, বাইপ্লেন নিজেও ক্যাটালিনার ওপর দিয়ে ছুটে গেল সামনের দিকে। এই সুবর্ণ সুযোগ কেন ছাড়বে রানা? প্রায় পয়েন্ট-ব্ল্যাংক রেঞ্জ থেকে তার হাতে গর্জে উঠল কারবাইন, কয়েক জায়গায় জখম হলো অ্যালব্যাট্রসের ইঞ্জিন। রানার বো-র সামনে কাত হয়ে পড়ল অ্যালব্যাট্রস। একজন বীরের প্রতি আরেকজন বীরের যে সহজাত শ্রদ্ধা থাকে হঠাৎ সেটা রানার অন্তরে উথলে উঠল—দেখল, খোলা ককপিটে বসা পাইলট এক ঝটকায় তার গগলস কপালে তুলে দিয়ে দ্রুত একটা স্যালুট ঠুকল ওকে উদ্দেশ্য করে। এরপর গোলাপী অ্যালব্যাট্রস আর তার রহস্যময় পাইলট বাঁক নিয়ে ছুটে চলল দ্বীপের ওপর দিয়ে পশ্চিম দিকে, পিছনে রেখে গেল মোটা কালো ধোঁয়ার একটা ধারা।

শূন্যে প্রায় স্থির হওয়া অবস্থা থেকে নিচের দিকে ডাইভ দিল ক্যাটালিনা, সেটাকে নিজের আয়ত্তে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে কন্ট্রোলের ওপর এক রকম ঝাঁপিয়ে পড়ল রানা। মুহূর্তের জন্যে নার্ভাস হয়ে পড়ল ও, কিন্তু তারপরই সামলে নিল পতনটা। এরপর প্লেন নিয়ে আকাশের অনেক ওপরে উঠে এল ও। এক নাগাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঠে এসে সোজা করল ক্যাটালিনাকে, অ্যালব্যাট্রসের খোঁজে চোখ বুলাল দ্বীপ এবং সাগরের বুকে। কই, কোথায়? মলটিজ ক্রস আঁকা গোলাপী বাইপ্লেনটা কোথাও নেই। যেন বাতাসে মিলিয়ে গেছে।

এই মুহূর্তে জরুরী কোন সমস্যা নেই বলেই বোধহয়, রানার মনের ভেতর নানা জল্পনা কল্পনার আনাগোনা শুরু হয়ে গেল। খুঁত খুঁত করে উঠল মন। কেন তা, ও নিজেও জানে না, অ্যালব্যাট্রসটাকে চেনা চেনা লেগেছে ওর। ভুলে যাওয়া

অতীত থেকে যেন ওর ঘাড় মটকাবার জন্যে বর্তমানে ফিরে এসেছে ভূতটা। তবে অনুভূতিটা যেমন হঠাৎ করে এল তেমনি হঠাৎ করেই ছেড়ে গেল ওকে। সারা শরীর ঢিল করে দিয়ে বুক ভরে শ্বাস টানল ও। উত্তেজনা ঝরে পড়ার সাথে সাথে হালকা হয়ে এল মন।

'বলো, বীরোত্তম খেতাবটা কখন পাচ্ছি আমি?' কেবিনের দোরগোড়ায় দেখা গেল রেন নেলসনকে।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। দেখল, বেনের কপালের পাশে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা একটা ক্ষত থেকে অলস গতিতে রক্ত বেরিয়ে আসছে, কিন্তু তার সারা মুখে ছড়িয়ে থাকা হাসিটা বরাবরের মতই অম্লান।

'রক্ত কিসের?'

এগিয়ে এসে কো-পাইলটের সীটে বসল বেন। 'তার আগে জবাব দাও, কার কাছ থেকে শুনেছ যে ক্যাটালিনা দিয়ে লূপ করা যায়?'

রানার চোখ জোড়া ক্ষীণ একটু আলোকিত হয়ে উঠল। আমতা আমতা করে বলল, 'না···মানে, তখন মনে হলো এছাড়া আর কোন উপায় নেই···তা, ঘটনাটা কি?'

'ফের যদি কখনও লূপ করার সাধ হয়, তার আগে দয়া করে সাবধান করে দিয়ো প্যাসেঞ্জারকে। কম করেও ডজন খানেক ড্রপ খেয়েছি কেবিনের ভেতর।'

'কিসের সাথে ধাক্কা খেয়ে···?'

'এরপরও জানার কৌতূহল আছে তোমার?'

'না, মানে···'

মুখ হাঁড়ি করে উত্তর দিল বেন, 'আমার কপালও ছেড়ে দেয়নি। টয়লেটের দরজায় পিতলের হাতল ছিল, এখন সেটা নেই।'

হেসে উঠল রানা। ওর সাথে যোগ দিল বেনও।

তারপর ধীরে ধীরে গুরুতর পরিস্থিতির থমথমে ভাবটা ফিরে এল ককপিটের ভেতর। একটানা তেরো ঘণ্টার ওপর প্লেন চালিয়ে আসছে রানা, তারপর বিনা প্রস্তুতিতে বাইপ্লেনটার সাথে লড়তে গিয়ে রিজার্ভ শক্তি যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাও নিঃশেষ হয়ে গেছে। ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল ও। সুপের মিষ্টি গন্ধ পেল নাকে, চোখের সামনে দুলতে লাগল ঠাণ্ডা পানি ঝরা শাওয়ার, ধবধবে সাদা চাদর ঢাকা নরম বিছানা। ককপিট জানালা দিয়ে নিচে ব্র্যাডি ফিল্ডের দিকে তাকাল ও। মনে পড়ল, ওদের গন্তব্য ছিল ব্লু লিডার।

'পানিতে নামলে ডুবে যেতে পারে ক্যাটালিনা,' বলল ও। 'আমাদের খোল কয়েক জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে। ব্র্যাডি ফিল্ডেই ল্যান্ড করতে হবে।'

'সেটাই ভাল,' বলল বেন। 'এত বেশি গর্ব অনুভব করছি যে এখন যদি আমাকে পানি সেচতে বাধ্য করা হয়, হয়তো আত্মহত্যা করে বসব।'

বিধ্বস্ত এয়ারক্রাফটগুলোর ওপর একটা চক্কর দিল ক্যাটালিনা, তারপর নাক নিচু করে নামতে শুরু করল রানওয়েতে। টাচ-ডাউনের সময় ঝাঁকি খেল প্লেন, আগুনের কুণ্ডলীগুলোকে এড়িয়ে অ্যাপ্রনের শেষ প্রান্তে থামল সেটা। ইগনিশন সুইচ অফ করে দিল রানা। সিলভার ব্লেডের জোড়া প্রপেলার ঘোরা শেষ করে

থামল এক সময়। ঈজিয়ান সূর্যের রোদ লেগে চকচক করতে লাগল সেগুলো। কোথাও কোন শব্দ নেই আর, সব শান্ত, স্থির হয়ে আছে। তেরো ঘণ্টা পর এই প্রথম নিস্তব্ধতা নেমে এল ককপিটের ভেতর, আওয়াজ এবং কাঁপন দুটোই থেমে গেছে। একচুল নড়ল না ওরা, কান এবং সারা শরীরে ধীরে ধীরে সয়ে আসছে নীরব, নিষ্কম্প পরিবেশটা।

পাশের জানালার কাঁচ সরিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বেস ফায়ারম্যানরা আগুন আয়ত্তে আনার জন্যে অমানুষিক খাটছে। রোডম্যাপের গায়ে আঁকা অলি-গলি-রাস্তার মত রানওয়ের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে হোস পাইপ। লোকজন ছুটোছুটি করছে, চড়া গলায় নির্দেশ দিচ্ছে। এফ-ওয়ান হানড্রেড ফাইভ জেটগুলোর আগুন প্রায় নিভিয়ে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এখনও দাউ দাউ করে জ্বলছে একটা কার্গোমাস্টার।

'দেখছ?' জানতে চাইল বেন।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের ওপর ঝুঁকে বেনের দিকের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। রানওয়ে ধরে সোজা ওদের দিকে ছুটে আসছে নীল রঙের একটা এয়ার ফোর্স স্টেশন ওয়াগন, তাতে কয়েকজন অফিসারকে দেখা গেল। গাড়ির পিছু পিছু ছুটে আসছে কম করেও ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ জন এয়ার ফোর্স কর্মী। শুধু ছুটে আসছে বললে কিছুই বলা হয় না। উল্লাসে বিস্ফোরিত হতে দেখা গেল গোটা দলটাকে। উদ্বাহু নৃত্য করছে সবাই।

'ধন্য মনে হচ্ছে নিজেকে,' গম্ভীর সুরে বলল বেন। 'স্বপ্নেও ভাবিনি আমার কপালে এমন অভ্যর্থনা কমিটি আছে!' একটা রুমাল দিয়ে কপালের পাশের ক্ষতটা চেপে ধরল সে। রক্তে লাল হয়ে উঠতে জানালা দিয়ে রানওয়ের ওপর ফেলে দিল সেটা। মুখ ফিরিয়ে সৈকতের দিকে তাকাল সে। দূর সাগরে হারিয়ে গেল তার দৃষ্টি, চেহারায় উদাস একটা ভাব ফুটে উঠল। খানিক পর রানার দিকে ফিরল সে। 'এই যে এই মুহূর্তে এখানে আমরা বসে আছি, সেটা আমাদের নেহাতই সৌভাগ্য, তাই না?'

'হ্যাঁ,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। 'ওপরে থাকতে অন্তত বার দুয়েক মনে হয়েছে আমার, বাঁচার কোন আশা নেই।'

'জানতে ইচ্ছে করে, এসবের মানে কি?'

কৌতূহল ঝিক্ করে উঠল রানার চোখেও। 'গোলাপী অ্যালব্যাট্রসই বোধহয় রহস্যের একমাত্র সূত্র।'

'অমন জ্বলজ্বলে গোলাপী রঙের প্লেন জীবনে দেখিনি,' বলল বেন। 'এই রঙের কি কোন তাৎপর্য আছে?'

'বোঝা গেল, এভিয়েশন হিস্ট্রি মন দিয়ে পড়োনি,' কটাক্ষ করল রানা। 'পড়লে মনে থাকত, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান পাইলটদের যার যার রুচি মত প্লেন রঙ করার অনুমতি দেয়া হত।'

হঠাৎ ব্রেক করায় হড়কে গেল স্টেশনওয়াগনের চাকা, কংক্রিটের সাথে রাবারের তীব্র ঘষা লাগায় তীক্ষ্ণ আওয়াজ উঠল, বিরাট সিলভার ফ্লাইং বোটের পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল গাড়ি। ভেতরে যেন বিস্ফোরণ হলো; এক সাথে খুলে গেল

চারটে দরজা। হৈ-হুল্লোড় করতে করতে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল প্যাসেঞ্জাররা। ছুটে এসে প্লেনের অ্যালুমিনিয়াম হ্যাচের গায়ে দমাদম কিল-চড়-ঘুসি মারতে শুরু করল। অপর দলটাও পৌঁছুল। এয়ারক্রাফটটাকে ঘিরে ফেলল তারা। উল্লাসের আতিশয্যে গলা ফাটাচ্ছে সবাই। ককপিটের উদ্দেশে হাত নাড়ছে।

নিজের সীটে বসে থাকল রানা, জানালার নিচে দাঁড়ানো লোকগুলোকে উদ্দেশ্য করে হাত নাড়ল। শরীরটা ক্লান্ত এবং অসাড় লাগছে ওর, কিন্তু মাথার ভেতরটা পুরোমাত্রায় সজাগ। স্মৃতির মণিকোঠা থেকে হঠাৎ করেই বেরিয়ে এল একটা লেখা। বিড় বিড় করে লেখাটা উচ্চারণ করল রানা—'দি হক (HAWK) অভ ম্যাসেডোনিয়া।'

দরজার কাছ থেকে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল বেন। 'কি বললে?'

ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। 'না···না, কিছু না!' সীট ছেড়ে উঠে পড়ল ও। 'চলো, একটু ঘুমাতে পারা যায় কিনা দেখি।'

চার

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে বলতে পারবে না রানা, চোখ মেলে অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। একবার মনে হলো শুধু একটু তন্দ্রা মত এসেছিল, তারপরই সন্দেহ করল, পাঁচ-সাত ঘণ্টার কম ঘুমায়নি। কেউ যখন বিরক্ত করছে না, আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে অসুবিধে কোথায়? চোখ বুজল ও, এবং আবার ঘুমিয়ে পড়তে শুরু করল। কিন্তু এবারের ঘুমটা কোনমতেই গভীর হতে চাইল না, তন্দ্রা মত একটা পর্যায়ে স্থির হয়ে থাকল। এই আধো ঘুম আধো জাগরণের মধ্যে আবার সেই লেখাটা দেখতে পেল ও।

ইমপিরিয়াল ওয়র মিউজিয়ামের গ্যালারি। অনেক ফটোগ্রাফ পাশাপাশি ঝুলছে, তার মধ্যে একটা দৃষ্টি আকর্ষণ করল ওর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কার একটা ফাইটার প্লেনের পাশে পোজ নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে একজন অ্যাভিয়েটর। পরনে ফ্লাইং স্যুট, হাতটা রয়েছে ধবধবে সাদা একটা জার্মান শেফার্ড কুকুরের মাথায়। মুখ আর জিভ দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, কুকুরটা হাঁপাচ্ছে, চোখ তুলে তাকিয়ে আছে পাইলটের দিকে, দৃষ্টিতে প্রভু-ভক্তি এবং প্রশংসা। ফটোর নিচে ক্যাপসন। এই লেখাটাই ওর স্মৃতি মণিকোঠা থেকে উঠে এসেছিল। ক্যাপসনটা এই রকম:

'দি হক অভ ম্যাসেডোনিয়া

লেফটেন্যান্ট অ্যালবার্ট কেসারলিং, অ্যাটেইনড থারটি-টু ভিক্টোরিজ ওভার দি অ্যালাইজ অন দি ম্যাসেডোনিয়ান ফ্রন্ট; ওয়ান অভ দি আউটস্ট্যান্ডিং এসেস অফ দি গ্রেট ওয়র। প্রিজিউমড্ শট ডাউন অ্যান্ড লস্ট ইন দা ঈজিয়ান সী অন জুলাই ফিফটিন, নাইনটিন এইটিন।'

তন্দ্রার ভাবটা চট করে ছুটে গেল। কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে শরীরটাকে উঁচু করল ও, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল এয়ার ফোর্স কটের মেটাল স্প্রীঙ। হাত বাড়িয়ে টেবিল থেকে তুলে নিল ওমেগা হাতঘড়ি। চোখের সামনে লিউমিনাস ডায়াল ধরে

দেখল, চারটে নয়। উঠে বসল ও। কট থেকে পা দুটো ঝুলিয়ে দিল মেঝের দিকে। ঘড়ির পাশেই ঢাকনি চাপা দেয়া কাঁচের গ্লাস, সেটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করল পানিটুকু। কট থেকে নেমে আড়মোড়া ভাঙতে গিয়ে ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল ও। বেনকে সাথে নিয়ে ক্যাটালিনা থেকে রানওয়েতে নামতেই এয়ার বেস অফিসার আর ক্রুরা ওদের পিঠ চাপড়াতে শুরু করে। পিঠের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে ওরা। পেশীতে একটু টান পড়লেই ব্যথায় দম আটকে আসছে। এই কষ্টের মধ্যেও একটা তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল ওর ঠোঁটে। প্রশংসা জিনিসটা সত্যিই ভাল লাগে।

অফিসার্স কোয়ার্টারের জানালা দিয়ে ভেতরে চাঁদের আলো ঢুকে পড়েছে, জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভোর রাতের হিমেল বাতাস লাগল চোখে-মুখে। বাইরে বেরিয়ে পড়ার জন্যে ছটফট করে উঠল ওর মনটা। শর্টস জোড়া খুলে দিগম্বর হলো ও, আবছা অন্ধকারে লাগেজ হাতড়ে তছনছ করল সব। আঙুলের ছোঁয়া দিয়ে চিনতে পারল সুইম ট্রাঙ্ক। পরল। তারপর বাথরুমে ঢুকে কাঁধে একটা তোয়ালে ফেলে বেরিয়ে এল রাতের অন্ধকারে।

চারদিকে গোছা গোছা সাদা ফুলের মত ফুটে আছে মেডিটেরেনিয়ানের জ্যোছনা। দূর থেকে ভেসে এল সাগরের হা-হুতাশ। কোমল পরশ দিয়ে ওর মাথার চুলগুলো এলোমেলো করে দিল ঠাণ্ডা বাতাস। গোটা আকাশ জুড়ে তারার মেলা বসেছে। দূর-আকাশটাকে কালো ভেলভেটের মত লাগল, তার ওপর সাদা নকশার মত লম্বা হয়ে আছে ছায়াপথটা। বিশ্ব চরাচর যেন স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে এখানে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য আকণ্ঠ পান করলেও তৃষ্ণা মেটে না। কেমন যেন উদাস, বিষণ্ন হয়ে পড়ল রানা। সব মানুষের ভেতরে একটা কবি-মন থাকে, রানার সেই মনটা নিঃশব্দে গেয়ে উঠল, মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে···। বেঁচে আছে, সেজন্যে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। সেই সাথে বিষাদে ভরে উঠল মন, কারণ এই মায়া ক্ষণিকের। একদিন যেতেই হবে চলে।

নিজের অজান্তেই ভেতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। ধীর পায়ে এগোল রানা। অফিসার্স কোয়ার্টার থেকে সরু একটা পথ মেইন গেট পর্যন্ত চলে গেছে। খালি রানওয়ের দিকে চোখ পড়তে কয়েক মুহূর্তের জন্যে দাঁড়াল ও। রানওয়ের কিনারা চিহ্নিত করে রেখেছে বহু রঙা আলোর অসংখ্য সারি। সারিগুলোর এখানে সেখানে অন্ধকার ফাঁক দেখা গেল। বুঝল, সিগন্যাল সিস্টেমের কিছু বালব হামলার সময় নষ্ট হয়েছে। তবে, নাইট ফ্লাইটের পাইলটের জন্যে আলোর প্যাটার্নটা এখনও পাঠযোগ্য। আলোক সারির ফাঁকে গাঢ় রঙের একটা আকৃতি দেখে বুঝল ও, ওটাই ওদের ক্যাটালিনা। প্রকাণ্ড হাঁসের মত অ্যাপ্রনের শেষ প্রান্তে বসে আছে। পরীক্ষায় দেখা গেছে বুলেটগুলো খুব একটা ক্ষতি করতে পারেনি খোলের। ফ্লাইট লাইন মেইন্টেন্যান্স ক্রুরা কথা দিয়েছে সকালে তাদের প্রথম কাজই হবে ক্যাটালিনায় হাত লাগানো। তবে তিন দিনের আগে কাজটা শেষ করা সম্ভব হবে না। বেস কমান্ডিং অফিসার কর্নেল লী কোসকি দেরির জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানিয়েছে, অবশিষ্ট কার্গোমাস্টার আর ক্ষতবিক্ষত জেটগুলো মেরামত করার জন্যে মেইন্টেন্যান্স ক্রুদের ভারী দলটা ব্যস্ত থাকবে। ক্যাটালিনা মেরামত না হওয়া পর্যন্ত এয়ারফোর্স বেসের সম্মানিত মেহমান হিসেবে ব্র্যান্ডি ফিল্ডে ওদের

থেকে যাবার আমন্ত্রণ কর্নেল লী কোসকির তরফ থেকেই আসে। নুমার রিসার্চ শিপ ব্লু-লিডারের লিভিং কোয়ার্টার তেমন প্রশস্ত নয় বলে আমন্ত্রণটা প্রত্যাখ্যান করেনি ওরা। জাহাজ আর তীরের মাঝখানে ওদের সেতু হিসেবে কাজ করবে ব্লু লিডারের হোয়েল বোট।

এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এগোল রানা। মেইন গেটের মাথার ওপর ফ্লাড লাইট। উজ্জ্বল আলোয় চারদিক ভেসে যাচ্ছে।

'এই অন্ধকারে সাঁতার কাটবেন?' হঠাৎ একটা মৃদু গলা শুনল রানা।

গার্ডরুম থেকে এই মাত্র বেরিয়ে এসেছে লোকটা। প্রকাণ্ড গরিলা বললেই চলে। ইউনিফর্ম দেখে বোঝা গেল, এয়ার পুলিস। ঠিক সন্দেহ নয়, তবে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করল রানাকে।

'ভেঙে যাবার পর ঘুমটা আর এল না,' বলেই বুঝল রানা, অজুহাতের মত শোনাল কথাটা।

'দোষ দেয়া যায় না,' সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল এ. পি.। 'এমন একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটার পর ঘুমাতে পারে কেউ?' প্রসঙ্গটা ঘুম বলেই বোধহয় মস্ত একটা হাই তুলল সে।

'সারা রাত একা পাহারায় থাকা, নিশ্চয়ই বোর ফিল করছ তুমি?' জানতে চাইল রানা।

'তা আর বলতে,' খুঁটিয়ে দেখল রানাকে, তার কোমরে ঝোলা হোলস্টারের কাছে চলে গেল একটা হাত। হোলস্টারের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিক। 'বেস থেকে যদি বেরিয়ে যাবার ইচ্ছে থাকে, আপনার পাসটা বরং দেখতে দিন আমাকে।'

'দুঃখিত। পাস নেই।' ব্যাডি ফিল্ডে আসা-যাওয়া করার জন্যে কর্নেল কোসকির কাছ থেকে পাস চেয়ে নিতে ভুলে গেছে রানা।

থমথমে হয়ে উঠল এয়ার পুলিসের চেহারা। 'তাহলে ব্যারাকে ফিরে গিয়ে পাসটা নিয়ে আসুন।' নাকের সামনে থেকে ছোঁ দিয়ে একটা পোকা ধরল সে, মুঠো খুলে ফেলে দিল দূরে।

'আমার আসলে কোন পাসই নেই,' বলল রানা, অসহায় ভঙ্গিতে হাসল একটু।

'আমার সাথে ঠাট্টা করবেন না,' গম্ভীর সুরে বলল এ. পি.। 'পাস ছাড়া গেট দিয়ে কেউ আসা যাওয়া করতে পারে না।'

'আমি পেরেছি।'

এ. পি.-র চেহারায় সন্দেহ ফুটে উঠল। 'মানে? কিভাবে?'

'উড়ে।'

কথাটা শোনা মাত্র এ. পি.-র চেহারায় বিস্ময়ের ছাপ ফুটল। আরেকটা পোকা বসল তার সাদা ক্যাপে, কিন্তু টেরই পেল না। পরমুহূর্তে গলার ভেতর থেকে বিস্মিত আওয়াজ বেরিয়ে এল, 'মাই গড! আপনি, স্যার, ওই ক্যাটালিনার পাইলট!'

মৃদু হাসল রানা। 'অভিযোগ সত্য।'

'আপনার সাথে হ্যান্ডশেক করার সুযোগ পাইনি বলে সেই থেকে আফসোসে মরে যাচ্ছি!' এগিয়ে এসে রানার হাতটা ধরল এ. পি.। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখ। 'প্লেন চালানোর মধ্যেও যে শিল্প থাকতে পারে, সেটা আপনি, স্যার, আমাদের সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন! যদ্দিন বেঁচে থাকব মনে থাকবে!'

'আঁহ্ ছাড়ো, লাগছে!' গরিলার হাতের ভেতর ব্যথা করতে শুরু করেছে রানার আঙুল।

তাড়াতাড়ি রানার হাত ছেড়ে দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনার ভঙ্গিতে হাসল এ. পি.। 'দুঃখিত, স্যার। খুব লেগেছে, স্যার? হঠাৎ আপনার সান্নিধ্য পেয়ে এত খুশি হয়েছি যে...'

এ. পি.-র উচ্ছ্বাসে বাধা দিয়ে বলল রানা, 'ধন্যবাদ। কিন্তু দুঃখ কি জানো, অ্যালব্যাট্রসটাকে ফেলতে পারলাম না!'

'পড়েনি তা আপনি বলতে পারেন না, স্যার! সবাই দেখেছি আমরা, পাহাড়ের ওপর দিয়ে যাবার সময় গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছিল ওটার গা থেকে।'

'তোমার ধারণা পাহাড়ের ওপারে গিয়ে ক্র্যাশ করেছে ওটা?'

'উঁহুঁ,' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল এ. পি.। 'এয়ার পুলিসের গোটা স্কোয়াড্রনকে দিয়ে দ্বীপটা চষে ফেলেছেন কর্নেল কোসকি। সবগুলো জীপ পাঠানো হয়েছিল। দিনের আলো শেষ না হওয়া পর্যন্ত খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি।'

'তাহলে?'

'হয়তো সাগরে পড়ে ডুবে গেছে। কিংবা পড়ার আগে মেইনল্যান্ডে পৌঁছুতে পেরেছিল। তবে থাসোসে যে নেই এ আমি হলপ করে বলতে পারি।' একটু থেমে হঠাৎ জানতে চাইল সে, 'কন্ট্রোল টাওয়ার অপারেটরের খবর শুনেছেন, স্যার? হাসপাতালে মারা গেছে বেচারা।'

মুখে কথা যোগাল না রানার, শুধু চেহারাটা কেমন যেন হয়ে গেল।

'আমি এয়ারম্যান সেকেন্ড ক্লাস গুডি, স্যার।'

'আমি মেজর রানা।'

হতবাক দেখাল এ. পি. কে। 'আপনি অফিসার, স্যার? দুঃখিত, স্যার। জানতাম না! আমি ভেবেছিলাম নুমার আর সবার মত আপনিও একজন সিভিলিয়ান। ঠিক আছে, স্যার, এবারের মত পাস ছাড়াই আপনাকে যেতে দিচ্ছি। কিন্তু ফিরে এসে যত তাড়াতাড়ি পারেন একটা বেস পাস যোগাড় করে নেবেন।'

'অবশ্যই।'

'আটটার সময় আমার জায়গায় অন্য লোক আসবে এখানে,' বলল এ. পি.। 'তার আগে আপনি ফিরে না এলে তাকে আমি আপনার কথা বলে যাব, তাহলে আর ঢুকতে কোন অসুবিধে হবে না আপনার।'

'ধন্যবাদ, গুডি। দেখা হলে আবার গল্প করা যাবে তোমার সাথে, কেমন?' হাত নেড়ে বিদায় নিল রানা। গেট পেরোল। রাস্তা ধরে এগোল সাগরের দিকে।

খানিক দূর এসে ডান দিকের একটা সরু পথ ধরল রানা। মাইল খানেক হেঁটে

খুদে একটা ইনলেটের কাছে পৌঁছুল, ইনলেটের দুদিকে উঁচু হয়ে আছে পাথরের স্তূপ। সরু একটা পায়ে চলা পথ ধরে এগোল ও। একটু পরই পায়ের নিচে নরম বালির স্পর্শ পেল। কাঁধ থেকে তোয়ালেটা ফেলে দিয়ে স্রোত-রেখা পর্যন্ত হেঁটে এল। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল একটা ঢেউ, তার মাথার সাদা ঝুঁটি সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ল বালির ওপর। মুমূর্ষু ঢেউটা মুহূর্তের জন্যে ইতস্তত করে আবার ফিরে যেতে শুরু করল সাগরে। তার ওপর চড়াও হয়ে ছুটে এল পরবর্তী ঢেউ। বাতাসের তেমন কোন দাপট নেই, সাগরও শান্ত। চাঁদের আলো লেগে রুপোর মত ঝকঝক করছে দূরের পানি। সাগর আর আকাশ যেখানে মিলেছে সেই দিগন্তরেখার কাছে ঘন কাল হয়ে আছে অন্ধকার। ধীরে ধীরে পানিতে নেমে পড়ল রানা। তারপর সাঁতার কাটতে শুরু করল। তীর থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

সাগরের কাছে একা এলেই অদ্ভুত একটা অনুভূতি হয় রানার, আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। মনে হলো, আত্মাটা যেন শরীর থেকে বেরিয়ে পড়েছে, এবং ও যেন হয়ে উঠেছে আকৃতিহীন পদার্থহীন একটা অস্তিত্ব। কিভাবে যেন আশ্চর্য পরিষ্কার আর পবিত্র হয়ে উঠল মনটা, সমস্ত কষ্ট আর পরিশ্রম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করল যেন ইন্দ্রিয়গুলো, দূর হয়ে গেল সমস্ত উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, দুর্ভাবনা। স্পর্শবোধ এবং ঘ্রাণ শক্তি একরকম হারিয়েই ফেলল বলা যায়, কিন্তু শ্রবণ শক্তি হয়ে উঠল শতগুণ প্রখর। নীরবতার ভেতর কোন শব্দ থাকে না, কিন্তু সেই শব্দহীনতাকে কান দিয়ে অনুভব করা যায়। ঠিক তাই করল রানা। জীবনের সমস্ত ব্যর্থতা, সমস্ত বিজয়, তার সব ভালবাসা এবং ঘৃণা, এমনকি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত বিলীন হয়ে গেল সেই শব্দহীনতার ভেতর।

চিৎ হয়ে মড়ার মত পানিতে প্রায় ঘণ্টাখানেক ভেসে থাকল ও। তারপর ছোট একটা ঢেউ এসে চাপড় দিল ওর গালে, কয়েক ফোঁটা লোনা পানি ঢুকে গেল নাকের ভেতর। কয়েকটা হাঁচি দিল ও, ধীরে ধীরে ফিরে পেল শারীরিক অনুভূতি-গুলো। গতি এবং দিক পরখ করে দেখল না, চিৎ সাঁতার দিয়ে এগোতে শুরু করল তীরের দিকে। এক সময় বালির স্পর্শ লাগল পায়ে। মুখ তুলে আকাশে তাকাল, দেখল, এক এক করে নিভে যেতে শুরু করেছে তারাগুলো, সেই সাথে পুবাকাশে ফুটতে শুরু করেছে নতুন দিনের আলোর আভাস। চোখ বুজে শুয়ে থাকল সৈকতে। এইভাবে কেটে গেল আরও পনেরো মিনিট। কিছুই দেখল না, কোন শব্দও পায়নি, কিন্তু হঠাৎ ওর মন কেমন যেন সচকিত হয়ে উঠল। যেমন চোখ বুজে শুয়ে ছিল তেমনি শুয়ে থাকল, এক চুল নড়ল না। কিন্তু কিছু একটার উপস্থিতি স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে ও। কি, জানে না। কোথায়, তাও বলতে পারবে না। ধীরে ধীরে, একটু একটু করে মেলতে শুরু করল চোখ জোড়া। ছায়া ছায়া একটা মূর্তি দেখতে পেল, অস্পষ্ট। একটা উঁচু পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে ওর দিকে ঝুঁকে আছে। ভোরের ক্ষীণ আলোয় ভাল করে তাকাতে দেখল, একটা নারীমূর্তি।

'গুড মর্নিং,' বলে বালির ওপর উঠে বসল রানা।

আঁতকে ওঠার আওয়াজ পেল রানা।

'গড, ওহ্ গড!' রুদ্ধশ্বাসে বলল মেয়েটা। মুখের কাছে উঠে গেল একটা হাত, যেন চিৎকার ঠেকাতে চাইছে।

আলো খুব কম, তাই মেয়েটার চোখে আতঙ্কের ছাপ দেখতে পেল না রানা; কিন্তু মনে মনে জানে ছাপটা ওখানে আছে। 'দুঃখিত,' নরম সুরে বলল ও। 'তোমাকে আমি চমকে দিতে চাইনি।'

ধীরে ধীরে হাত নামাল মেয়েটা। মুখের ভাষা ফিরে পেতে আরও আধ মিনিট সময় লাগল তার। 'আমি···আমি ভেবেছিলাম মারা গেছ তুমি!'

'দোষ দিতে পারি না,' বলল রানা। 'এই ভোর বেলা কাউকে এভাবে শুয়ে থাকতে দেখলে আমিও ঠিক তাই ভাবতাম।'

'হঠাৎ উঠে বসে কথা বলতে শুরু করলে, ভয়ে আমি যে হার্টফেল করিনি সেটাই আশ্চর্য!'

'নিশ্চয়ই চাও না তোমার ভয় দূর করার জন্যে সত্যি সত্যি মারা যাই আমি?' নিজের রসিকতায় হাসতে গিয়েও হঠাৎ থেমে গেল ও। এতক্ষণে খেয়াল হলো, মেয়েটা ইংরেজীতে কথা বলছে। উচ্চারণটা ব্রিটিশ, কিন্তু জার্মান সুরের ক্ষীণ ছোঁয়া আছে। 'এই যা, পরিচয় করা হয়নি। আমি মাসুদ রানা।'

'আমি মোনা,' বলল মেয়েটা। 'তুমি বেঁচে আছ দেখে আমি যে কি খুশি হয়েছি, মি. মাসুদ রানা!'

মৃদু হেসে একটা হাত বাড়িয়ে দিল রানা। 'এসো না, বালিতে আমার পাশে বসবে, দু'জন মিলে ডেকে তুলি সূর্যটাকে? বন্ধুরা আমাকে শুধু রানা বলে ডাকে।'

মিষ্টি জলতরঙ্গের মত হাসল মোনা। 'ধন্যবাদ। কিন্তু মুশকিল হলো, এখনও তোমাকে আমি ভাল করে দেখতেই পাচ্ছি না। আসলে তুমি কি, জানি না। কি করে বুঝব তুমি সাগরের কোন দৈত্য-দানো নও? কি করে বুঝব, তোমাকে বিশ্বাস করা চলে?'

'তাহলে সত্যি কথাটাই বলি। আমাকে আসলে বিশ্বাস করা চলে না। রোজ ঠিক এই সময় ঠিক এই জায়গায় একটা করে কুমারী মেয়ে আমার হাতে লাঞ্ছিত হয়। তাদের মোট সংখ্যা দু'হাজারের কম হবে না।' পরিচয়ের সূচনাতেই এই রকম একটা রসিকতা একটু হয়তো বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, কিন্তু রানা জানে, কোন মেয়ের ব্যক্তিত্ব পরখ করার জন্যে এটা খুব কাজ দেয়।

'দু' হাজার এক নম্বর হতে আমার কোন আপত্তি ছিল না, কিন্তু মুশকিল হলো আমি কুমারী নই!' আলো যেটুকু ফুটেছে তাতে মেয়েটার হাসির সবটুকু দেখা না গেলেও দু'সারি সাদা দাঁতের বেশ কয়েকটা দেখতে পেল রানা।

'ওটা কোন মুশকিলই নয়!' উৎসাহের সাথে বলল রানা। 'এসব ব্যাপারে আমি খুব উদার। শুধু একটা ব্যাপার খেয়াল রাখতে বলব, দু'হাজার এক নম্বর যে ধোয়া তুলসী পাতা নয়, এই তথ্যটা গোপন রাখতে হবে তোমাকে, তা না হলে দৈত্য-দানব হিসেবে আমার যে খ্যাতি আছে সেটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।'

ছোট একটা লাফ দিয়ে রানার পাশে, বালির ওপর নেমে এল মোনা। ওর কাছ থেকে এক হাত দূরে হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতার ওপর বসল সে। এরপরের অনেকটা সময় নিঃশব্দে কেটে গেল। হাসি থেমে গেছে দু'জনের। বেশির ভাগ সময় তাকিয়ে থাকল দিগন্তরেখার ওপর। দিনের আলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল। লাল হয়ে উঠল পূর্ব দিগন্ত। মাঝে মধ্যে দিগন্তরেখার ওপর থেকে চোখ

ফিরিয়ে নিয়ে এসে পরস্পরের দিকে তাকাল ওরা। তারপর ওরা দেখল, লাফ দিয়ে দিগন্তরেখার ওপর উঠে এল গোলাপী একটা বল। একটু পরেই সোনালী আলোয় ঝলমল করে উঠল প্রকৃতি। মোনার দিকে তাকাল রানা। বয়স আন্দাজ করতে গিয়ে হিমশিম খেয়ে গেল ও। হয়তো বিশ, কিন্তু ত্রিশ হওয়াও বিচিত্র নয়। রক্ত-রঙা একটা বিকিনি পরে আছে। সেটা খুব বেশি ছোট নয়, তবে নাভির দু'ইঞ্চি নিচ থেকে শুরু হয়েছে। কাপড়টা সম্ভবত সাটিন, মোনার শরীরের সাথে চামড়ার একটা বহিরাবরণের মত সেঁটে আছে। শরীরের গঠনটা খুবই ভাল। মসৃণ তলপেট, সরু কোমর, সুগঠিত বুক। পা দুটো লম্বা, মাখনের মত একটা কোমলতা আছে চামড়ায়। ওর দৃষ্টি আবার ফিরে এল মুখে। গ্রীক দেবীর বৈশিষ্ট্য আছে চেহারায়। কিন্তু একটা খুঁতও আছে। কপালের পাশে ছোট লাল একটা জরুল। যদিও কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল দিয়ে ইচ্ছে করলেই সেটা ঢেকে নিতে পারে মোনা।

হঠাৎ ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে, রানা তাকে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে দেখে ফিক করে হেসে ফেলল, বলল, 'তোমার না সূর্য ওঠা দেখার কথা?'

'সূর্যোদয় অনেক দেখেছি, কিন্তু অ্যাফ্রোডাইটকে এই প্রথম দেখছি।' রানা দেখল, প্রশংসা শুনে আনন্দ ঝিক্ করে উঠল মোনার দু'চোখে।

'ফ্ল্যাটারির জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু তোমার একটু ভুল হয়েছে। অ্যাফ্রোডাইট প্রেম আর সৌন্দর্যের গ্রীক দেবী, কিন্তু আমি মাত্র হাফ গ্রীক।'

'বাকি অর্ধেক?'

'আমার মা জার্মান ছিলেন।'

'বাবার আদল পেয়েছ, সেজন্যে আমি খুশি!'

কৃত্রিম আতঙ্কে চোখ বিস্ফারিত করল মোনা। 'নানা যদি এই কথা শোনে রে!'

'খুব রাগী বুঝি?'

'ভীষণ!' তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'থাসোসে এই নানার কাছেই তো এসেছি আমি।'

'ও, তুমি তাহলে এখানে থাকো না?'

'না। আমার জন্ম অবশ্য এখানেই, কিন্তু সেই ছোটবেলা থেকে মানুষ হয়েছি ইংল্যান্ডে।'

'তারপর?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল মোনা, 'তারপর মানে?'

'সুন্দরী মেয়েদের গল্প শুনতে ভাল লাগে আমার, আপত্তি না থাকলে শোনাতে পারো,' বলল রানা।

'বলার মত কোন গল্প নেই আমার,' ম্লান গলায় বলল মোনা। 'মাথায় ভূত ঢুকেছিল, ষোলোয় পা দিতে না দিতে প্রেমে পড়ে বিয়ে করে ফেললাম এক রেসিং মটরিস্টকে। বিয়ের তিন মাস পর, এক বৃষ্টির রাতে, গাড়ি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেল ও।' একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল সে, 'ভালই···' কিন্তু বাধা দিল রানা।

'দুঃখিত,' অপ্রতিভ সুরে বলল রানা। 'তোমার জীবনে এই রকম একটা ঘটনা আছে জানলে গল্প শোনার বায়না ধরতাম না। কতদিন আগের ঘটনা?'

'আট বছর।'

'তারপর আর কারও সাথে তোমার···?'

'সবটা কিন্তু বলতে দাওনি তুমি,' বলল মোনা। 'মারা গেল ও, প্রথম তিন দিন আমি অজ্ঞান হয়ে ছিলাম। তারপর জানলাম, যার শোকে পাগল হবার দশা হয়েছে আমার, তার ছেলে-বউ সবই আছে। তার মানে, আমি তার দ্বিতীয় বউ ছিলাম।'

'মাই গড!' আঁতকে উঠল রানা।

'কেমন লাগল আমার গল্প?'

'তারপর থেকে আর কারও প্রেমে পড়োনি?' জানতে চাইল রানা।

'পড়িনি, পড়বও না!' তিক্ত স্বরে বলল মোনা। 'কিছু মনে করো না, তোমাদের পুরুষ জাতটার ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি আমি।'

'তার মানে কি সেই থেকে ধারে কাছে ঘেঁষতে দাওনি কাউকে?'

'প্রশ্নই ওঠে না!'

হঠাৎ রেগে গেল রানা। আট বছর ধরে এই রকম মন মাতানো সুন্দরী একটা মেয়ে নিজের রূপ-যৌবনের অপচয় করে আসছে, হদ্দ বোকার মত একজন প্রতারকের ওপর অভিমান করে বঞ্চিত করছে নিজেকে, ভাবতে গিয়ে অসহ্য লাগল ওর। 'তোমাকে আমার ঠাস করে একটা চড় লাগাতে ইচ্ছে করছে!'

রানার গলা শুনে প্রায় চমকে উঠল মোনা। 'কেন, কি করলাম আমি?'

'এক নম্বরের বোকা না হলে এভাবে কেউ ঠকায় নিজেকে?' বলল রানা। 'প্রতারক লোকটাকে যদি ভুলে যেতে পারতে, সেটাই হত তার ওপর সত্যিকার প্রতিশোধ। কিন্তু তুমি ঠিক উল্টোটা করছ। তার প্রতারণার কথা মনে পুষে রেখে জীবনের সবচেয়ে মধুর সময়টাকে অপচয় করছ। এই যে আত্মাকে কষ্ট দেয়া, এর পরিণতি কিন্তু ভাল নয়।'

অদ্ভুত এক বিহ্বল ভাব ফুটে উঠল মোনার চেহারায়, যেন কি হারিয়েছে হঠাৎ তা উপলব্ধি করতে পেরে হতভম্ব হয়ে গেছে সে। রানার মুখের দিকে ঝাড়া এক মিনিট তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে বলল, 'এভাবে কোন দিন ভাবিনি···তুমি, তু-মি বোধহয় ঠিকই বলেছ···' হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢাকল সে। কেঁপে কেঁপে উঠল বোলা পিঠটা।

বাধা না দিয়ে অনেকক্ষণ মোনাকে কাঁদতে দিল রানা। এক সময় হাত নামাল সে, পানিতে ভেজা মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। ছলছল চোখে ভয় পাওয়া ছোট মেয়ের অসহায় দৃষ্টি। তার কাঁধ ধরে আকর্ষণ করতে যাবে রানা, মোনা নিজেই রানার দিকে ঢিল করে দিল শরীরটাকে। নাকে নাকে ঘষা খেল, চোখে চোখে তাকিয়ে থাকল ওরা। কমলার কোষার মত, নরম, ভেজা ভেজা ঠোঁট জোড়া একটু ফাঁক করল মোনা। চুমো খেল রানা।

তারপর দু'হাত দিয়ে তাকে বুকে তুলে নিয়ে সৈকত ধরে পাথরের দিকে হাঁটতে শুরু করল রানা। রোদের আড়ালে চলে এসে ঝুরঝুরে নরম বালির ওপর শুইয়ে দিল তাকে। মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল একজোড়া গাংচিল। একটা লম্বা গলার পাখি দূরের একটা উঁচু পাথর থেকে মাঝে মধ্যে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল ওদের দিকে। ওদেরকে ঢেকে রাখা ছায়াটা ধীরে ধীরে ছোট হয়ে এল। পাথরের আড়াল থেকে একটা ফিশিং বোটকে চলে যেতে দেখল ওরা। জেলেরা মাছ ধরতেই ব্যস্ত,

তীরের দিকে কি হচ্ছে না হচ্ছে খেয়াল করার সময় নেই। এক সময় উঠে বসল রানা। আধবোজা চোখে, সারা মুখে তৃপ্তির হাসি নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে মোনা।

'মাফ চাইব নাকি ধন্যবাদ দাবি করব, ঠিক বুঝতে পারছি না,' মৃদু হেসে বলল রানা।

'দুটোই গ্রহণ করো, প্লীজ,' ফিসফিস করে বলল মোনা।

ঝুঁকে মোনার চোখের পাতায় আলতোভাবে চুমো খেল রানা। 'আট বছর ধরে কি হারিয়েছ, বুঝতে পারছ নিশ্চয়?'

'পরদেশী, তুমি আমার মন ভাল করে দিয়েছ,' রানার একটা হাত তুলে নিয়ে বুকের মাঝখানে চেপে ধরল মোনা। 'বলো, তোমার জন্যে কি করতে পারি আমি?'

'তোমার মন ভাল করার চাকরিটা পেলে মন্দ হত না,' মুচকি হাসল রানা। 'অবশ্য যদি কথা দাও ঘন ঘন মন খারাপ করবে তোমার।'

'এ-মা, কি লোভী তুমি!' মিষ্টি জলতরঙ্গের মত ঝিরঝির করে হাসল মোনা। 'শোনো, সহজে কিন্তু আমার হাত থেকে মুক্তি নেই তোমার। আজ রাতে নানার বাড়িতে ডিনার খেতে আসছ তুমি।'

'কিন্তু...'

'ভুলে যেয়ো না তুমি আমার ডাক্তার, এবং জেনে রাখো, আজ রাতে আবার আমার মন খারাপ করবে।'

কৃত্রিম খানিকটা ইতস্তত ভাব দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে গেল রানা, 'ঠিক আছে, এত করে যখন বলছ। কখন, কোথায়?'

'ছ'টায় আমার নানার ড্রাইভারকে ব্র্যাডি এয়ার ফিল্ডের গেটে পাঠিয়ে দেব, সে তুলে নিয়ে আসবে তোমাকে।'

রানার ভুরু কপালে উঠল। 'জানলে কিভাবে আমি ব্র্যাডি ফিল্ডে আছি?'

'আমেরিকান উচ্চারণে ইংরেজী বলছ। সবাই জানে দ্বীপের সব আমেরিকানই ওখানে থাকে,' বলল মোনা। রানার হাতটা নিজের বুক থেকে তুলে গালে চেপে ধরল সে। 'কি রকম আশ্চর্য লাগছে সে আমি তোমায় বুঝিয়ে বলতে পারব না, মাসুদ রানা। কি তুমি, কে তুমি কিছুই জানি না, অথচ না চাইতেই সব উজাড় করে দিলাম! কল্পনাতেও ছিল না এই রকম একটা কিছু আমার জীবনে ঘটতে পারে! পরদেশী যুবক, এবার তোমার সম্পর্কে সব কথা বলো আমাকে। কি কাজ করো তুমি এয়ার ফোর্সে? প্লেন ওড়াও? তুমি কি একজন অফিসার?'

চেহারায় সিরিয়াস একটা ভাব ফুটিয়ে তোলার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করল রানা। 'আমি আসলে বেসের গারবেজ কালেক্টর। আবর্জনা, বাতিল জিনিস ইত্যাদি থেকে বেসকে হালকা রাখার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে আমাকে। সোজা কথায় জমাদার।'

অবিশ্বাসে চোখ দুটো বড় বড় করে তুলল মোনা, বলল, 'ধ্যেৎ, তুমি ঠাট্টা করছ! এই রকম স্মার্ট একজন লোক গারবেজ কালেক্টর হতেই পারে না! আর যদি হও-ও, আমি মাইন্ড করব না। তুমি নিশ্চয়ই সার্জেন্ট?'

'উঁহুঁ,' বলল রানা। 'কোন কালেও আমি সার্জেন্ট ছিলাম না।'

হঠাৎ ছোট কিন্তু উজ্জ্বল একটা আলো ঝিক্ করে উঠতে দেখল রানা, প্রায় দুশো ফুট দূরে, মাথাচাড়া দিয়ে থাকা পাথরের স্তূপের কাছে। সম্ভবত চকচকে কিছুতে রোদ লেগেছিল। সেদিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও, কিন্তু আর কিছু দেখল না।

মোনার শরীর ছুঁয়ে আছে রানার হাত, টের পেল আড়ষ্ট হয়ে উঠল মেয়েটার পেশী। 'কি ব্যাপার, রানা?'

'না, কিছু না,' চোখ ফিরিয়ে মোনার দিকে তাকাল ও, হাসল একটু। 'পানিতে কি যেন একটা ভাসতে দেখলাম, কিন্তু ভাল করে দেখার আগেই গায়েব হয়ে গেল।' ঝুঁকে চুমো খেল মোনার কপালে। 'এসো, গোসল সেরে নিই। অনেক আবর্জনা জমা হয়ে পড়ে আছে বেসে, আমি না গেলে কোন কাজই হবে না।'

'আমিও ফিরব। এতক্ষণ না দেখে নানা বোধহয় ছটফট করছে।'

সাগরে গিয়ে নামল দু'জন। সাঁতার কাটল।

'আজকের ব্যাপার কতটা জানবেন নানা?' জানতে চাইল রানা। 'কি বলবে, আমি এমন দাওয়াই দিয়েছি যে এত দিনের খারাপ মন এক নিমেষে ভাল হয়ে গেছে?'

'মাথা খারাপ!' খিল খিল করে হেসে উঠল মোনা। রানার হাত ধরে উঠে এল সাগর থেকে, তারপর হাতটা ছেড়ে দিয়ে টেনেটুনে ঠিকঠাক করে নিল বিকিনিটা।

মুচকি হেসে জানতে চাইল রানা, 'বলতে পারো, কোন পুরুষের সাথে শোবার আগে মেয়েরা অমন আড়ষ্ট হয়ে থাকে কেন? অথচ পরে সাবলীল আর মুক্ত হরিণীর মত উচ্ছল হয়ে ওঠে!'

হালকা ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল মোনা। 'আমার ধারণা, সেক্স আমাদের সমস্ত ক্ষোভ আর নৈরাশ্য ঝরিয়ে দেয়, তাই।'

'সুন্দর বলেছ!' মোনার একটা হাত ধরল রানা। 'চলো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিই তোমাকে।'

'হাঁটতে হাঁটতে ব্যথা ধরে যাবে তোমার পায়ে। লিমিনাস ছাড়িয়ে অনেক দূর পাহাড়ে আমার নানার ভিলা।'

'লিমিনাসটা কোথায়?'

'ওপরে উঠে যাওয়া রাস্তা ধরে ছ'মাইল গেলে ছোট একটা গ্রাম পাবে, ওটাই লিমিনাস।'

খুদে ইনলেটটাকে পিছনে রেখে সরু পথ ধরে ধীরে ধীরে এগোল ওরা। খানিকদূর আসতে একটা গাড়ি দেখল রানা। ওপেন-টপ মিনি-কুপার। ব্রিটিশ রেসিং কার, ধুলোর আবরণের ভেতর সবুজ রঙটা কোনমতে টের পাওয়া যায়।

'ওই যে, আমার গ্র্যান্ড প্রি রেসিং কার।'

'তোমার?'

'গতমাসে লন্ডনে কিনেছি। লি হার্ভে থেকে সারাটা রাস্তা ওটা ছুটিয়েই তো পৌঁচেছি এখানে।'

'বুড়ী নানার সাথে কদ্দিন আছ আর?' জানতে চাইল রানা।

'তিন মাসের ছুটি আছে, কাজেই ছ'হপ্তা এখান থেকে নড়ছি না। রওনা হব বোট নিয়ে, গাড়ি চালিয়ে কন্টিনেন্ট পাড়ি দেয়ার মধ্যে মজা আছে, কিন্তু সাংঘাতিক খাটনি!'

মিনি-কুপারের দরজা খুলে ধরল রানা। গায়ে গা ঘষে ভেতরে ঢুকল মোনা, সীটে বসে একটা হাত রাখল স্টিয়ারিং হুইলে। অপর হাতটা দিয়ে পাশের সীটে পড়ে থাকা হ্যান্ডব্যাগ খুলল, চাবি বের করে ঢোকাল ইগনিশনে। খুক করে কেশে উঠে স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। জানালা দিয়ে গাড়ির ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে মোনার ঠোঁটে চুমু খেল রানা।

তারপর বলল, 'গিয়ে আবার দেখব না তো তোমার নানা বন্দুক নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন?'

'হামলাটা আসবে সম্পূর্ণ অন্য দিক থেকে,' হাসতে হাসতে বলল মোনা। 'এত কথা বলবেন আর শুনতে চাইবেন যে তোমার মনে হবে এর চেয়ে চোদ্দ বছরের জেল ভোগ করাও ভাল। এয়ার ফোর্সের লোকদের ওপর সাংঘাতিক দুর্বলতা নানার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাইলট ছিলেন কিনা!'

'সে কি!' অবাক দেখাল রানাকে। 'তাহলে তো আশির ওপর বয়স···'

'বিরাশি,' গর্বের সাথে বলল মোনা। 'কিন্তু দেখে বিশ্বাস করতে চাইবে না তুমি। মনে হবে, খুব জোর হলে ষাট বছর বয়স। এখনও খেতে বসে এক জোড়া মুরগী, এক পাউন্ড রুটি, হাফ পাউন্ড বাটার, এক হালি ডিম এবং আরও গোটা ছয়েক পদ ছাড়া পেট ভরে না তার। রোগা-পাতলা, কিন্তু গায়ে এখনও প্রচুর শক্তি রাখে।'

'ভয়ই করছে!' কৃত্রিম আতঙ্কে শিউরে উঠে বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পাইলট ছিলেন, তার মানে নিশ্চয়ই যুদ্ধও করেছেন?'

'নিশ্চয়ই। তবে জার্মানীতে নয়, এই গ্রীসে থেকে যুদ্ধ করেছে।'

শরীরের পেশী শক্ত হয়ে উঠল রানার। দরজার ফ্রেমটা এত জোরে চেপে ধরল যে নখের নিচে সাদা হয়ে গেল মাংস। 'তোমার নানার মুখে অ্যালবার্ট কেসারলিঙের নাম শুনেছ কখনও?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল ও।

'কতবার! এক সাথে পেট্রল দিত ওরা,' হাত নেড়ে বিদায় জানাল মোনা। 'আজ রাতে দেখা হবে। গুড বাই।' রানাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল সে।

রাস্তায় উঠে গেল মিনি-কুপার। খানিকদূর ছুটে গিয়ে বাঁক নিল, তারপর অদৃশ্য হয়ে গেল উত্তর দিকে।

ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল রানা, কোথায় পা ফেলছে দেখতে দেখতে ফিরে চলল ব্র্যাডি ফিল্ডের দিকে। দু'পা এগিয়েছে, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। বালির ওপর এক জোড়া জুতো পরা পায়ের ছাপ। জুতোর নিচে মাথামোটা পেরেক লাগানো ছিল, বালির ওপর স্পষ্ট দাগ পড়েছে। আরও দু'জোড়া পায়ের ছাপ দেখল রানা। এ দু'জোড়া খালি পায়ের ছাপ। ওর আর মোনার। কোথাও কোথাও খালি পায়ের দাগগুলোকে জুতো পরা পা দিয়ে মাড়ানো হয়েছে। তবে কি মোনাকে কেউ অনুসরণ করে সৈকত পর্যন্ত গিয়েছিল? মুখ তুলে কপালে হাত রাখল ও, রোদ থেকে

চোখ আড়াল করে দেখতে চেষ্টা করল আকাশের কত ওপরে উঠেছে সূর্য। এমন কিছু বেশি বেলা হয়ে যায়নি; কাজেই জুতো পরা পায়ের দাগটা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিল ও।

কাঁকর আর বালি ছড়ানো পথটা আধাআধি পেরিয়ে এসে পাথরের দিকে ঘুরে গেছে ছাপটা। শক্ত, উঁচু-নিচু জায়গাটা পেরিয়ে এল রানা। উল্টোদিকে বালির ওপর আবার দেখতে পাওয়া গেল দাগটা। এবার ধনুকের মত বেঁকে গেছে রাস্তার দিকে, কিন্তু কাঁকর আর বালি ছড়ানো পথ থেকে ক্রমশ দূরে সরে গেছে। বুনো ঝোপের একটা ডাল লাগল রানার হাতে, কাঁটার ডগা লেগে ছড়ে গেল চামড়া, কিন্তু টেরই পেল না ও। আবার যখন রাস্তায় ফিরে এল, রীতিমত ঘামতে শুরু করেছে। এখানে রাস্তার কিনারা পর্যন্ত এসে অদৃশ্য হয়ে গেছে জুতোর দাগ, কিন্তু রাস্তার ওপর ফুটে রয়েছে টায়ারের দাগ। ধুলোর ওপর পরিষ্কার বরফি-আকৃতির ছাপগুলোর দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল ও। রাস্তার কোনদিকে কোন গাড়ি নেই, ঠিক মাঝখানে তোয়ালেটা বিছিয়ে বসে পড়ল। তারপর গবেষণা শুরু করল।

যে-ই অনুসরণ করে থাকুক মোনাকে, লোকটা এইখানে পার্ক করেছিল তার গাড়ি। এরপর পায়ে হেঁটে মোনার গাড়ির কাছে ফিরে যায়, এবং কাঁকর ছড়ানো পথ ধরে অনুসরণ করে মোনার পায়ের ছাপ। কিন্তু সৈকতে পৌঁছুবার আগেই ওদের গলার আওয়াজ পায় সে, তাই আর সামনে না বেড়ে পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ওদের ওপর চোখ রাখে। তারপর দিনের আলো ফোটার পর পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে ফিরে আসে রাস্তায়।

ধাঁধার উত্তর মোটামুটি পাওয়া গেল। কিন্তু তিনটে প্রশ্ন দেখা দিল সেই সাথে। কে অনুসরণ করছিল মোনাকে? কেন? একটা সম্ভাবনার কথা মনে উঁকি দিতে আপন মনে হাসল রানা। কোন পিপিং টমের কাণ্ড হতে পারে। আড়াল থেকে মেয়েদেরকে লক্ষ্য করা অনেকের কাছেই সাংঘাতিক উত্তেজক একটা ব্যাপার। লোকটা যদি পিপিং টম হয়ে থাকে, ভাগ্যটা তার আশাতীত ভাল বলতে হবে। যা দেখেছে তা দেখবে বলে নিশ্চয়ই আশা করেনি।

কিন্তু তিন নম্বর প্রশ্নটা বিরক্ত করে তুলল রানাকে। পিপিং টমের কাণ্ড বলে ব্যাখ্যা দিলেও, মন সেটা মেনে নিতে চাইল না। চাকার দাগগুলোর দিকে আরেকবার তাকাল ও। সাধারণ কোন গাড়ির চাকা এত বড় হয় না। বেশ ভারী কোন ট্রাকের চাকা। সাগরে নামার পর অন্য দুনিয়ায় চলে গিয়েছিল ও, কাজেই মোনার গাড়ির আওয়াজ ওর শুনতে পাবার কথা নয়। কিন্তু ট্রাকটা ছিল সৈকতের কাছাকাছি। সৈকত থেকে খুব বেশি হলে আড়াইশো ফুট দূরে। ভোরের নিস্তব্ধতার মধ্যে ট্রাকটা স্টার্ট নিল, অথচ ওরা কোন আওয়াজ পেল না, তা কি করে হয়?

খুঁত খুঁতে মন নিয়ে এয়ার বেসের দিকে ফিরে চলল রানা।

পাঁচ

ব্যাড্ডি ফিল্ডের কাছেই দায়সারা গোছের একটা ডক, ইব্রাহিম খালেদ নামে এক

মার্কিন নিগ্রো যুবক ছাব্বিশ-ফুটি ডাবল-এন্ডার হোয়েল বোট নিয়ে অপেক্ষা করছিল রানার জন্যে। লাইন তুলে নিয়ে ব্লু লিডারের দিকে যাত্রা শুরু করল সে। চার সিলিন্ডার বুদা ইঞ্জিন, আট নট গতিতে ছুটিয়ে নিয়ে চলল বোট, ডিজেলের ধোঁয়ায় ডেকের ওপর একটা মেঘ তৈরি হয়ে গেল। সকাল হয়েছে অনেক আগেই, ন'টা বাজতে দু'চার মিনিট বাকি আছে, মৃদু-মন্দ বাতাস থাকলেও তেতে ওঠা রোদটুকু অসহ্য লাগল রানার।

ক্রমশ পিছু হটা তীরের দিকে তাকিয়ে থাকল ও। এক সময় ফেনারেখার কাছে খুদে একটা ময়লার কণার মত দেখাল ডকটাকে। ডেক ছেড়ে উঁচু রেলিঙে উঠে বসল ও। জাহাজের স্টার্নটাকে ঘিরে রেখেছে এই রেলিঙ। শ্যাফটের ধুকধুকানি অনুভব করতে পারছে ও, সোজা নিচের দিকে তাকিয়ে দেখতে পেল পানিতে গর্ত করে নিজের পথ করে নিচ্ছে প্রপেলার। ব্লু লিডার আর যখন মাত্র সিকি মাইল দূরে, রানা লক্ষ্য করল, হেলম থেকে যুবক ক্রুম্যান তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মাফ করবেন, কৌতূহলটা চেপে রাখতে পারছি না,' ইঙ্গিতে রানার বসার আসন, রেলিঙটা দেখাল সে। 'আমার অনুমান মিথ্যে না হলে, ডাবল-এন্ডার বোটে বেশ কিছু সময় কাটিয়েছেন আপনি, তাই না?'

ছেলেটার চেহারায় মার্জিত ভাবটুকু লক্ষ করার মত। অত্যন্ত পরিশীলিত উচ্চারণ। চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত। পরনে শুধু বারমুডা শর্টস, আর কিছু নেই। মৃদু হেসে বলল রানা, 'অনেক দিন আগে এই রকম একটা ছিল আমার।'

'তাহলে নিশ্চয়ই পানির ধারে বাড়ি আপনার?'

'পদ্মা মেঘনা সুরমা যমুনার দেশ আমার, বাংলাদেশ।' বলে মাথা চুলকাল রানা। 'বোধহয় নামও শোনোনি। তবে ডাবল-এন্ডার চালিয়েছি এদিকেই—ইউরোপ, আমেরিকায়।'

'লাজোলায় যখন পোস্ট গ্র্যাজুয়েট করছিলাম, বাড়তি আয়ের জন্যে ছুটিছাটার মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়া, নিউপোর্ট বীচে অনেকবার যাওয়া-আসা হয়েছে। তখন আমি নবীশ ছিলাম বোটে। আমার নাম ইব্রাহিম খালেদ।'

প্রসঙ্গটা অন্যদিকে টেনে নিয়ে এল রানা। 'আচ্ছা, শুনলাম তোমাদের প্রজেক্টে কি নাকি সব গোলমাল হচ্ছে—ব্যাপার কি বলো তো?'

'প্রথম দু'হপ্তা সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু যেই আমরা ইনভেস্টিগেট করার মত সম্ভাবনাময় একটা লোকেশন পেলাম, অমনি নানারকম বিপত্তি শুরু হয়ে গেল—সেই থেকে কাজ বলতে গেলে কিছুই এগোয়নি আমাদের।'

'বিপত্তি মানে?'

'বেশির ভাগই ইকুইপমেন্ট ফেইলিওর। এই যেমন, ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়া, পার্টস গায়েব বা নষ্ট হওয়া, ইত্যাদি।'

ব্লু লিডার কাছে চলে এসেছে, হেলমের দিকে পিছন ফিরে বোর্ডিং ল্যাডারের পাশে বোট ভিড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল খালিদ। চওড়া রেলিঙের ওপর দাঁড়িয়ে বড় ভেসেলটাকে খুঁটিয়ে দেখল রানা। ম্যারিটাইম মান অনুসারে ব্লু লিডারকে ছোট জাহাজই বলতে হবে। আটশো বিশ টন, সব মিলিয়ে একশো বাহান্ন ফুট লম্বা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরও আগে রটরডামের একটা ডাচ শিপইয়ার্ডে প্রথমে এটাকে

সমুদ্রগামী একটা টাগ হিসেবে তৈরি করা হয়েছিল। জার্মানরা লো-ল্যান্ডস আক্রমণ করার পরপরই, ক্রুরা জাহাজটাকে নিয়ে ইংল্যান্ডে চলে আসে। যুদ্ধের পুরো সময়টা অসাধারণ ভাল সার্ভিস দিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেয় জাহাজটা। নাজী ইউ-বোটগুলোর নাকের ডগা দিয়ে টর্পেডো খাওয়া এবং অচল জাহাজ ব্রিটেনের লিভারপুল পোর্টে টেনে নিয়ে আসাই তার কাজ ছিল। যুদ্ধের পর ইংল্যান্ডের কাছ থেকে ফেরত নিয়ে ক্লান্ত জাহাজটার বিধ্বস্ত-প্রায় খোলটা মার্কিন নৌবাহিনীর কাছে বিক্রি করে দেয় ডাচ সরকার। মার্কিন নৌবাহিনী ওটাকে ওয়াশিংটনে মথবল ফ্লিটের সাথে জুড়ে দেয়, তিন যুগের বেশি হবে ওখানেই চুপচাপ বসে ছিল ওটা, একটা গ্রে প্লাস্টিক কফনের নিচে। তারপর খরিদ সূত্রে ওটা চলে এল নুমার হাতে। তারা ওটাকে নতুন করে তৈরি করল। এককালের টাগ হয়ে উঠল আধুনিক ওশেনোগ্রাফিক ভেসেল, নতুন নামকরণ করা হলো ব্লু লিডার। আকাশ এবং জলযান সম্পর্কে বিস্তারিত জানার অদম্য একটা কৌতূহল আছে বলেই শুধু নয়, ব্লু লিডারকে ঘিরে ছোটখাট বিপত্তি দেখা দিচ্ছে বলেও খাসোসে আসার আগেই এর সম্পর্কে এসব কথা জেনে নিয়েছে রানা।

জাহাজের লেজ থেকে নাক পর্যন্ত সাদা রঙ করা, রোদের প্রতিফলন লেগে চোখ ছোট হয়ে গেল রানার। বোর্ডিং ল্যাডার থেকে ডেকে নামল ও। হ্যান্ডশেক করার সময় ওর কাঁধে অপর হাতটা তুলে দিল কমান্ডার হ্যানিবল। জাহাজের স্কিপার এবং প্রোজেক্ট ডিরেক্টর সে। অনেক দিনের পরিচয় রানার সাথে, সম্পর্কও ভাল।

'একটুও বদলাওনি তুমি,' বলল কমান্ডার। 'শুধু চোখ দুটো লাল দেখছি।' পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে বাড়িয়ে দিল রানার দিকে।

'ছেড়ে দিয়েছি,' বলল রানা। তারপর জানতে চাইল, 'শুনলাম তোমার নাকি সমস্যা হচ্ছে?'

গম্ভীর হয়ে উঠল কমান্ডারের চেহারা। 'না হলে কি বেহুদা ওয়াশিংটনের সাহায্য চেয়েছি?'

ক্ষীণ একটু ভুরু কোঁচকাল রানা। কমান্ডারকে যতটুকু চেনে ও, তার কথায় তো ঝাঁঝ বা হঠাৎ রাগের সুর থাকা উচিত নয়। হাস্যোজ্জ্বল, কৌতুকপ্রিয় লোক সে। 'ঠিক আছে,' বলল ও। 'আগে রোদ থেকে গা বাঁচাই, চলো। তারপর ধীরেসুস্থে শোনা যাবে সব।'

হর্ন রিমের চশমাটা চোখ থেকে নামিয়ে দোমড়ানো রুমাল দিয়ে নাক আর কপাল মুছল কমান্ডার। 'দুঃখিত, রানা। একসাথে সব কিছু বিগড়ে যাবার এই রকম ঘটনার কথা জীবনেও শুনিনি! তুমিই বলো, এরপরও কি মেজাজ ঠিক থাকে? কঠিন সব প্ল্যান ধরে প্রজেক্টের কাজ শুরু করা হয়েছে, ঠিক যখন একটা রেজাল্ট পাবার সময় হয়ে এসেছে, তখনই একের পর এক উৎকট সব বিপদ। জানো, ক্রুরা পর্যন্ত গত তিন দিন ধরে এড়িয়ে যাচ্ছে আমাকে?'

পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা কমান্ডারের কাঁধে একটা হাত রাখল রানা। 'যতই কিনা মেজাজ খারাপ করো, কথা দিচ্ছি আমি তোমাকে ফেলে পালাব না।'

রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার হ্যানিবল, ধীরে ধীরে তার চেহারায়

স্বস্তির ছাপ ফুটে উঠল। রানার একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরল সে। 'থ্যাংক গড, আর কাউকে না পাঠিয়ে তোমাকে পাঠিয়েছেন অ্যাডমিরাল। তুমিও যে রহস্যের মীমাংসা করতে পারবে তা হয়তো নয়, কিন্তু স্রেফ তোমার উপস্থিতিই আমার জন্যে বিরাট একটা স্বস্তির ব্যাপার।' ঘুরে বো-র দিকটা দেখাল সে। 'এসো, আমার কেবিন ওদিকে।'

খাড়া একটা মই বেয়ে কমান্ডারকে অনুসরণ করল রানা, পরবর্তী ডেকে চড়ে ছোট একটা কেবিনে ঢুকল। ভেন্টিলেটর দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আরাম বলতে এইটুকুই। খুদে আকৃতি দেখে রানা ধারণা করল, নিশ্চয়ই স্টীলের আলমারি তৈরিতে সিদ্ধহস্ত কোন কারিগর বানিয়েছে এটা। ভেন্টিলেটরের সামনে দাঁড়িয়ে গায়ের ঘাম শুকিয়ে নিল ও। তারপর একটা চেয়ারে বসে পা দুটো দুই হাতলের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। কমান্ডার হ্যানিবল শুরু করবে, সেই অপেক্ষায় রয়েছে।

পোর্টহোল বন্ধ করে দিল হ্যানিবল, কিন্তু বসল না। 'শুরু করার আগে জানতে চাই, আমাদের এই ঈজিয়ান এক্সপিডিশন সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'শুধু এইটুকু যে জুলজিক্যাল কোন কারণে মেডিটেরেনিয়ানকে নিয়ে রিসার্চ করছে ব্লু লিডার।'

অবাক দেখাল কমান্ডারকে। 'পাঠাবার আগে অ্যাডমিরাল তোমাকে এই প্রোজেক্ট সম্পর্কে কোন ধারণা দেননি?'

'না,' মুচকি হাসল রানা। 'শুধু এইটুকু শুনে সন্তুষ্ট হও, তোমার দেশ আমার জন্যে নরক হয়ে উঠেছিল, তাড়াতাড়ি কেটে পড়তে হয়েছে। কিছু বলার সময় পাননি অ্যাডমিরাল।'

'বুঝেছি,' বলে প্রসঙ্গটা চাপা দিতে চাইল কমান্ডার, আসলে কিছুই বোঝেনি সে। ডেস্কের একটা দেরাজ খুলে বড় একটা ম্যানিলা এনভেলাপ বের করে ধরিয়ে দিল রানার হাতে। ভেতর থেকে কয়েকটা স্কেচ বের করল রানা। সবগুলোই অদ্ভুতদর্শন একটা মাছের নকশা। মুখ তুলে তাকাল ও।

'এই রকম কোন মাছ নিশ্চয়ই আগে কখনও দেখোনি তুমি, রানা?' জানতে চাইল কমান্ডার হ্যানিবল।

আবার ড্রইংগুলোর দিকে চোখ নামাল রানা। একটা মাছেরই অনেকগুলো নকশা, কিন্তু আঁকানো হয়েছে কয়েকজন শিল্পীকে দিয়ে। স্কেচের প্রতিটি মাছ প্রায় একই রকম দেখতে হলেও, খুঁটিনাটি অনেক কিছু একটার সাথে আরেকটার মেলে না। প্রথমটা প্রাচীন গ্রীক ইলাস্ট্রেশন, আঁকা হয়েছে একটা ভেসের গায়ে। আরেকটা, সন্দেহ নেই রোমান ফ্রেসকোর অংশ। এরপরের দুটো আরও আধুনিক যুগের। শিল্পী তার ছবিতে শৈল্পিক নৈপুণ্য ফোটাবার চেষ্টা করেছে। এগুলোতে মাছ স্থির হয়ে নেই, তাদের ছুটোছুটির ভঙ্গি ধরে রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। সবশেষেরটা একটা ফটোগ্রাফ। পাথরে সেঁটে থাকা একটা ফসিলের ছবি। মুখ তুলে আবার হ্যানিবলের দিকে তাকাল রানা।

ওর হাতে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলে দিল কমান্ডার। 'এবার এটা দিয়ে দেখো।'

গ্লাসের হাইট অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে প্রতিটি ছবি খুঁটিয়ে দেখল রানা। প্রথমবার দেখার সময় মনে হয়েছিল মাছ সবগুলোই এক সাইজের, এবং অনেকটা ব্লু ফিন টিউনার মত আকৃতি। কিন্তু এখন দেখা গেল, বটম পেলভিক ফিনের চেহারা অনেকটা খুদে হাঁসের পায়ের মত, যাকে বলে ওয়েব্‌ড্-ফিট। ডরসাল ফিনের ঠিক সামনে ওই রকম আরও দুটো দেখা গেল।

ফিসফিস করে বলল রানা, 'ব্যাপারটা কি, হ্যানিবল? প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল, নাকি এর আলাদা কোন নাম আছে?'

'ল্যাটিন নামটা এমন খটমটে, উচ্চারণ করার সাধ্য আমার নেই,' বলল কমান্ডার। 'তবে ব্লু লিডারের বিজ্ঞানীরা আদর করে নাম রেখেছে টীজার।'

'এই নামকরণের কারণ?'

'কারণ প্রকৃতির সমস্ত আইন অনুসারে দুশো মিলিয়ন বছর আগেই দুনিয়ার বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার কথা ছিল এই মাছের। কিন্তু ছবি যখন আঁকা সম্ভব হয়েছে, বুঝতেই পারছ এই মাছ দেখেছে বলে আজও দাবি করছে লোকেরা। প্রতি পঞ্চাশ কি ষাট বছর পর হঠাৎ করে অনেকগুলো চাক্ষুষ করার সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু বিজ্ঞানীদের দুর্ভাগ্যই বলতে হবে, আজ পর্যন্ত একটা টীজারও ধরা সম্ভব হয়নি। একজন জেলে বা বিজ্ঞানী তোমার চোখের দিকে সোজা তাকিয়ে কিরেকসম খেয়ে বলবে, তার নেট বা হুকে একটা টীজার ধরা পড়েছিল, কিন্তু ডাঙায় তোলার আগেই কিভাবে যেন ছুটে যায়—এই রকম কয়েকশো ঘটনার কথা জানা আছে আমাদের। দুনিয়ার কোথাও এমন কোন জুলজিস্ট নেই যে মরা বা জ্যান্ত একটা টীজারের জন্যে তার ডান হাতটা ত্যাগ করতে দ্বিধা করবে।'

'সামান্য একটা মাছ বৈ তো নয়, তার এত গুরুত্ব কেন?'

ড্রইংগুলো তুলে ধরল কমান্ডার। 'নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, বাইরে চামড়া সম্পর্কে আর্টিস্টদের এক একজনের এক এক রকম ধারণা। কেউ আঁশ এঁকেছে, কেউ শুকের মত মসৃণ গা এঁকেছে, আবার কেউ কেউ কোমল লোম পর্যন্ত এঁকেছে। এখন তুমি যদি লোমশ চামড়ার সম্ভাবনা স্বীকার করো, লিম্ব এক্সটেনশন সহ, তাহলে আমরা হয়তো প্রথম ম্যামালের সূচনা আবছাভাবে পেয়ে যেতে পারি।'

'ঠিক, কিন্তু চামড়াটা যদি মসৃণ হয় তাহলে তোমার হাতে ওটা আসলে আদি সরীসৃপ ছাড়া কিছুই নয়। এককালে তো দুনিয়া জুড়েই ওদের বসবাস ছিল।'

কিন্তু কমান্ডারের চেহারায় আত্মবিশ্বাসের কোন অভাব দেখা গেল না। 'এরপরের বিবেচ্য বিষয় হিসেবে আসছে—গরম অগভীর পানিতে বাস করত টীজার। রেকর্ড চেক করে জানা যায়, তাকে দেখতে পাবার প্রতিটি ঘটনা তীর থেকে তিন মাইলের মধ্যে ঘটেছে। সবগুলো ঘটনাই ঘটেছে এখানে, ইস্টার্ন মেডিটেরেনিয়ানে, যেখানে গড়পড়তা সারফেস টেমপারেচার বাষট্টি ডিগ্রী ফারেনহাইটের নিচে খুব কমই নামে।'

'কি প্রমাণ হয় এ থেকে?'

'নিরেট কিছু নয়। কিন্তু আদি ম্যামাল লাইফ গরম আবহাওয়ায় সহজে টিকে থাকতে পারে, তাই এই সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় যে বর্তমান সময়

পর্যন্ত টিকে গেছে টীজার।'

কোন মন্তব্য করল না রানা।

'তোমাকে দলে ভেড়ানো সহজ নয় জানি বলেই ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা সবশেষে ছাড়ব বলে ঠিক করে রেখেছি,' মুচকি একটু হেসে বলল হ্যানিবল। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে গ্লাস দুটো পশমী কাপড়ের টুকরো দিয়ে মুছল সে। তারপর খাড়া নাকে পরল সেটা। চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু করে তুলে এমন সুরে কথা বলতে শুরু করল যেন স্বপ্নের ঘোরে রয়েছে। 'জিওলজিক্যাল সময়ের হিসেবে ট্রাইয়াসিক পিরিয়ডে, অর্থাৎ হিমালয় এবং আল্পস পর্বতমালা মাথা চাড়া দেবার আগে, এখন যেখানে তিব্বত আর বাংলাদেশ সহ ভারত রয়েছে সেখানে বিশাল একটা সাগর ছিল। সেন্ট্রাল ইউরোপের ওপর দিয়ে নর্থ সী পর্যন্ত ছিল এর বিস্তার। জিওলজিস্টরা এককালের এই বিশাল জলরাশির নাম দিয়েছে, দি সী অভ টেথিস। ব্ল্যাক, কাস্পিয়ান এবং মেডিটেরেনিয়ান সী সেই টেথিস সাগরেরই টিকে যাওয়া অংশ।'

'জিওলজিক্যাল টাইম সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই নেই,' বলল রানা। 'অজ্ঞতার জন্যে মাফ চাইছি। কিন্তু টেথিস পিরিয়ড কবে শুরু হলো জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।'

'একশো আশি থেকে দুশো ত্রিশ মিলিয়ন বছর আগে,' বলল হ্যানিবল। 'এই সময়ে ভার্টিব্রা প্রাণীদের ক্রম-বিকাশের ধারায় একটা বৈপ্লবিক উন্নতি ঘটে। পানিতে বাস করত এমন কিছু সরীসৃপ তেইশ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়ে ওঠে, সেই পরিমাণে পায়ের জোরও বেড়ে যায়। এরপর দুনিয়ার বুকে এল প্রথম ডাইনোসর, যে কিনা এমন কি পিছনের পায়ে ভর দিয়ে হাঁটতেও শিখল। শুধু তাই নয়, ব্যালেন্স রক্ষার জন্যে লেজটাকে তারা ছড়ি হিসেবে ব্যবহার করত।'

চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে পা দুটো সামনের দিকে মেলে দিল রানা। 'আমার ধারণা ছিল ডাইনোসরের যুগ শুরু হয় আরও অনেক পরে।'

'সিনেমাতে প্রায়ই দেখা যায় প্রায়-ন্যাংটো যুবতী নায়িকাকে তাড়া করছে ডাইনোসর। কাজেই ভুল বোঝার অবকাশ থেকেই যায়। কিন্তু আসল ঘটনা হলো, মানুষের আবির্ভাব ঘটার ষাট মিলিয়ন বছর আগেই দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে ডাইনোসর।'

'এসবের সাথে তোমার এই টীজার মাছের সম্পর্ক কি?'

'প্রথম যুগের একটা টীজারের কথা কল্পনা করো। তিন ফুটি প্রাণীটি ঘর বাঁধল, প্রেম করল, তারপর একদিন সী অভ টেথিসের কোথাও মারা গেল। কেউ লক্ষ করল না, নগণ্য মাছের মৃতদেহ ধীরে ধীরে সাগর তলার লাল কাদায় ডুবে গেল। পরে তার কবরটা চেনা যাবে, এমন কোন উপায়ই থাকল না। কবরের ওপর একটু একটু করে পলি জমতে শুরু করল। এক সময় এই পলি শক্ত স্যান্ডস্টোনে পরিণত হলো, রেখে গেল ক্ষীণ একটু কার্বন। এই কার্বনই পাথরের ওপর টীজারের টিস্যু আর বোন স্ট্রাকচার খোদাই করল। বছরের পর যুগ, যুগের পর শতাব্দী, শতাব্দীর পর সহস্র শতাব্দী এইভাবে পেরিয়ে যেতে লাগল সময়। দুশো মিলিয়ন বছর পর, বসন্ত কালের এক গরম দিনে, অস্ট্রিয়ান শহর নিয়ানকিরচেনের একজন কৃষক তার লাঙল দিয়ে শক্ত সারফেসের ওপর একটা আঁচড় দিল। সেই সাথে আমাদের যুগে ফিরে

এল টীজার মাছ। বহাল তবিয়তে বা জ্যান্ত অবস্থায় নয়, প্রায় নিখুঁত ফসিল হিসেবে।' খানিক ইতস্তত করে ঘন চুলে আঙুল চালাল কমান্ডার। ক্লান্ত দেখাল তাকে। কিন্তু চোখ দুটো উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে। 'গুরুত্বপূর্ণ একটা পয়েন্ট হলো, টীজার যখন মারা গেল তখন সেখানে কোন পাখি বা মৌমাছি ছিল না। চুল আছে এমন কোন ম্যামাল ছিল না। ছিল না কোন ধরনের প্রজাপতি। এমনকি ফুলও তখন দুনিয়ার মুখ দেখেনি।'

ফসিলের ফটোটা আবার দেখল রানা। 'ব্যাপক এভোলিউশনারি পরিবর্তন ছাড়া কোন জীবিত প্রাণী এই লম্বা সময় টিকে আছে, বিশ্বাস করা কঠিন।'

'বিশ্বাস করা কঠিন? তা বটে। কিন্তু এই ঘটনা আগেও ঘটেছে। হাঙরের কথাই ধরো, ওরা তিনশো পঞ্চাশ মিলিয়ন বছর ধরে রয়েছে আমাদের সাথে। প্রায় দুশো মিলিয়ন বছরের ওপর হলো হর্সশূ ক্র্যাবের কোন পরিবর্তন হয়নি বললেই চলে। তারপর, আমাদের হাতে রয়েছে ক্লাসিক উদাহরণ—কোয়েলাকানথ।'

'হ্যাঁ, এর সম্পর্কে শুনেছি বটে,' বলল রানা। 'ধারণা করা হত, সত্তর মিলিয়ন বছর আগেই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে এই মাছ, কিন্তু হঠাৎ করে পুব আফ্রিকার উপকূলে আবার দেখতে পাওয়া গেল ওগুলোকে।'

মাথা ঝাঁকাল হ্যানিবল। 'সে-সময় সাংঘাতিক আলোড়ন তুলেছিল ঘটনাটা। গুরুত্বের দিক থেকেও কোয়েলাকানথের আবিষ্কার কম নয়। কিন্তু টীজার পাওয়া গেলে বিজ্ঞান যা লাভ করবে তার সাথে আর কিছুর তুলনা চলে না।' একটু থেমে সিগারেট ধরাল হ্যানিবল। 'গোটা ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই রকম—ম্যামালের ক্রম বিকাশের ধারায় টীজার সূচনা পর্বের একটা সংযোগ হতে পারে, তার মানে আজকের মানুষের সাথে এর আত্মীয়তার সম্পর্ক থাকতে পারে। এতক্ষণ যা বলিনি তোমাকে তা হলো, অস্ট্রিয়ায় যে ফসিলটা পাওয়া গেছে সেটার অ্যানাটমিক্যাল রিসার্চের ফলে প্রমাণিত হয়েছে, ম্যামালের সমস্ত বৈশিষ্ট্য রয়েছে ওটার মধ্যে।'

'বলছ দুশো মিলিয়ন বছর ধরে ওটার কোন পরিবর্তন হয়নি, আজও সেটা তার অরিজিন্যাল ফর্মে পানিতে সাঁতরে বেড়াচ্ছে—তাহলে, হাউ কুড ইট ঈভল্‌ভ্ ইনটু অ্যান অ্যাডভান্সড স্টেজ?'

'যে-কোন প্রাণী বা প্ল্যান্টের প্রজাতিগুলো আসলে পরস্পরের আত্মীয়ের মত। একটা শাখা হয়তো আকার আকৃতিতে একই রকম সন্তানের জন্ম দেয়, কিন্তু পাহাড়ের ওপারে তার আত্মীয়রা জন্ম দেয় জোড়া মাথা আর চার হাতওয়ালা দৈত্য।'

অস্থির বোধ করল রানা, দরজা খুলে বেরিয়ে এল ডেকে। গরম বাতাসের ঝাপটা লাগল মুখে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে নিল মাথা। দু'হাতে পয়সা খরচ করে, এতগুলো লোক গাধার খাটনি খাটছে—কেন? লক্ষ কোটি বছরের পুরানো একটা মাছের জন্যে! ভাবতেও আশ্চর্য লাগল ওর। মানুষের পূর্ব-পুরুষ মাছ ছিল না বানর, কি এসে যায় তাতে? যে গতিতে আত্মধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা, এক হাজার বছর কিংবা হয়তো তারও কম সময়ের মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মানুষ। ঘুরে দরজার দিকে মুখ করল ও। কেবিনের ভেতরটা আবছা অন্ধকার। চেয়ারে বসে ওর দিকেই তাকিয়ে আছে হ্যানিবল।

'ঠিক আছে,' বলল রানা। 'কি খুঁজছ তোমরা সেটা আমার জানা হলো। এখন বলো, এসবের ভেতর আমি কিভাবে ঢুকছি? ক্যাবল যদি ছিঁড়ে গিয়ে থাকে, টুলস যদি হারিয়ে গিয়ে থাকে, কিংবা জেনারেটর যদি বিকল হয়ে গিয়ে থাকে, আমার মত কাউকে কেন দরকার পড়ে তোমাদের? একজন মেকানিককে কেন ডেকে পাঠাও না?'

মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব দেখাল হ্যানিবলকে। তারপর উজ্জ্বল হয়ে উঠল তার মুখের চেহারা। 'বুঝেছি! ড. খালেদের কাছ থেকে জেনেছ!'

'ড. খালেদ?'

'হ্যাঁ, যে তোমাকে হোয়েল বোটে করে তুলে নিয়ে এল এখানে। অত্যন্ত মেধাবী মেরিন জিওফিজিসিস্ট।'

'তাই?' অবাক দেখাল রানাকে। কড়া রোদে দাঁড়িয়ে ঘামতে শুরু করেছে ও। রেলিঙে হাত ঠেকাতেই গরম ছ্যাঁকা লাগল। কেবিনে ফিরে এসে দরজাটা ভিড়িয়ে দিল ও। 'এত সব বুঝি না,' বলল ও। 'বলো, কি করলে তোমার কোলে জ্যান্ত একটা টীজার তুলে দিতে পারব।' কমান্ডারের বাঙ্কে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। বড় করে শ্বাস টেনে ঢিল করে দিল শরীরটা। দেখল, চেহারায় নির্বিকার ভাব নিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে হ্যানিবল। 'শুধু যে মেজাজী হয়ে উঠেছ তাই নয়, তুমি দেখছি আতিথেয়তার সাধারণ রীতিও ভুলে বসে আছ। তেষ্টায় যে আমার বুকের ছাতি ফেটে যেতে চাইছে, তাও বলে দিতে হবে?'

'দুঃখিত,' বলে ব্যস্ত হয়ে উঠল কমান্ডার। ইন্টারকমের বোতাম টিপে জাহাজের গ্যালি থেকে কিছু বরফ আর বিয়ার নিয়ে আসতে বলল সে। তারপর রানার দিকে তাকাল। 'যতক্ষণ না ওগুলো এসে পৌঁছায়, ততক্ষণ তুমি আমার লেখা এই রিপোর্টটার ওপর চোখ বুলাও।' হলুদ একটা ফোল্ডার রানার হাতে ধরিয়ে দিল সে। 'বিষয়—যন্ত্রপাতি বিকল। প্রতিটি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ পাবে তুমি এতে। প্রথম দিকে আমি ভেবেছিলাম, এসব নেহাতই দুর্ঘটনা এবং মন্দ কপাল, কিন্তু পরে ওগুলোর সংখ্যা আর প্রকৃতি দেখে আমার ধারণা বদলেছে।'

'স্যাবোটাজ?'

'বুঝতে পারছি না। অন্তত হাতে কোন প্রমাণ নেই।'

'ড. খালেদ ছেঁড়া ক্যাবলের কথা বলল আমাকে, ওটা কি কাটা হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যানিবল। 'প্রান্ত দুটো দেখে মনে হয় ঘষা খেয়ে ক্ষয়ে গেছে। ক্যাবল ছিঁড়ে যাওয়ার এই ঘটনার কোন ব্যাখ্যা পাইনি আমি। বিরাট একটা রহস্য বলতে পারো।' আঙুলের টোকা দিয়ে সিগারেটের ছাই ঝাড়ল সে। 'বলছি, শোনো। কাজে আমাদের সেফটি মার্জিনের হার হলো ফাইভ-টু-ওয়ান। মানে, ধরো, পরখ করে যদি দেখা যায় পঁচিশ হাজার পাউন্ড বা তার বেশি ওজন চাপালে ক্যাবলটা ছিঁড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে তাহলে আমরা ওই ওজনের পাঁচ ভাগের মাত্র এক ভাগ ওজনের কাজ করতে দিই ক্যাবলটাকে। এই সতর্কতার জন্যেই বড় ধরনের কোন দুর্ঘটনায় আজ পর্যন্ত পড়েনি নুমা। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়ে মানুষের প্রাণের মূল্য অনেক বেশি...'

'ক্যাবল যখন ছিঁড়ল, সেফটি মার্জিন কি ছিল?'

'সে কথাতেই আসছিলাম। সেফটি মার্জিন ছিল প্রায় সিক্স-টু-ওয়ান। ওই সময় মাত্র চার হাজার পাউন্ড চাপ ছিল ওটায়। নেহাতই ভাগ্য বলতে হবে যে বিদ্যুৎ গতিতে লাফিয়ে ওঠা ক্যাবলের ঘা খেয়ে আহত হয়নি বা মারা পড়েনি কেউ।'

'ক্যাবলটা দেখতে পারি?'

'মেইন সেকশন থেকে প্রান্ত দুটো কেটে রেখেছি তোমার জন্যে।'

নক করে দরজা খুলল লালচুলো এক ছেলে, সতেরো কি আঠারো বছর বয়স। হাতে ট্রে, তাতে বিয়ারের ক্যান, গ্লাস আর বরফ। ট্রেটা নামিয়ে রেখে চলে যাচ্ছিল সে, কমান্ডার তাকে ডাকল। বলল, 'মেইন্টেন্যান্স ডেকে চলে যাও, ওখানে ভাঙা ক্যাবল সেকশনটা আছে, তাড়াতাড়ি নিয়ে এসো এখানে।'

'ইয়েস, স্যার!' বেরিয়ে গিয়ে দরজাটা আবার ভিড়িয়ে দিল ছেলেটা।

'জাহাজে মোট ক'জন ক্রু আছে?'

'ওকে নিয়ে আটজন,' গ্লাসে বরফের টুকরো ছাড়তে ছাড়তে বলল কমান্ডার। 'বিজ্ঞানী আছে চোদ্দ জন।'

হ্যানিবলের হাত থেকে বিয়ার ভর্তি গ্লাসটা নিল রানা। 'তোমার সমস্যার জন্যে এই বাইশ জনের কেউ দায়ী হতে পারে?'

এদিক ওদিক মাথা নাড়ল হ্যানিবল। 'আমিও ওই লাইনে চিন্তা করে দেখেছি। প্রতিটি লোকের পার্সোন্যাল রেকর্ড অন্তত পঞ্চাশ বার করে চেক করেছি। প্রজেক্টের কাজ পিছিয়ে গেলে ওদের কারও লাভ হবে এমন কোন প্রমাণ আমি পাইনি।' গ্লাসে চুমুক দেবার জন্যে থামল সে। 'বাধাগুলো অন্য কোন উৎস থেকে আসছে, রানা। কেউ বোধহয় চাইছে আমরা যেন টীজার মাছ ধরতে না পারি, যে মাছের হয়তো কোন অস্তিত্বই নেই।'

ভাঙা ক্যাবলের প্রান্ত দুটো নিয়ে কেবিনে ঢুকল ছেলেটা। ডেস্কের ওপর নামিয়ে রেখে তাকাল কমান্ডারের দিকে। হাত ইশারায় তাকে বিদায় করে দিল হ্যানিবল। বাঙ্ক থেকে নামল রানা, ডেস্ক থেকে তুলে নিল ক্যাবল দুটো। গ্রিজ মাখা অন্যান্য আর সব স্টীল ক্যাবল যেমন হয় এটাও সেই রকম। প্রতিটি টুকরো দু'ফুটের মত লম্বা, মোট চব্বিশশো খেই আছে, তার ওপর রয়েছে প্রচলিত মানের ইস্পাতের বিনুনি, এক ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ পুরু। আঁটসাঁট, শক্ত। কোথাও ভাঙেনি ক্যাবলটা, ছেঁড়াটা ছড়িয়ে পড়েছে ইঞ্চি পনেরো জায়গা জুড়ে, সেজন্যেই প্রান্ত দুটো ঘোড়ার একজোড়া লেজের মত দেখতে হয়েছে।

কি যেন একটা ধরা পড়ল রানার চোখে, ম্যাগনিফাইং গ্লাস তুলল চোখে। ধীরে ধীরে সন্তুষ্টির একটা ক্ষীণ হাসি ছড়িয়ে পড়ল ঠোঁটে। সেই পুরানো উত্তেজনা অনুভব করল ও—কেউ চ্যালেঞ্জ করলে উপযুক্ত জবাব দেবার তাগিদ। অশুভ শক্তির অস্তিত্ব এবং তার তৎপরতা ধরা পড়ে গেছে ওর কাছে। আশা করল, সময়টা বোধহয় বাজে খরচ হবে না, বেশ রোমাঞ্চের মধ্যেই কাটবে।

'কিছু দেখলে?'

'অনেক কিছু,' বলল রানা। 'তোমরা বোধহয় কারও এলাকায় অনুপ্রবেশ করে ফেলেছ। তোমরা এখানে মাছ ধরো তা সে চায় না।'

চোখের চারপাশ কুঁচকে উঠল হ্যানিবলের। 'কি পেয়েছ তুমি?'

'ক্যাবলটা ইচ্ছে করে ছেঁড়া হয়েছে,' মৃদু গলায় বলল রানা।

'ছেঁড়া হয়েছে মানে?' চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল কমান্ডার। 'কি দেখে বুঝলে তুমি ওটায় মানুষের হাত লেগেছে?'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা হ্যানিবলের হাতে ধরিয়ে দিল রানা। 'ভাল করে তাকালেই দেখতে পাবে, ভাঙা কিনারাটা নিচের দিকে ঘুরে আঁশের ভেতর ঢুকে গেছে। তাছাড়া, খেইগুলোর চেহারা দেখেছ? থেঁতলে রয়েছে। এই ডায়ামিটারের একটা ক্যাবলকে যদি দু'দিক থেকে টেনে ছেঁড়া হয় তাহলে খেইগুলোর প্রবণতা হবে খাড়া হয়ে থাকার, আঁশের দিকে বেঁকে যাবে না। এখানে ঠিক উল্টোটা ঘটেছে।'

থেঁতলানো ক্যাবলের দিকে তাকিয়ে থাকল হ্যানিবল। 'মাথায় ঢুকছে না। কেউ যদি ছিঁড়ে থাকে, কিভাবে ছিঁড়ল?'

'সম্ভবত প্রাইমাকর্ড।'

হতভম্ব দেখাল হ্যানিবলকে। 'সেকি! প্রাইমাকর্ড তো বিস্ফোরক, তাই না?'

'হ্যাঁ,' শান্ত সুরে বলল রানা। 'সুতো বা রশির মত দেখতে হয়, তৈরি করার সময় যত খুশি সরু করা যায়। সাধারণত বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গাছ ফেলার এবং যথেষ্ট দূরে দূরে বসানো বিস্ফোরক এক সাথে ফাটাবার জন্যে ব্যবহার করা হয় প্রাইমাকর্ড। জ্বলন্ত ফিউজের মত কাজ করে এটা, পার্থক্য শুধু এইটুকু যে এর গতি অত্যন্ত বেশি।'

'কিন্তু···কিন্তু কারও চোখে ধরা না পড়ে এক্সপ্লোসিভ সাজিয়ে রেখে গেল জাহাজে, এ কিভাবে সম্ভব?' ঘন ঘন মাথা নাড়ল হ্যানিবল। 'এদিকের পানি কাঁচের মত স্বচ্ছ! দৃষ্টিসীমা একশো ফুটেরও বেশি। কেউ যদি জাহাজের দিকে এগোয়, জাহাজী বা বিজ্ঞানী কারও না কারও চোখে ধরা পড়তে বাধ্য। তাছাড়া, বিস্ফোরণের আওয়াজ? আমরা কিছু শুনতে পাইনি কেন?'

'জবাব দেবার আগে দুটো প্রশ্ন করব আমি,' বলল রানা। 'ক্যাবল যখন ছিঁড়ল, ওটার সাথে কি ঝুলছিল? এবং ক্যাবল ছেঁড়ার ঘটনাটা কখন তোমরা জানতে পারো?'

'আন্ডারওয়াটার ডিকমপ্রেশন চেম্বারের সাথে জোড়া লাগানো ছিল ক্যাবল। একশো আশি ফুট পানির নিচে কাজ করছিল ডাইভাররা। তাই বেন্ড ঠেকাবার জন্যে পানির নিচেই ডিকমপ্রেশনের ব্যবস্থা করা হয়। ভাঙা ক্যাবলটা আমাদের চোখে পড়ে সাতটায়, সকালে ব্রেকফাস্ট করার পরপরই।'

'আগের রাতে চেম্বারটা নিশ্চয় পানির নিচে ছিল?'

'না,' জানাল হ্যানিবল। 'ভোর হবার আগেই পানিতে চেম্বার নামিয়ে থাকি আমরা, যাতে ভোরের দিকে ইমার্জেন্সী দেখা দিলে ডাইভাররা ওটাকে একেবারে হাতের কাছে তৈরি পায়।'

'এই তো উত্তর পেয়ে গেলে!' উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'ভোরের আবছা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে সাঁতরে এসেছিল কেউ, জাহাজে চড়তে হয়নি তাকে, পানির নিচেই পেয়ে গিয়েছিল ক্যাবলটা। প্রাইমার্কড লাগিয়ে তাড়াতাড়ি আবার ফিরে গেছে সে। দৃষ্টিসীমা একশো ফুট হতে পারে, কিন্তু সেটা আকাশে

সূর্য ওঠার পর। রাতের বেলা ওটা এক ফুটের বেশি নয়।'

'কিন্তু বিস্ফোরণের আওয়াজটা?'

'প্রাইমাকর্ড বিস্ফোরণের আওয়াজ তেমন জোরাল নয়,' বলল রানা। 'আর আশি ফুট পানির নিচে ওটা বিস্ফোরিত হলে জাহাজ থেকে মৃদু ধুপ একটা আওয়াজ ছাড়া আর কিছু শুনতে পাবার কথাও নয়।'

রানার সাথে তর্ক করার একটা ঝোঁক চাপলেও, খাড়া করার মত কোন যুক্তি খুঁজে পেল না কমান্ডার হ্যানিবল। খানিক ইতস্তত করার পর জানতে চাইল, 'এখন তাহলে কি হবে?'

বিয়ারের গ্লাসটা তুলে নিয়ে শেষ চুমুক দিল রানা। 'তুমি তোমার কাজ চালিয়ে যাও, দেখো, অন্তত টীজার মাছের আধখানা লেজও পাও কিনা। আর আমি দ্বীপে ফিরে গিয়ে মাটি শুঁকতে শুরু করি, দেখি কোথাও কোন গন্ধ পাই কিনা। তোমার এখানের স্যাবোটাজ আর ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর এয়ার অ্যাটাকের একটা সম্পর্ক থাকলেও থাকতে পারে। দেখা যাক কোথাকার পানি কোথায় গড়ায়।'

আচমকা দড়াম করে খুলে গেল দরজার কপাট। লাফ দিয়ে ভেতরে ঢুকল একজন লোক। মুখ খুলে হাঁপাচ্ছে সে। চোখ দুটো বিস্ফারিত। পরনে সুইম ট্রাঙ্ক আর চওড়া বেল্ট, বেল্টের সাথে আটকানো রয়েছে একটা ছুরি আর নাইলন নেট ব্যাগ। মাথার চুল লালচে, নাকে আর বুকে সাদাটে হলুদ রঙের অসংখ্য তিল। কেবিনের ভেতর ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। পানির ছোট একটা পুকুর তৈরি হয়ে গেল কার্পেটের ওপর। 'কমান্ডার হ্যানিবল!' বলেই ঘন ঘন দম নিল। 'আমি একটা দেখেছি! খোদার কসম আমি একটা টীজার দেখেছি! ফেস মাস্ক থেকে মাত্র দশ ফুট দূরে···!'

স্যাঁৎ করে ছুটে গেল কমান্ডার, লোকটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। পাশ থেকে দেখতে পেল রানা, উত্তেজনায় ঠোঁট জোড়া কাঁপছে হ্যানিবলের।

'ঠিক জানো, ভুল দেখোনি? ভাল করে দেখেছ?'

'শুধু চোখের দেখা নয়, স্যার—আমার হয়ে কথা বলবে ক্যামেরা! আমি ওটার ছবিও তুলে নিয়েছি।' কমান্ডারের চেহারায় আত্মহারা ভাব ফুটে উঠতে দেখে নিঃশব্দ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল ডাইভারের মুখ। 'শুধু যদি আমার কাছে একটা স্পীয়ারগান থাকত, স্যার! আজ আর ওটাকে ফেরত যেতে হত না! কিন্তু ভাগ্য খারাপ, স্পীয়ার গানের বদলে ক্যামেরা নিয়ে কোরাল ফরমেশনে ছবি তুলছিলাম আমি।'

'জলদি!' হ্যানিবলের গলার ভেতর থেকে বিস্ফোরণের মত আওয়াজ বেরিয়ে এল। 'ল্যাবে পাঠিয়ে ফিল্মটা ডেভেলপ করাও।'

দ্রুত ঘুরে দাঁড়াল লোকটা, রানার গায়ে কয়েক ফোঁটা লোনা পানি ছিটকে পড়ল। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিল ডাইভার।

রানার চোখে চোখ রাখল কমান্ডার। 'মাই গড! হাল ছেড়ে দিয়ে যখন বাড়ি ফিরে যাবার কথা ভাবছি ঠিক তখনই এই কাণ্ড! আর কি নড়ি আমি এখান থেকে! হয় একটা টীজার ধরব, না হয় বুড়ো হয়ে এখানেই মারা যাব।'

'এমন ভাগ্য ক'জনের হয়?'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে তাকাল হ্যানিবল। 'কার ভাগ্য? কিসের ভাগ্য?'

'মাছটার,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'তাকে পাবার জন্যে কি না করতে পারো তোমরা!'

'এ ব্যাপারে তোমার বোধহয় কোন উৎসাহ নেই?' ঠাণ্ডা গলায় জানতে চাইল হ্যানিবল।

'যদি জানতাম টীজার খেতে কেমন তাহলে হয়তো উত্তর দেয়াটা আমার জন্যে সহজ হত।' বলে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল রানা, চোখ বুজে ঢিল করে দিল শরীরটা। মনে মনে কল্পনা করল, এবার দেশে ফিরে আলীগঞ্জ-কাওটাইলের বিলে মাছ ধরবে, পাশে থাকবে সোহানা···

ছয়

পাঁচটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকি থাকতে ব্র্যাডি ফিল্ডে ওর কোয়ার্টারে ফিরে এল রানা। ঘামে ভেজা কাপড়চোপড় খুলতে যা দেরি, সাথে সাথে শাওয়ারের নিচে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল ও। সময় থাকলে শাওয়ারের নিচে শুয়ে থাকার সুযোগটা কখনও হাত ছাড়া করে না ও। এই অবস্থায় মাঝে মধ্যে হয়তো তন্দ্রার কোলে আত্মসমর্পণ করে ও, তবে বেশির ভাগ সময় বর্ষণমুখর পরিবেশটাকে কাজে লাগায় অটো-সাজেশন দিয়ে। কখনও বা কোন কঠিন সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামায়। একান্তে চিন্তা করার জন্যে এর চেয়ে ভাল পরিবেশ আর হয় না।

এই মুহূর্তে কয়েকটা প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে রানা। টায়ারের দাগ আছে, অথচ গাড়ি নেই, তাহলে গাড়ির আওয়াজ পায়নি কেন? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার বেসে হামলা চালানো হলো কেন? ব্লু লিডারের ক্যাবল কাটল কে? সমাধান পাবার মত যথেষ্ট তথ্য হাতে নেই, কাজেই উত্তর পাওয়া কঠিন। তাই বলে মাথা তো আর চুপ করে বসে থাকতে পারে না, সে তার কাজ করে চলল। উঠি উঠি করছে, এই সময় বাথরুমের কাঁচের দরজার সামনে একটা ভাঙাচোরা মূর্তি দেখা গেল।

'ওহে শাওয়ার-প্রেমিক,' হাঁক ছাড়ল বেন নেলসন। 'তোমার হলো? আধ ঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি।'

'কেন?' কল বন্ধ করে দিয়ে জানতে চাইল রানা।

'কর্নেল কোসকি তোমার সাথে দেখা করতে আসছেন, যে-কোন মুহূর্তে এসে পড়বেন তিনি,' বলল বেন। 'একটু তাড়াতাড়ি করো।'

'ঠিক আছে।'

দরজার সামনে থেকে সরে গেল বেন। বাথটাব থেকে উঠে তোয়ালে দিয়ে গা মুছল রানা। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ইলেকট্রিক শেভার দিয়ে দাড়ি কামাল। কোমরে শুকনো একটা তোয়ালে জড়িয়ে ঢুকল বেডরুমে। বেনকে নিয়ে কর্নেল লী কোসকি অপেক্ষা করছে ওর জন্যে।

খাটের কিনারায় বসে আছে কর্নেল, তাতেই তালগাছের মত লম্বা দেখাল তাকে। সরু লম্বাটে মুখে গাড়ির দরজার হাতলের মত এক জোড়া গোঁফ, তারই

একটা আঙুল দিয়ে অনবরত মুচড়ে চলেছে। চোখ দুটো ঘন নীল। নড়াচড়া এবং কথা বলার ভঙ্গির মধ্যে দ্রুত, ব্যস্ত একটা ভাব দৃষ্টি এড়াবার নয়। হাসি চেপে ভাবল রানা, দেখে মনে হয় একরাশ ভাঙা কাঁচের ওপর বসে আছে কর্নেল।

'আমি বোধহয় অসময়ে বিরক্ত করতে এসেছি, সেজন্যে দুঃখিত,' বলল কর্নেল। 'কিন্তু কাল যে হামলাটা হলো সে-ব্যাপারে কিছু আবিষ্কার করতে পেরেছেন কিনা জানতে চাই আমি।'

মাথা নিচু করে কোমরে জড়ানো বাটারফ্লাই তোয়ালেটা দেখে নিল রানা। 'না, নিরেট কিছু পাব বলে আশাই করিনি আমি। কিছু সন্দেহ, কিছু ধারণা গজিয়েছে মাথায়, কিন্তু সেগুলো এয়ার টাইট কেস তৈরির জন্যে যথেষ্ট নয়।'

'আমার এয়ার ইনভেস্টিগেশন স্কোয়াড্রনকে অচল করে দেয়া হয়েছে,' এমন রাগের সুরে কথাটা বলল কর্নেল, যেন এর জন্যে রানাই দায়ী। 'আশা করছিলাম, আপনি কোন সূত্র দিতে পারবেন।' রানার মনে হলো, কোন সূত্র না দিতে পারলে ওর ওপর খেপে যাবে লোকটা।

শান্ত সুরে জানতে চাইল ও, 'অ্যালব্যাট্রসের টুকরো-টাকরা কিছু পেলেন আপনারা?'

কড়ে আঙুলের ডগা দিয়ে ঘামে ভেজা কপালের মাঝখানটা চুলকাল কর্নেল। 'ওটা যদি সাগরে ডুবে থাকে, কোন চিহ্ন না রেখেই ডুবেছে। সামান্য একটু তেলের চিহ্নও নেই পানিতে। পুরানো ডাব্বা, তার পাইলট···সব যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে! সাংঘাতিক একটা ধাঁধার মত লাগছে ব্যাপারটা। সেজন্যেই তো আপনার ওপর ভরসা করছিলাম!' যেন অসম্ভবকে সম্ভব করাই রানার কাজ। 'মি. বেনের মুখে আপনার সম্পর্কে শুনে ভাবলাম···'

'মস্ত ভুলটা আপনি ওখানেই করে বসেছেন, কর্নেল,' বাধা দিয়ে বলল রানা। 'বেনকে আপনি আমার বন্ধুবেশী শত্রু বলতে পারেন, শুধু প্রশংসা করে গাছে তুলে দিতে জানে। তার আবার নব্বই ভাগই মিথ্যে এবং বানোয়াট।'

তাড়াতাড়ি প্রসঙ্গ বদলাল বেন, 'প্লেনটা হয়তো স্ট্রেইটের ওপর দিয়ে মেইনল্যান্ডে···'

'না,' বলল কর্নেল। 'খোঁজ নিয়েছি আমরা। মেইনল্যান্ড থেকে এলে বা, মেইনল্যান্ডের দিকে চলে গেলে কেউ না কেউ দেখতে পেত। তীর এলাকার অমন কয়েকশো লোককে প্রশ্ন করা হয়েছে, কেউ কিছু দেখেনি।'

চিন্তিত ভাবে মাথা ঝাঁকাল বেন। 'হুঁ। গোলাপী রঙ করা একটা প্লেন, যার টপ-স্পীড ঘণ্টায় মাত্র একশো তিন মাইল, তাকে দেখতে না পাবার কোন কারণই নেই। না, মেইনল্যান্ডের দিকে যায়নি ওটা।'

সিগারেটের প্যাকেট বের করল কর্নেল। 'হামলার প্ল্যানটা ছিল নিখুঁত, সেটাই সবচেয়ে অবাক করেছে আমাকে। এর পিছনে যে-ই থাকুক সে জানত ওই সময়ে কোন প্লেন ল্যান্ড বা টেকঅফ করবে না।'

গায়ে শার্ট চড়িয়ে বোতাম লাগাল রানা। 'রোববারে ব্র্যান্ডি ফিল্ডে তেমন ব্যস্ততা থাকে না, এ তো থাসোসের সবাই জানে। জাপানীদের পার্ল হারবার আক্রমণের সাথে এই হামলার যথেষ্ট মিল আছে।'

সিগারেট ধরাল কর্নেল। 'জানত কোন প্লেন আসছে না, কাজেই আপনাদের ক্যাটালিনাকে দেখে পাইলট নিশ্চয়ই চমকে উঠেছিল। আমাদের রাডার ক্যাটালিনাকে ধরতে পারেনি কারণ শেষ দুশো মাইল প্রায় সাগর ছুঁয়ে আসছিলেন আপনি।' এক মুখ ধোঁয়া ছাড়ল সে। 'সূর্য থেকে ক্যাটালিনাকে বেরিয়ে আসতে দেখে সেই মুহূর্তে কি আনন্দ যে পেয়েছি!'

টাইয়ের নট বাঁধা শেষ করল রানা। 'কেউই আশা করেনি ক্যাটালিনাকে, কারণ আমাদের ফ্লাইট প্ল্যানের মধ্যে ব্যাডি ফিল্ড ছিল না। ব্লু লিডারের পাশে নামব বলে ঠিক করেছিলাম। সেজন্যেই অ্যালব্যাট্রস পাইলট বা ব্যাডি কন্ট্রোল ক্যাটালিনা সম্পর্কে কিছু জানত না।' একটু থেমে গভীর দৃষ্টিতে কর্নেলের দিকে তাকাল ও। 'আপনি, কর্নেল, কড়া ডিফেন্সের ব্যবস্থা করুন। কেন যেন মনে হচ্ছে আমার, অ্যালব্যাট্রসকে আবার আমরা দেখতে পাব।'

প্রায় মারমুখো হয়ে রানার দিকে তাকাল কর্নেল। 'হোয়াট? আপনার এই রকম মনে হবার কারণ?'

শান্তকণ্ঠে বলল রানা, 'ফিল্ডে হামলা চালাবার পিছনে নিশ্চয়ই কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে, তাই না? মানুষ খুন করা বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারক্রাফট ধ্বংস করা সেই উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর পিছনে যে-ই থাকুক, তার লক্ষ্য আপনাদেরকে আতঙ্কিত করে তোলা।'

'তাতে লাভ?' জানতে চাইল বেন।

প্রশ্নটা এড়িয়ে গিয়ে কর্নেলের দিকে তাকাল রানা। 'আচ্ছা, বলুন তো, বর্তমান পরিস্থিতি যদি আরও মারাত্মক এবং বিপজ্জনক হয়ে ওঠে, আপনি কি সমস্ত আমেরিকান সিভিলিয়ানকে মেইনল্যান্ডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবেন না?'

'তা করব,' ঝাঁঝের সাথে স্বীকার করল কর্নেল। 'কিন্তু এই মুহূর্তে এমন কোন বিপদ দেখছি না আমি যাতে ও-ধরনের কোন পদক্ষেপ নিতে হবে। প্লেন আর পাইলটকে খুঁজে বের করার জন্যে গ্রীক সরকার সম্ভাব্য সমস্ত সহযোগিতা দেবেন বলে জানিয়েছেন আমাকে।'

'বুঝলাম,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনি যদি মনে করেন, বিপদ হলেও হতে পারে, তাহলে কি সাবধানের মার নেই ভেবে কমান্ডার হ্যানিবলকে আপনি ব্লু লিডার নিয়ে থাসোস এলাকা থেকে কেটে পড়ার নির্দেশ দেবেন না?'

কর্নেলের চোখ জোড়া ছোট ছোট হয়ে উঠল। 'যদি মনে করি বিপদ হতে পারে, তাহলে অবশ্যই সে নির্দেশ দেব। এরিয়াল স্নাইপারের জন্যে ওই সাদা হাঁসটা চমৎকার একটা টার্গেট!'

'আপনার এই কথার মধ্যেই রয়েছে উত্তরটা।'

পরস্পরের দিকে তাকাল কর্নেল আর বেন, তারপর দু'জন একসাথে ফিরল রানার দিকে।

বলে চলল রানা, 'থাসোসে কেন এসেছি আমরা, তা আপনি জানেন, কর্নেল। আজ সকালে কমান্ডার হ্যানিবলের সাথে কথা হয়েছে আমার। ব্লু লিডারে ওগুলো দুর্ঘটনা নয়, স্যাবোটাজ। আমার ধারণা, ব্যাডি ফিল্ডের হামলার সাথে এই স্যাবোটাজের যোগাযোগ আছে। এমন হতে পারে, ব্লু লিডারকে থাসোস থেকে

সরাবার জন্যেই ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালানো হয়েছিল। শত্রু হয়তো ভেবেছিল, ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা হতে দেখে ব্লু লিডারের কমান্ডার ভয় পাবে, জাহাজ, জাহাজী আর বিজ্ঞানীদের নিরাপত্তার কথা ভেবে থাসোস ছেড়ে চলে যাবে সে।'

'কিন্তু কেন? কার কি ক্ষতি করেছে ব্লু লিডার?' রানার দিকে ঝুঁকে পড়ল কর্নেল।

'এর উত্তর এখনও আমার জানা নেই,' বলল রানা। 'তবে শত্রুর বড় কোন মতলবে বাদ সাধছে ব্লু লিডার, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে এত বড় ঝুঁকি নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এয়ার বেস আক্রমণ করে বসত না সে। আমার সন্দেহ, মূল্যবান কিছু গোপন রাখতে চায় সে, কিন্তু ব্লু লিডার এদিকে থাকলে তার রিসার্চাররা সেটা দেখে ফেলবে বলে ভয় পাচ্ছে।'

'মূল্যবান কিছু?' ভুরু কুঁচকে বলল কর্নেল। 'আপনি গুপ্তধনের কথা বলতে চাইছেন?'

নিজের সুটকেস থেকে একটা ওভারসীজ ক্যাপ বের করে মাথায় পরল রানা। 'হ্যাঁ, গুপ্তধনও হতে পারে।'

চিন্তিত দেখাল কর্নেলকে।

বেনের দিকে তাকাল রানা। 'অ্যাডমিরাল হ্যামিলটনের সাথে যোগাযোগ করে জানতে চাও, থাসোসের কাছে পিঠে কোথাও জাহাজডুবি ঘটেছিল কিনা, ঘটে থাকলে সে-সব জাহাজে মূল্যবান কিছু ছিল কিনা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমস্ত বিবরণ চাই।'

'ওয়াশিংটনে এখন সকাল এগারোটা,' বলল বেন। 'কাজেই ধরে নাও ব্রেকফাস্টের মধ্যেই উত্তর পেয়ে যাব আমরা। আর কিছু?'

'না।'

এতক্ষণে হাসি ফুটল কর্নেলের চেহারায়। 'অন্তত কাজ শুরু করা গেল, কি বলেন, মি. রানা? ব্যাখ্যা দেবার মত একটা কিছু না পেলে ঘাড় থেকে পেন্টাগনকে নামাতে পারব না আমি। সত্যি কথা বলতে কি, আপনিই এখন আমার একমাত্র ভরসা!'

হাতঘড়ি দেখল রানা। 'বয়স্কাউটরা যেমন বলে—বি প্রিপেয়ার্ড! আপাতত এর বেশি কিছু করার নেই আমাদের। ব্র্যাডি ফিল্ড আর ব্লু লিডারের ওপর কড়া নজর রাখছে শত্রুরা। যখন বুঝবে থাসোস থেকে লোক সরানো হচ্ছে না, ওশেনোগ্রাফী শিপ ব্লু লিডারও ঈজিয়ানে থেকে যাচ্ছে, তখন আবার ওরা অ্যালব্যাট্রস পাঠাবে। আমার বিশ্বাস, এবার আপনার ওপর নয়, কমান্ডার হ্যানিবলের ওপর হামলা চালানো হবে।'

'কমান্ডারকে তাহলে জানানো দরকার!' বলল কর্নেল। 'তাকে বলবেন, আমার কাছ থেকে সম্ভাব্য সমস্ত সাহায্য পাবেন তিনি।'

'কমান্ডারকে এখুনি কিছু জানানো উচিত হবে না,' বলল রানা।

হতভম্ব দেখাল বেন নেলসনকে। 'হোয়াই, রানা? ফর গডস সেক, হোয়াই?'

মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'আবার হামলা হবে এটা একটা ধারণা মাত্র। তাছাড়া, ব্লু লিডারকে যদি প্রস্তুতি নিতে দেখা যায়, আমাদের উদ্দেশ্য ভণ্ডুল হয়ে

যাবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ভূতকে ফাঁদে আটকাতে হলে গর্ত থেকে বাইরে বের করে আনতে হবে তাকে।'

'কিন্তু ব্লু লিডারের বিজ্ঞানী আর ক্রুদের কি হবে? বিপদের কথা না জানালে কমান্ডার আত্মরক্ষার জন্যে তৈরি হবেন কিভাবে?'

'বিপদটা এত তাড়াতাড়ি আসছে না, বেন। আরও অন্তত একটা দিন অপেক্ষা করবে অ্যালব্যাট্রসের মালিক, দেখবে ব্লু লিডার কেটে পড়ে কিনা,' বলল রানা। তারপর মুচকি একটু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'ইতিমধ্যে আমি একটা ফাঁদ পাতার চেষ্টা করব।'

ফোঁস করে স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল কর্নেলের নাক দিয়ে। উঠে দাঁড়াল সে। 'আপনি যখন দায়িত্ব নিচ্ছেন, দুশ্চিন্তার আর কোন কারণ নেই আমাদের। বাঁচলাম!'

'আমি ফেরেশতা নই, কর্নেল কোসকি,' বলার সুরে কাঠিন্যটুকু ইচ্ছে করেই ফোটাল রানা। 'ফাঁদ পাতলেই সেটা যে সফল হবে তার কোন মানে নেই। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি এবং সামান্য অভিজ্ঞতা নিয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করব যাতে ভিলেন ধরা পড়ে, কিন্তু কারও বা কিছুর নিরাপত্তার গ্যারান্টি আমি দিতে পারব না।'

কথাগুলো কর্নেলের ওপর কোন প্রভাবই ফেলতে পারল না। বেনের দিকে ফিরে হাসল সে। চোখ মটকে বলল, 'একেই বলে খাঁটি বিনয়, বুঝলেন!'

অসহায় ভাবে একটু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। বুঝল, এই লোকের সাথে তর্ক করতে যাওয়া বৃথা। একে অন্ধ রানা-ভক্ত বানিয়ে ফেলেছে বেন ছলে-বলে-কৌশলে।

'আমি গেলাম,' দরজার কাছে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়াল বেন। 'বেস অপারেশন থেকে মেসেজটা পাঠিয়ে দিই অ্যাডমিরালকে।'

'সাপারের জন্যে আমার কোয়ার্টারে থামতে ভুলবেন না,' বলল কর্নেল। গোঁফে তা দিতে দিতে ফিরল রানার দিকে। 'আপনিও নিমন্ত্রিত।'

'ধন্যবাদ,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনার আগেই আমাকে একজন ডিনারের দাওয়াত দিয়ে রেখেছে। দুঃখিত।'

'ডিনারের দাওয়াত পেয়েছেন? তারমানে?' অবাক হয়ে জানতে চাইল কর্নেল। 'কার কাছ থেকে?'

'সুন্দরী একটা মেয়ে।'

'হোয়াট!' দরজার কাছ থেকে গর্জন ছাড়ল বেন। পাঁই করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে সে। দুই চোখে অবিশ্বাস।

'ছ'টায় মেইন গেটে গাড়ি পাঠাবে, তার মানে মিনিট দুয়েক সময় আছে আমার হাতে,' বলল রানা। 'গুড ইভনিং, কর্নেল।' বেনের দিকে ফিরল ও। 'অ্যাডমিরালের উত্তর পাবার সাথে সাথে জানাবে আমাকে।' বেনকে পাশ কাটিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল ও।

'ব্যাপারটা কি বলুন তো, মি. বেন?' জানতে চাইল কর্নেল কোসকি। 'সত্যি কি কোন মেয়ের সাথে ডেট আছে মেজর রানার?'

'যতদূর জানি, অকারণে মিথ্যে কথা বলে না রানা!'

'কিন্তু কোন মেয়ের দেখা তিনি পাবেন কোথায়? কিল্ডে কোন মেয়ে নেই, আর জাহাজ ছাড়া আর কোথাও তিনি যাননি।'

কাঁধ ঝাঁকাল বেন। 'রানার কথা কি আর বলব আপনাকে। ওর ভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি। শুনেছি মেরুপ্রদেশেও নাকি একটা মেয়ে জুটিয়ে ফেলেছিল। মেইন গেট থেকে একশো গজের মধ্যে ও যদি একটাকে পেয়ে গিয়ে থাকে, তাহলেও আমি আশ্চর্য হব না।'

সাত

পশ্চিম পাহাড়ের মাথা থেকে পিছন দিকে ঢলে পড়ল সূর্য। ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে এল থাসোসের আবহাওয়া। গাছ ঢাকা পাহাড় চূড়ার লম্বা ছায়া পড়ল ঢালের ওপর, নেমে এসে ছুঁয়ে দিল ব্র্যাডি ফিল্ডের সাগরমুখী কিনারা। ঠিক এই সময় মেইন গেট দিয়ে বেরিয়ে এল রানা। বাইরের রাস্তায় উঠে এসে মেডিটেরেনিয়ানের তাজা বাতাসে ভরে নিল বুক। দাঁড়িয়ে পড়ে তাকাল সাগরের দিকে। ঢেউ খেলানো সাদা ফেনার পিছনে অস্তগামী সূর্যের সোনালী আলো মেখে পানিতে ভাসছে ব্লু লিডার। কুয়াশার ছিটেফোঁটাও নেই, দু'মাইলের মত দূরে হলেও জাহাজের অনেক খুঁটিনাটি পরিষ্কার দেখতে পেল ও। প্রায় মিনিট দুয়েক স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে থাকল ও। রোদ ঝলমলে সাগরে কমলা রঙের ঢেউ, দূর পাহাড়, রঙিন মেঘের ভেলা মুগ্ধ করে রাখল ওকে। তারপর গাড়ির কথা মনে পড়ে যাওয়ায় রাস্তার দু'দিকে তাকাল ও।

বাঁ দিকে, রাস্তার এ ধারে দেখা গেল গাড়িটাকে। প্রকাণ্ড, আয়নার মত ঝকঝকে, যেন সদ্য তৈরি লেজার-ইয়ট নোঙর করা হয়েছে। 'কি বোকা আমি!' বিড় বিড় করে বলল রানা। গাড়িটা দেখেই নিজের একটা ভুল ধরতে পেরেছে। ধীর পায়ে এগোল ও। মুগ্ধ একটা ভাব ফুটে উঠল চেহারায়। ভাল কোন গাড়ি দেখলে দারুণ খুশি লাগে ওর।

এটা একটা মেবাক-জেপেলিন টাউন কার। প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে ড্রাইভারকে আলাদা করার জন্যে স্লাইডিং গ্লাস পার্টিশনের ব্যবস্থা আছে। রেডিয়েটরের ওপর বসানো বড় আকারের জোড়া M। তার পিছনে ছয় ফুট লম্বা হুড, শেষ হয়েছে নিচু করে তৈরি উইন্ডশীল্ডের কাছে, তাতে গাড়ির বাইরের চেহারায় সাংঘাতিক বুনো এবং আসুরিক শক্তির একটা ভাব ফুটে উঠেছে। লম্বা ফেন্ডার আর রানিং বোর্ডগুলো চকচকে কালো, কিন্তু কোচওয়র্ক রূপালী পারদের মত ঝলমল করছে। তুলনা মেলা ভার, মনে মনে স্বীকার করল রানা। জার্মান কারিগরীর অপূর্ব নিদর্শন এই গাড়ির প্রতিটি নাট, প্রতিটি বল্টুর ভেতর খুঁজে পাওয়া যাবে। নিঃশব্দে চলা এবং নিখুঁত যান্ত্রিক নৈপুণ্যের জন্যে রোলস-রয়েস ফ্যান্টম থ্রী যদি ব্রিটেনের আদর্শ গাড়ি হয়ে থাকে, তাহলে তার সাথে অনায়াসে পাল্লা দিতে পারে জার্মানীর মেবাক-জেপেলিন।

এগিয়ে গিয়ে গাড়ির পাশে দাঁড়াল রানা। ফ্রন্ট ফেন্ডার ওয়ালে শক্ত ভাবে বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড স্পেয়ার টায়ারটা, সেটার গায়ে ডান হাতটা আলতো ভাবে

বুলাল ও। চাকার গায়ে গভীর ভাবে খোদাই করা রয়েছে ডায়মন্ড আকৃতির নকশা। ওর ঠোঁটে সন্তুষ্টির ক্ষীণ একটু হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। ঘুরে সামনের সীটের দিকে তাকাল ও।

হুইলের পিছনে বসে আছে ড্রাইভার, অলস ভঙ্গিতে দরজার ফ্রেমে আঙুল নাচাচ্ছে। বিরক্ত, ক্লান্ত দেখাল লোকটাকে। চোখ বুজে হাই তুলল একটা। গ্রে-গ্রীন রঙের টিউনিক পরে আছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের নাজী অফিসারদের ইউনিফর্মের সাথে প্রায় হুবহু মিল আছে তার এই পোশাকের, যদিও আস্তিন বা কাঁধে কোন ইনসিগনিয়া নেই। যে ক্যাপটা পরে আছে তার কিনারা অস্বাভাবিক চওড়া, নিচে ঝুলে আছে দু'এক গাছি সোনালী চুল। কিন্তু গায়ের রঙ রোদ ঝলসানো তামাটে। চোখে সিলভার রিমের চশমা। হাত তুলে বাঁকা ঠোঁটে জ্বলন্ত সিগারেট গুঁজল সে। লোকটার চেহারায় গোয়ার্তুমির ছাপ ফুটে আছে, সেটা গোপন করারও কোন চেষ্টা নেই তার মধ্যে।

দেখেই লোকটাকে অসহ্য লাগল রানার। রানিং বোর্ডে একটা পা তুলে দিয়ে একটু ঝুঁকে তাকাল ও। বলল, 'তুমি বোধহয় আমার জন্যেই অপেক্ষা করছ। আমি মাসুদ রানা।'

সোনালীচুলো ড্রাইভার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাবার গরজটুকুও দেখাল না। আঙুলের টোকায় রানার কাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল আধ-খাওয়া সিগারেটটা, খাড়া করল শিরদাঁড়া, ইগনিশন সুইচ ঘুরিয়ে স্টার্ট দিল গাড়ি। ভারী, কর্কশ সুরে বলল, 'আপনি যদি আমেরিকান গারবেজ রিসিভার হয়ে থাকেন,' জার্মান উচ্চারণ ভঙ্গি, ভাঙা ভাঙা ইংরেজী, 'তাহলে চড়তে পারেন।'

ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে, কিন্তু চোখ দুটো হয়ে উঠল কঠোর। 'সামনে দুর্গন্ধ থাকতে পারে, পিছনে উঠি?'

'যেখানে খুশি,' বলল ড্রাইভার। চেহারাটা লাল হয়ে উঠল তার, কিন্তু তবু ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল না।

'ধন্যবাদ,' সহাস্যে বলল রানা। 'পিছনটাই বোধহয় স্বাস্থ্যের জন্যে ভাল হবে।' চকচকে হাতলটা ধরে ঘোরাতেই খুলে গেল ভারী দরজা। টাউন কারের ভেতরে ঢুকল ও। পুরানো ক্যাশনের একটা পর্দা ভাঁজ খুলে নেমে এল পার্টিশনের ওপর, সেই সাথে সম্পূর্ণ আড়ালে পড়ে গেল ড্রাইভার।

শিকারী বিড়ালের মত নিঃশব্দ পায়ে এগোল মেবাক। মৃদু কাঁপন ছাড়া বোঝার কোন উপায় নেই ইঞ্জিন চালু আছে। গিয়ার বদল করল ড্রাইভার, সামান্য একটু খস খস আওয়াজ হলো মাত্র। পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, দেখল বেশ দ্রুত গতিতে লিমিনাসের দিকে ছুটতে শুরু করেছে গাড়ি।

জানালার কাঁচ নামিয়ে দিল ও। পাহাড়ের ঢালগুলোয় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে কার আর নারকেল গাছ। সরু সৈকতকে ফিতের মত ঘিরে রেখেছে প্রাচীন জলপাই গাছ। খানিক দূরে দূরে ছোট ছোট তামাক বা গম খেত। কয়েক মিনিট পর ছবির মত সুন্দর পানাঘিয়া গ্রামের ভেতর দিয়ে পথ করে নিল গাড়ি। কাঁকর ছড়ানো রাস্তার এখানে সেখানে খানা-খন্দে জমে থাকা বৃষ্টির পানি দু'দিকে ছিটিয়ে দিল ছুটন্ত চাকা। গ্রীষ্মের কড়া তাপ যাতে প্রতিফলিত হতে পারে সেজন্যে প্রতিটি বাড়ি সাদা

রঙ করা। চালের প্রান্ত ঢালু হয়ে নেমে এসেছে প্রায় রাস্তার ওপর। ছিমছাম পরিপাটি ঘরদোর, ছেলেমেয়েদের পরনে নতুন জামা-কাপড় না থাকলেও সেগুলো ময়লা নয়। প্রায় প্রতিটি বাড়ির সামনে একটা করে খুদে বাগান। গ্রামটাকে পিছনে ফেলে এল ওরা। তার একটু পরই সামনে দেখা গেল লিমিনাস। কিন্তু কাছে পৌঁছবার আগেই দ্রুত একটা বাঁক নিল গাড়ি, ছোট শহরটাকে পাশ কাটিয়ে ছুটল ধুলো ভর্তি পাহাড়ী পথ ধরে। এদিকে রাস্তা ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে ওপর দিকে। এরপর সামনে পড়ল চুলের কাঁটার মত তীক্ষ্ণ কয়েকটা বাঁক। জানালার নিচেই পাহাড়ের কিনারা, খাড়া নেমে গেছে খাদের ভেতর। রানা অনুভব করল, সরু পথের ওপর মস্ত গাড়িটাকে সোজা রাখার জন্যে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ড্রাইভার। কিন্তু এখন যদি উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসে, কি করবে সে? জানালা দিয়ে মাথা বের করে সামনে তাকাল রানা। হঠাৎ দেখে স্বপ্নপুরীর মত লাগল বিশাল ভিলাটাকে। শেষ বাঁক নিয়ে সোজা সেদিকেই এগোল ড্রাইভার। এখানে চওড়া আর সমতল হয়ে গেছে রাস্তা। আকৃতিতে আধুনিক হলেও, আকারের দিক থেকে রোমান রাজপ্রাসাদের সাথে মিল আছে ভিলাটার। একজোড়া আকাশ ছোঁয়া পাহাড় চূড়ার মাঝখানে, প্রকাণ্ড উপত্যকা দখল করে আছে এস্টেটটা। এখান থেকে দিগন্তজোড়া ঈজিয়ান সাগর দেখতে পাওয়া যায়। দু'মানুষ সমান উঁচু পাঁচিলের গায়ে লোহার গেট, গাড়িটা কাছাকাছি পৌঁছুতেই ভেতর থেকে খুলে গেল, কিন্তু কোন লোকজন দেখতে পেল না রানা। ভেতরে কংক্রিটের রাস্তা, দু'ধারে ফার গাছের সারি। মার্বেল পাথরের এক প্রস্থ সিঁড়ির ধাপের সামনে গাড়ি থামাল ড্রাইভার। সিঁড়ির মাঝামাঝি চওড়া একটা ধাপের ওপর যুবতী মায়ের স্ট্যাচু দেখা গেল, কোলে শিশু, চোখ নামিয়ে নির্বাক তাকিয়ে আছে রানার দিকে। তার দিকে তাকিয়ে থেকেই গাড়ি থেকে নামল রানা।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করবে রানা, হঠাৎ কি মনে করে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপর ঘুরে তাকাল গাড়ির দিকে। 'তোমার নামটা যেন কি?' জানতে চাইল ও।

গাড়ির ভেতর থেকে রানার দিকে এই প্রথম তাকাল লোকটা। চেহারা দেখে মনে হলো, একটু অবাক হয়েছে। 'কার্ল। কেন, নাম দিয়ে কি হবে?'

'কার্ল,' সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলল রানা, 'ভুলেই গিয়েছিলাম, তোমার সাথে জরুরী কথা আছে আমার। গাড়ি থেকে একটু নামবে?'

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল ড্রাইভার। ভুরু কুঁচকে দেখল রানাকে। তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে নেমে এল গাড়ি থেকে। রানার সামনে বুক টান করে দাঁড়াল। 'কি জরুরী কথা? তাড়াতাড়ি বলুন, আমার সময় নেই।'

কার্লের পায়ের দিকে তাকাল রানা। মাথা তুলে বলল, 'তুমি দেখছি জ্যাক বুট পরো, কার্ল!'

'হ্যাঁ, জ্যাক বুট পরি। তাতে কি হলো?'

সারা মুখে সরল হাসি ছড়িয়ে বলল রানা, 'জ্যাক বুটে ভোঁতা পেরেক থাকে, তাই না?'

চেহারায় অস্বস্তি নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কার্ল। বলল, 'থাকে। কিন্তু আপনি আমাকে এ-ধরনের আজেবাজে প্রশ্ন করছেন কেন, হের রানা? কি

বলতে চান আপনি?'

কঠোর হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'আড়িপাতা তোমার কম্ম নয়, ওটা একটা আর্ট। সিলভার রিমের চশমা যে রোদ রিফ্লেক্ট করে তাও তুমি জানো না।'

হতভম্ব দেখাল কার্লকে। কিছু বলতে গেল, কিন্তু নাকের ওপর দুম করে ঘুসি খেয়ে পিছন দিকে ঝাঁকি খেল মাথা, উড়ে গেল ক্যাপ। চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে গেল, দৃষ্টি হয়ে উঠল শূন্য। টলমল করে উঠল শরীর, ভাঁজ হয়ে গিয়ে কংক্রিটের মেঝেতে পড়ল হাঁটু। মাথাটা নিচু হয়ে থাকল, তুলতে চেষ্টা করল কিন্তু পারল না। রক্তের একটা ধারা গড়িয়ে বেরিয়ে আসছে নাকের ফুটো দিয়ে। এক পা পিছিয়ে গেল রানা। লাথি দিতে যাবে, এই সময় কাত হয়ে পড়ে গেল কার্ল। রানার চেহারায় অসন্তোষ আর অতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে তিনটে করে ধাপ টপকে উঠতে শুরু করল ওপর দিকে।

সিঁড়ির মাথার ওপর উঠে পাথরের একটা খিলান পেরোল রানা, গোলাকার একটা উঠনে আবিষ্কার করল নিজেকে, মাঝখানে দেখা গেল কাঁচের মত স্বচ্ছ একটা পুল। গোটা উঠনটাকে ঘিরে আছে বিশ কিংবা তারও বেশি হেলমেট পরা রোমান সৈনিকের স্ট্যাচু, প্রত্যেকটা সাত ফুট করে উঁচু। তাদের দৃষ্টিহীন পাথুরে চোখ পানিতে পরা নিজেদেরই সাদা প্রতিবিম্বের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছে, যেন স্মরণ করছে ভুলে যাওয়া যুদ্ধের কাহিনী। সন্ধ্যার হালকা কালিমা ভৌতিক ছায়া ফেলেছে ওদের গায়ে, রানার মনে হলো সেটা ঝেড়ে ফেলে এখুনি বুঝি জ্যান্ত হয়ে উঠবে সৈনিকের দল। পুলটাকে পাশ কাটিয়ে তাড়াতাড়ি এগোল ও, থামল উঠনের এক কোণে, প্রকাণ্ড একটা দরজার সামনে। ব্রোঞ্জের তৈরি সিংহের একটা মাথা দরজার গায়ে ঝুলছে, ওটাই নকার। হাতল ধরে ওপরে তুলল রানা, তারপর জোরে নামিয়ে নক করল।

প্রায় সাথে সাথে, নিঃশব্দে খুলে গেল দরজা। কিন্তু কাউকে দেখতে না পেয়ে ইতস্তত একটা ভাব দেখা গেল রানার মধ্যে। 'মোনা!' ডাকল ও। কেউ সাড়া দিল না। অগত্যা দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল ও।

সাজানো-গোছানো মাঝারি একটা অ্যান্টিরুম এটা। সবগুলো দেয়াল ঢাকা পর্দার গায়ে যুদ্ধের দৃশ্য। সুতো দিয়ে বোনা সৈনিক দল যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে মার্চ করে এগোচ্ছে। কামরার সিলিংটা গম্বুজের মত, গায়ে অসংখ্য চৌকো খোপ, সেগুলো থেকে হালকা কোমল হলদেটে আলো বেরিয়ে আসছে। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেল না রানা, কাজেই অপেক্ষা করার জন্যে মাঝখানের দুটো মার্বেল বেঞ্চের একটায় বসল ও।

বসার পর এক মিনিটও কাটেনি, দেয়ালের একটা পর্দা হঠাৎ করে সরে গেল এক পাশে। বুড়ো কিন্তু শক্ত-সমর্থ চেহারার এক লোক ঢুকল ভেতরে। সাথে ধবধবে সাদা একটা বিশাল কুকুর।

আট

প্রকাণ্ড জার্মান শেফার্ড দেখে পিলে চমকে ওঠার অবস্থা হলো রানার। জুটি ভালই

মিলেছে, প্রায় হুবহু না হলেও দু'জনের অনেক মিল। কুকুর এবং প্রভু কারও মুখেই হাসি নেই। চোখে হিংস্র পশুর ঠাণ্ডা দৃষ্টি। চেহারায় বুনো, অশুভ শক্তির ছাপ। অনুমান করতে অসুবিধে হয় না, এ লোকের বয়সের গাছ-পাথর নেই, কিন্তু শরীরের কাঠামো এখনও সুঠাম। মুখের কোথাও বলিরেখার কোন চিহ্ন নেই, কিন্তু কপালে কয়েকটা স্পষ্ট ভাঁজ। গোল, জার্মান মুখ। মাথাটা কামানো। ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে আছে, যেন কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছে।

'গুড ইভনিং,' সুরটা প্রায় ধমকের মত বাজল রানার কানে। কটমট করে তাকিয়ে আছে বুড়ো। 'আমার নাতনী বোধহয় তোমাকেই ডিনার খেতে দাওয়াত করেছে?'

উঠে দাঁড়াল রানা। একটা চোখ রাখল মস্ত বাঘের দিকে। জানোয়ারটা হাঁপাচ্ছে। 'জী,' বলল ও। 'মেজর মাসুদ রানা অ্যাট ইওর সার্ভিস।'

বৃদ্ধের কপালের ভাঁজগুলো গুটিয়ে মোটা হয়ে গেল। বেশ একটু অবাক হয়েছে। 'মোনার কথা শুনে মনে হলো সার্জেন্টের র‍্যাঙ্কও পেরোওনি তুমি। এয়ার ফিল্ডে তোমার কাজ নাকি আবর্জনা সংগ্রহ করা?'

'না,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'ওর সাথে ঠাট্টা করেছিলাম আমি।' তারপর, অনেকটা গায়ে পড়ে ঝগড়া করার সুরে বলে উঠল, 'আমি মেজর শুনে নিশ্চয়ই আপনি অসন্তুষ্ট বা অস্বস্তিবোধ করছেন না মি...?'

'আমি হ্যানস ফন হামেল। তোমার সাথে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, মেজর,' কিন্তু গলার আওয়াজ আর চেহারা দেখে মনে হলো পারলে এক্ষুণি সে গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় রানাকে।

বুড়োর বাড়ানো হাতটা ধরল রানা। লক্ষ্য করল, চামড়ায় সামান্য ঢিল পড়েছে, কিন্তু শক্ত মুঠোয় কাঠিন্যের অভাব নেই। বলল, 'সম্মানটুকু আমার, মি. হামেল।'

দেয়ালের একটা পর্দা খামচে ধরল ফন হামেল। পর্দার পিছনে একটা দরজা দেখা গেল। 'এসো, মেজর। মোনার ড্রেস পরা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাকেই সঙ্গ দাও।'

প্রায় অন্ধকার একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এল ওরা। সাদা হাউন্ড আর কামানো মাথাকে অনুসরণ করে তেকোণা একটা স্টাডিরুমে ঢুকল রানা। সিলিংটা গম্বুজ আকৃতির। ইলেকট্রিক ঝাড়বাতি ঝুলছে। তিনদিকের দেয়ালে বুক শেলফ। আরেক দিকের দেয়ালে খুদে আকারের একটা শো-কেস ছাড়া কিছু নেই। শো-কেসের মাথায় অদ্ভুত একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল রানার। জার্মান সাবমেরিনের একটা মডেল। এই পরিবেশে কেমন যেন বেমানান লাগল ওটাকে। ঘরের মাঝখানে সম্পূর্ণ কাঁচ দিয়ে তৈরি একটা বার। সোফা দেখিয়ে বসতে ইঙ্গিত করল বৃদ্ধ রানাকে। জানতে চাইল, 'বলো, তোমার কি পছন্দ?'

'ঠাণ্ডা বিয়ার।'

কেমন যেন থমকে গিয়ে রানার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল ফন হামেল। কিন্তু কিছু বলল না। রানার জন্যে বিয়ার আর নিজের জন্যে স্কচ হুইস্কি ঢালল গ্লাসে। দুটো গ্লাসেই বরফের টুকরো ফেলল সে।

'ভিলাটা দারুণ,' সোফায় বসে হেলান দিল রানা। 'নিশ্চয়ই এর একটা ইন্টারেস্টিং ইতিহাস আছে?'

'ও শিওর!' স্মার্ট ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ফন হামেল। 'খ্রীষ্টের জন্মের একশো আটত্রিশ বছর আগে রোমানরা এটাকে ওদের জ্ঞানের দেবী মিনার্ভার একটা মন্দির হিসেবে তৈরি করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কিছু পরে কিনি আমি, তারপর নতুন করে ভেঙেচুরে এই চেহারা দিই।' রানার হাতে বিয়ারের গ্লাস ধরিয়ে দিল সে। 'আমরা কি কারও স্বাস্থ্য পান করব, মেজর রানা?'

'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই আপনি সাবালক হয়ে উঠেছিলেন, অন্তত আপনার কথা থেকে তাই বোঝা গেল; তারমানে আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান পুরুষ! দেখে কিন্তু মনে হয় না এত বয়স হয়েছে আপনার।" আমি প্রস্তাব করছি, আসুন, আমরা আপনার সুস্বাস্থ্য আর শতায়ু কামনা করে পান করি...'

'শতায়ু?' ভুরু কুঁচকে প্রায় মারমুখো হয়ে উঠল বুড়ো ফন হামেল। 'তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ, মেজর রানা? জানো, আমার বাবা একশো পঁয়ত্রিশ বছর বেঁচেছিলেন? জানো, মৃত্যুর এগারো মাস আগে তিনি আমার সাত নম্বর সংমাকে ঘরে তুলেছিলেন? মৃত্যুর আগের দিন পর্যন্ত ঘোড়ায় চড়ে পাহাড়ে উঠেছিলেন সূর্যোদয় দেখার জন্যে? আর আমার পিতামহ? একশো চল্লিশ বছর দিব্যি হেঁটে-চলে...'

হাত তুলে বাধা দিল রানা। 'ভুল হয়ে গেছে আমার, মি. হামেল। কিছু মনে করবেন না। ঠিক আছে একশো নয়, আপনার দেড়শো বছর আয়ু কামনা করে পান করব আমরা। ও. কে.?'

'আমি যে অন্তত বাপের আয়ুকে ছাড়িয়ে যাব তাতে কোন সন্দেহ নেই,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ফন হামেল। 'কাজেই আমার দীর্ঘ আয়ু কামনা করার কোন প্রয়োজন নেই। তুমি বরং অন্য কিছু সাজেস্ট করো।'

'অন্য কিছু?'

'হ্যাঁ। সুন্দরী নারী...অঢেল...ঢাকা...সুখী জীবন...নিজের বা তোমার দেশের প্রেসিডেন্টের দীর্ঘ আয়ু...তোমার যা খুশি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা, তারপর বলল, 'বেশ। আসুন, আমরা তাহলে আলবার্ট কেসারলিঙের সাহস এবং প্লেন চালাবার নৈপুণ্য স্মরণ করে পান করি।' ফন হামেলের চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে যেতে দেখল রানা। 'আলবার্ট কেসারলিং, যাকে হক অভ ম্যাসেডোনিয়া বলা হত। তার কথা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, মি. হামেল?'

ধীরে ধীরে রানার সামনের সোফায় বসে পড়ল ফন হামেল। গ্লাসটা একটু একটু নাড়ছে, ভেতরে ঘুরছে বরফের টুকরোগুলো। ঠাণ্ডা চোখে তাকিয়ে থাকল রানার দিকে, তারপর শান্ত সুরে, প্রায় ফিসফিস করে শুরু করল, 'অদ্ভুত মানুষ তুমি, মেজর রানা। কৌতুক করার জন্যে নিজের পরিচয় দাও গারবেজ কালেক্টর বলে। আমার ভিলায় প্রথম পা দিয়েই আমার ড্রাইভারকে ঘুসি মারো। তারপর আমাকে হতবাক করে দাও আমার পুরানো বন্ধু আলবার্ট কেসারলিঙের সাহসের কথা স্মরণ করতে বলে।' গ্লাসে চুমুক দিল সে। গ্লাসের কিনারার ওপর দিয়ে তীক্ষ্ণ

চোখে তাকিয়ে থাকল রানার চোখে। 'কিন্তু তোমার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব কি জানো?' নিকোটিনে পোড়া মোটা, পুরু ঠোঁটে বিদ্রূপের ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। 'আমার নাতনী মোনাকে বড় জবর দাওয়াই দিয়েছ হে! আজ সকালে সৈকত থেকে ফিরে সেই যে গুন গুন শুরু করেছে, সারাটা দিন থামার লক্ষণ নেই। ওকে তুমি খুশি করতে পেরেছ, সেজন্যে আমি ধন্যবাদ দিই তোমাকে, মেজর রানা।'

'শুধু কার্লের ব্যাপারে একটা কথা বলার আছে আমার,' বলল রানা। 'ওর রুচি বলতে কিছু নেই। ব্যাটা পিপিং টম···'

'কিন্তু ওকে তুমি দোষ দিতে পারো না,' রানাকে বাধা দিল ফন হামেল। 'বেচারা আমার নির্দেশ পালন করছিল মাত্র। মোনাকে চোখে চোখে রেখে পাহারা দেবার দরকার আছে, মেজর রানা। ও আমার একমাত্র জীবিত আপনজন। ওর কোন বিপদ হোক আমি তা চাই না।'

'কেন মনে করছেন ওর বিপদ হতে পারে?'

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ফন হামেল। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে অন্ধকার হয়ে আসা সাগরের দিকে তাকাল সে। 'জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবার জন্যে অমানুষিক খেটেছি আমি, ব্যক্তিগত এই সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে প্রচুর মূল্য দিতে হয়েছে আমাকে। এত ওপরে ওঠার জন্যে অনেক বন্ধুকে হারিয়েছি আমি, অনেক শত্রু তৈরি করেছি। তারা কে কখন প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে আসবে কেউ বলতে পারে না!'

ফস্ করে জিজ্ঞেস করল রানা, 'সেজন্যেই কি আপনি শোল্ডার হোলস্টারে ল্যুগার রাখেন?'

জানালার দিকে পিছন ফিরল ফন হামেল। সাদা ডিনার জ্যাকেট টেনেটুনে আরও ভালভাবে ঢাকার চেষ্টা করল বাঁ বগলের নিচে ফুলে থাকা পিস্তলটা। 'জিজ্ঞেস করতে পারি, এটা যে একটা ল্যুগার তা তুমি জানলে কিভাবে?'

'স্রেফ অনুমান,' বলল রানা। 'আপনাকে দেখে ল্যুগার টাইপ বলে মনে হয়েছে।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফন হামেল। 'এমনিতে আমি কিন্তু দিল-খোলা লোক। কাউকে সন্দেহ করা আমার স্বভাব নয়। কিন্তু মোনা তোমার সম্পর্কে যা বলল আর তোমার যা আচরণ দেখছি, দুটোর মধ্যে কোন মিল নেই—তোমাকে আমার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে, মেজর রানা।'

'রাখঢাক না করে স্পষ্টভাবে কথা বলছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'এতে করে মুখের ওপর পরিষ্কার কথা বলার অধিকার আমিও পেয়ে গেলাম।'

আচমকা অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল বৃদ্ধ। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমাকে উত্তেজিত করতে পারে এমন কিছু বলার কথা আছে নাকি তোমার?'

'যে-কেউ আমাকে সন্দেহ করতে পারে,' বলল রানা। 'এবং আমিও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নই যে খেলাচ্ছলে ছোটখাট দু'চারটে পাপ আমিও করেছি। কিন্তু সেই সাথে জানাতে চাই, হত্যা বা জোরজুলুম করে টাকা কামানোর মধ্যে কোন

কালেই ছিলাম না আমি। কিন্তু আপনি, মি. হামেল? ঠিক কি ধরনের ব্যবসাতে জড়িত আপনি, জানতে পারি?'

ফন হামেলের লালমুখো চেহারা আরও লাল হয়ে উঠল, চোখে ঝিক্ করে উঠল সন্দেহ। জোর করে হাসল সে। 'আমার ব্যবসার কথা যদি বলি তোমাকে, মেজর রানা, শুনে খিদে নষ্ট হয়ে যাবে তোমার। আর তোমার খিদে নষ্ট হয়ে গেলে মোনা আমার ওপর ভীষণ রাগ করবে। বিশেষ করে আধবেলা ধরে রান্নাবান্নার তদারক করেছে ও,' কাঁধ ঝাঁকাল। 'হয়তো অন্য কোনদিন বলব, তোমাকে আরও ভাল করে জানার পর।'

বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দেবার সময় ভাবল রানা, এ কার পাল্লায় পড়ল সে? পাগল-ছাগল, নাকি গভীর জলের মাছ? যাই হোক না কেন, বুড়োর প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে আলবার্ট কেসারলিঙের প্রসঙ্গটা আবার তোলা দরকার।

'আরেকবার গ্লাসটা ভরে দিই, মেজর রানা?' রানার চিন্তায় বাধা দিল ফন হামেল।

খালি গ্লাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। 'ধন্যবাদ, আমি নিজেই নিচ্ছি।' বারের সামনে এসে দাঁড়াল ও। গ্লাসে বিয়ার আর বরফ ঢেলে ঘুরল ও, বারে হেলান দিয়ে তাকাল ফন হামেলের দিকে। 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের এভিয়েশন সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়াশোনা আছে আমার। তা থেকে যতদূর জেনেছি, আলবার্ট কেসারলিঙের মৃত্যু বলতে গেলে একটা অমীমাংসিত রহস্যই। জার্মান অফিশিয়াল রেকর্ড বলে, ব্রিটিশরা তাকে গুলি করে নামায়, ঈজিয়ান সাগরের কোথাও ক্র্যাশ করে তার প্লেন। কিন্তু কে গুলি করেছিল রেকর্ডে তার কোন উল্লেখ নেই। তাছাড়া, লাশটা পাওয়া গিয়েছিল কিনা সে-সম্পর্কেও কিছু বলা হয়নি।'

একটু ঝুঁকে কুকুরটার মাথায় হাত বুলাল ফন হামেল। চোখ দেখে মনে হলো, নিজেকে অতীতের মধ্যে হারিয়ে ফেলেছে। নিচু গলায় বলতে শুরু করল, 'উনিশশো আঠারো সালে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ওটা ছিল আলবার্টের ব্যক্তিগত যুদ্ধ। মুখে তো বলতই, কাজেও দেখাতে কসুর করত না। প্লেন নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আকাশে উঠতে জানত না সে। ভূতে পাওয়া মানুষ যেমন উন্মাদ, উন্মত্ত হয়ে ওঠে, যুদ্ধ-যাত্রার সময় ঠিক তাই হয়ে উঠত আলবার্ট। কোন ভয়-ডর ছিল না তার, বৈরী প্লেনের ঝাঁক দেখলেই হলো, নিজের বা প্লেনের নিরাপত্তার কথা না ভেবে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আকাশে ওঠার পর থেকে পাগলের মত ককপিটের কিনারায় একনাগাড়ে ঘুসি মারত সে, রক্তাক্ত হয়ে যেত হাত দুটো। সেই সাথে মা-বাপ তুলে গালিগালাচ আর অভিশাপ দিত ব্রিটিশদের। ফুল থ্রটল দিয়ে টেক-অফ করত সে, তার অ্যালব্যাট্রস সন্ত্রস্ত পাখির মত লাফ দিয়ে উঠত আকাশে। অথচ,' রানার দিকে তাকাল ফন হামেল। 'ভাবতে আশ্চর্য লাগে, অন্য যে-কোন সময়ে একেবারে মাটির মানুষ ছিল আলবার্ট। অত্যন্ত কৌতুক-প্রিয় ছিল সে, ছোট ছেলেমেয়েদের খুবই ভালবাসত। জার্মান সৈনিক সম্পর্কে দুনিয়ার যা ধারণা, ঠিক তার উল্টো।'

'তাই?'

বলে চলল ফন হামেল, যেন রানার কথা শুনতেই পায়নি, 'চতুর একটা ব্রিটিশ কৌশলের কাছে হার মানতে হয় আলবার্টকে। আসলে, নিজের মৃত্যু নিজেই

ডেকে নিয়ে আসে সে। একটু মনোযোগ দিয়ে তার প্লেন চালাবার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে ওরা, এবং দেখতে পায়, অবজার্ভেশন বেলুনের ওপর সাংঘাতিক দুর্বলতা আছে তার। বেলুন দেখতে পেলেই হলো, হামলা চালিয়ে সেটাকে ধ্বংস না করে স্বস্তি ছিল না তার। ব্রিটিশরা তার এই দুর্বলতাটাকে পুঁজি করে একটা ফাঁদ পাতল। আকাশে একটা বেলুন তুলল ওরা, অবজার্ভেশন বাস্কেটে ভরল হাই এক্সপ্লোসিভ আর খড় ও কাপড় দিয়ে তৈরি একটা ডামি। ডিটোনেশন ওয়্যার ঝুলে থাকল মাটিতে। এরপর ব্রিটিশদের শুধু অপেক্ষার পালা।' ধীর পায়ে এগিয়ে এসে একটা সোফায় বসল ফন হামেল। চোখ দুটো বুজে এল। তারপর মুখ তুলে সিলিঙের দিকে তাকাল সে। কুকুরটা তার পায়ের কাছে বসল।

'বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়নি ওদের। মাত্র একদিন পর মিত্রপক্ষের লাইন পেরিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ল আলবার্ট। তীর থেকে বেশ খানিক দূরে, আকাশের ওপর ভাসছিল বেলুনটা। দেখতে পেয়েই প্লেন নিয়ে ছুটল সে। নিচ থেকে গুলি করা হচ্ছে না দেখে নিশ্চয়ই অবাক হয়েছিল সে। কিন্তু তার মনে কোন সন্দেহের উদয় হয়নি, হলে বেলুনটার ওপর হামলা না চালিয়ে ফিরে আসত। প্লেন নিয়ে ছুটে যাবার সময় বেলুনের সাথে ঝুলন্ত বাস্কেটের রেলিঙে ডামিটাকেও নিশ্চয় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল সে। তাকে প্যারাস্যুট নিয়ে লাফিয়ে পড়তে না দেখে হয়তো ভেবেছিল, ঘুম বা তন্দ্রার মধ্যে আছে। গর্জে উঠল আলবার্টের গান। হাইড্রোজেন ভর্তি ব্যাগ বিস্ফোরিত হয়ে বিশাল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে দিল আগুনের মেঘ। আলবার্ট গুলি শুরু করার সাথে সাথে এক্সপ্লোসিভ ডিটোনেট করে ব্রিটিশরা।'

'তারমানে মিত্রপক্ষের এলাকায় ক্র্যাশ করে আলবার্ট?'

'বিস্ফোরণের পর ক্র্যাশ করেনি প্লেনটা,' বলল ফন হামেল। 'আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে অ্যালব্যাট্রস, কিন্তু তার ডানা ভেঙে গিয়েছিল, কন্ট্রোল সারফেসও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। আর মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিল আলবার্ট। বোধহয় সারা শরীর পুড়ে গিয়েছিল তার। কিন্তু তাকে নিয়ে ম্যাসেডোনিয়ান কোস্টলাইন পেরিয়ে আসে প্লেনটা, তারপর অদৃশ্য হয়ে যায় সাগরে। সেই থেকে হক অভ ম্যাসেডোনিয়া বা তার বিশ্বস্ত বাহন গোলাপী অ্যালব্যাট্রসকে আর কখনও দেখা যায়নি।'

'ভুল করলেন,' সাথে সাথে বলল রানা, 'এতদিন দেখা যায়নি, কিন্তু গতকাল আবার দেখা গেছে।' ফন হামেলের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করার জন্যে তীক্ষ্ণ হলো ওর দৃষ্টি।

ক্ষীণ একটু বিস্ফারিত হলো চোখ জোড়া, তাছাড়া ফন হামেলের চেহারা ভাবলেশহীন হয়েই থাকল। পরস্পরের সাথে সেঁটে থাকা ঠোঁট জোড়া একটুও নড়ল না।

তাড়াতাড়ি আবার প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। 'আপনি আর আলবার্ট কি প্রায়ই এক সাথে ফ্লাই করতেন?'

'হ্যাঁ, অনেকবার একসাথে ফ্লাই করেছি আমরা। মাঝে মধ্যে আমরা এমনকি টু সীটার রাম্পলার বোম্বার নিয়ে ব্রিটিশ অ্যারোড্রোমে আগুনের বোমা ফেলেছি। অ্যারোড্রোমটা এখানে, এই থাসোসে ছিল। প্লেন চালাত আলবার্ট, আর আমি

ছিলাম অবজার্ভার এবং বম্বার্ডিয়ার।'

'কোথায় ছিল আপনাদের ঘাঁটি?'

'জাস্টা সেভেনটি-থ্রীতে পোস্টেড ছিলাম আমরা, প্লেন নিয়ে উঠতাম ম্যাসেডোনিয়ার জান্তি অ্যারোড্রোম থেকে।'

খালি বিয়ারের গ্লাস বারে নামিয়ে রেখে সোফায় ফিরে এল রানা। বৃদ্ধের মুখের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর বলল, 'আলবার্টের মৃত্যু সম্পর্কে বলার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ, মি. হামেল। কিছুই বাদ দেননি আপনি।'

'আলবার্ট ছিল আমার অন্তরের বন্ধু,' নিচু গলায় বলল ফন হামেল। 'তার করুণ পরিণতির কথা আমি ভুলি কিভাবে! তারিখ, এমনকি সময়টা পর্যন্ত মনে আছে আমার। রাত ন'টা, জুলাই মাসের পনেরো, উনিশশো আঠারো।'

'কিন্তু ভাবতে আশ্চর্য লাগে, পুরো ঘটনাটা আর কেউ জানে না,' বলল রানা। 'বার্লিন আর্কাইভ এবং লন্ডন এয়ার মিউজিয়ামে আলবার্টের মৃত্যু সম্পর্কে কোন তথ্য নেই। কোন কোন বই-পত্রে তার উল্লেখ পেয়েছি বটে, কিন্তু বলা হয়েছে আলবার্টের মৃত্যু একটা রহস্যময় ব্যাপার, ব্যস, আর কিছু না।'

'এতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই,' বলল ফন হামেল। উঠে গিয়ে বারের সামনে দাঁড়াল সে। প্রভুভক্ত কুকুরটাও গেল তার সাথে। গ্লাসে হুইস্কি ভরে নিয়ে আবার সোফায় ফিরে এল সে। 'জার্মান আর্কাইভে ঘটনাটা নেই তার কারণ ইম্পিরিয়াল হাই কমান্ড ম্যাসেডোনিয়ার যুদ্ধকে কোন গুরুত্বই দেয়নি। আর ব্রিটিশরা ঘটনার কথা উল্লেখ করেনি লজ্জায়। তারা কাপুরুষের মত ফাঁদে ফেলে আলবার্টকে। তাছাড়া, শেষবার তারা যখন আলবার্টের অ্যালব্যাট্রসটাকে দেখে, তখন সেটা আকাশে উড়ছিল, পড়ে যায়নি। তাদের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র সফল হয়েছে কিনা নিশ্চিতভাবে জানার কোন উপায় ব্রিটিশদের ছিল না।'

'পাইলট বা প্লেনের কোন হদিশই আর পাওয়া যায়নি?'

'না। যুদ্ধের পর আলবার্টের ভাই অনেক খোঁজ-খবর করে, কিন্তু আলবার্টের শেষ ঠিকানা জানা সম্ভব হয়নি।'

'আলবার্টের ভাইও কি পাইলট ছিল?'

'না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে নানা উপলক্ষে বেশ কয়েকবারই তার সাথে আমার দেখা হয়েছিল। জার্মান নেভীতে একজন ফ্লিট অফিসার ছিল সে।'

আর কোন প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করল না রানার। ফন হামেলের কথা মুখস্থ করা গল্পের মত লাগল ওর। সেই সাথে মনে হলো, কিভাবে যেন বোকা বানানো হচ্ছে ওকে। অন্তর থেকে কে যেন সাবধান হতে বলল ওকে। এই সময় খটখট হাইহিলের আওয়াজ ঢুকল কানে। ঘাড় না ফিরিয়েও বুঝতে পারল ও, দোর-গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে মোনা।

'হ্যালো, এভরিবডি!' জলতরঙ্গের মত মিষ্টি শোনাল মোনার গলা।

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। মিনি ড্রেস পরেছে মোনা, রোমান টোগার মত ডিজাইন, পা বরাবর খোলা। রঙটা ভাল লাগল রানার—কমলা-সোনালী, মোনার চামড়ার সাথে মিল আছে। উদ্ভাসিত মুখে এগিয়ে এল সে।

'ধন্যি মেয়ে বটে!' উঠে দাঁড়িয়ে অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'দাওয়াত করে

আনিয়ে মেহমানকে কেউ এতক্ষণ বসিয়ে রাখে?' মোনার বাড়িয়ে দেয়া হাতটা ধরল ও, মুখের কাছে টেনে নিয়ে উল্টো পিঠে আলতোভাবে চুমু খেল।

'ও কিন্তু সার্জেন্ট নয়, মোনা। মেজর!' সিলিঙের দিকে তাকিয়ে বলল, ফন হামেল।

লালচে একটা আভা ফুটল মোনার চেহারায়। 'তুমিও তো দেখছি কম পাজি নও! মিথ্যে পরিচয় দিয়েছিলে কেন?'

'বিশ্বাস করো, এই খানিক আগে বেস কমান্ডার আবর্জনার গাড়ি থেকে টেনে নামিয়ে ক্যাপ্টেন বানিয়ে দিল আমাকে, তারপর প্রমোশন দিয়ে বলল, এখন থেকে আমি নাকি একজন মেজর।'

'ঠাট্টা করো না,' মুখ ভার করল মোনা। 'মিথ্যে কথা বলার কি দরকার ছিল? বললে, তোমার র‍্যাঙ্ক সার্জেন্টের চেয়েও নিচে...'

'না,' বাধা দিয়ে বলল রানা, 'বলেছিলাম, আমি কখনও সার্জেন্ট ছিলাম না। মনে আছে?'

রানার হাত ধরে ওকে সোফায় বসিয়ে দিল মোনা, নিজেও বসল ওর পাশে। 'গ্রেট ওয়রের গল্প শুনিয়ে নানা নিশ্চয়ই তোমাকে বিরক্ত করে তুলেছে?'

'বিরক্ত? না। বরং অবাক হয়েছি।' মোনার চোখের দিকে তাকিয়ে ভেতরটা দেখতে চাইল রানা। অনুমান করার চেষ্টা করল, এই মুহূর্তে কি ভাবছে সে।

তাচ্ছিল্যের সাথে কাঁধ ঝাঁকাল মোনা। 'তোমরা পুরুষরা শুধু ওই একটা জিনিসই জানো—যুদ্ধের গল্প!' বারবার রানার দিকে তাকাল সে। সৈকতে যার সাথে প্রেম হয়েছিল, এ লোক যেন সে লোক নয়। অনেক বেশি আকর্ষণীয় আর চৌকস মনে হলো একে। বুড়ো নানার দিকে ফিরল সে। 'জানি রাগ করবে, তবু অনুরোধ করব, ডিনারের আগে তুমি আর রানাকে আশা করো না! তার আগে পর্যন্ত আমার দখলে থাকবে ও।'

বাঁধানো দাঁত বের করে একগাল স্নেহের হাসি হাসল ফন হামেল। উঠে দাঁড়িয়ে সকৌতুকে স্যালুট ঠুকল নাতনীকে উদ্দেশ্য করে, বলল, 'কি সাধ্য আমার, মহারাণীর কথা অমান্য করি! দেড়ঘণ্টা পর আমি কিন্তু আবার রাজত্ব করব। মনে থাকবে তো?'

'ধন্যবাদ, নানা,' খুশি হয়ে উঠল মোনা। 'আমার প্রথম নির্দেশ, তোমরা দু'জনেই ডিনার টেবিলে চলো! কুইক!'

রানাকে নিয়ে টেরেসে বেরিয়ে এল মোনা, সেখান থেকে মার্বেল পাথরের ক'টা ধাপ টপকে উঠে এল গোল একটা ঝুল-বারান্দায়। এখান থেকে শ্বাসরুদ্ধকর লাগল দৃশ্যটা। ভিলা থেকে অনেক নিচে লিমিনাসের ঘরে ঘরে টিম টিম বাতি জ্বলছে। এবং সাগরের ওপর কালো আকাশে একটা দুটো করে ফুটতে শুরু করছে তারা। ঝুল-বারান্দার মাঝখানে তিনজনের জন্যে একটা টেবিল সাজানো হয়েছে। বড়সড় একটা গ্লোবে জ্বলছে ছ'টা মোমবাতি, আলোকিত করে রেখেছে টেবিলটাকে। সিলভার ডিনার-ওয়্যারগুলো মোমের আলোয় সোনালী হয়ে উঠেছে।

বসতে সাহায্য করার জন্যে মোনার চেয়ার একটু টেনে পিছিয়ে দিল রানা,

কানের কাছে ঠোঁট নামিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'সাবধান! রোমান্টিক পরিবেশে আমি কেমন উত্তেজিত হয়ে উঠি সে তো জানোই।'

রানার চোখে চোখ রেখে মিষ্টি করে হাসল মোনা। 'এখানে কিন্তু আমাকে পেতে অসুবিধে আছে!'

রানা কিছু বলার আগেই সাদা শেফার্ড কুকুরটাকে অনুসরণ করে ঝুল-বারান্দায় উদয় হলো ফন হামেল। একটা হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে, সাথে সাথে এক পাশের পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকল স্থানীয় এক তরুণী। খিদে বাড়াবার জন্যে প্রথমে পরিবেশিত হলো পনির, জলপাই আর শসা দিয়ে তৈরি একটা অ্যাপিটাইজার। এরপর এল চিকেন সুপ, তার সুগন্ধ বাড়ানো হয়েছে লেবু আর ডিমের হলুদ দিয়ে। তারপর মেইন কোর্স—সেঁকা অয়েস্টারের সাথে পেঁয়াজ কুচি আর কোরা নারকেল। পুরানো গ্রীক রেটসিনার বোতল খুলল ফন হামেল। অপূর্ব তার স্বাদ, গন্ধ। খালি ডিশগুলো সরিয়ে নিয়ে গেল গ্রীক তরুণী, তারপর নিয়ে এল ফল-পাকড়ের মস্ত এক থালা। তুর্কী-নিয়মে তৈরি কফি পরিবেশিত হলো সবশেষে।

কফির কাপে চুমুক দেয়ার ফাঁকে মোনার হাঁটুর সাথে হাঁটু ঘষল রানা। আশা করল, মুচকি হাসবে মোনা, কিন্তু ঘটল উল্টোটা। ওর দিকে ভীত-সন্ত্রস্ত চোখ তুলে তাকাল সে। রানার মনে হলো, কি যেন বলতে চায় মেয়েটা।

খুক্ করে গলা খাঁকারি দিয়ে টেবিলের ওদিক থেকে সরাসরি মোনার দিকে তাকাল ফন হামেল। 'এবার তাহলে পুরুষদের একটু একা থাকতে দাও, মোনা। মেজর রানার সাথে দু'একটা জরুরী বিষয়ে আলাপ করতে চাই। স্টাডিতে গিয়ে অপেক্ষা করো, কেমন? বেশি দেরি হবে না, এখুনি আসছি আমরা।'

চেহারা দেখে মনে হলো, ফন হামেল এই রকম একটা কিছু বলবে তা সে আগেই অনুমান করেছিল, কিন্তু তবু অবাক হবার ভান করল মোনা। উত্তরে কিছু বলার আগে শক্ত করে চেপে ধরল টেবিলের কিনারা। কেমন যেন শিউরে উঠল সে। 'কিন্তু নানা, ওর সাথে তোমার আবার কি জরুরী আলাপ থাকতে পারে? বুঝেছি, আবার সেই যুদ্ধের গল্প করতে চাও! ইস্, কি বিরক্তিকর! তারচেয়ে তুমিই বরং স্টাডিতে গিয়ে বসো, খানিক পর আমি নিজে তোমার হাতে তুলে দিয়ে আসব রানাকে? লক্ষ্মী নানা, না করো না!'

ফন হামেলের চেহারায় স্নেহ-মমতার ছিটেফোঁটাও থাকল না। কঠোর দৃষ্টিতে নাতনীর দিকে তাকিয়ে থাকল ঝাড়া পাঁচ সেকেন্ড, তারপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলল, 'বড়রা যা বলে শুনতে হয়। বললাম তো, যাবার আগে তোমার সাথে দেখা করবে রানা। যাও! ওর সাথে আমি এখন জরুরী কিছু আলাপ সারব।'

মনে মনে রেগে গেল রানা। হঠাৎ এই পারিবারিক কলহের কারণ কি? ওকে নিয়ে টানাহ্যাঁচড়া করার মানে? উপলব্ধি করল, এসবের ভেতর কোথাও একটা গোলমাল আছে। অতি পুরাতন বিশ্বস্ত বন্ধুর মত ওর ঘাড়ের পেছনে মৃদু স্পর্শ করল একটা অনুভূতি, বিপদ হতে পারে জানিয়ে দিয়ে সতর্ক হতে বলল ওকে। ফন হামেল এবং মোনা পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে নিয়ে চুপিসাড়ে একটা কাজ সারল রানা। ফলের থালা থেকে আলগোছে একটা ছুরি তুলে নিল ও, কয়েক সেকেন্ড পর গুঁজে রাখল সেটা মোজার ভেতর।

ফ্যাকাসে চেহারা নিয়ে রানার দিকে ফিরল মোনা। 'আমাকে মাফ করো, রানা!' বলে উঠে দাঁড়াল সে।

একটা হাত বাড়িয়ে মোনার কনুই চেপে ধরল রানা। 'যত তাড়াতাড়ি পারি দেখা করব তোমার সাথে।'

'অপেক্ষা করব আমি,' হঠাৎ গলাটা ধরে এল মোনার। তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে হন হন করে এগোল সিঁড়ির দিকে। কিন্তু তার আগেই ওর চোখের কোণে পানি দেখতে পেল রানা।

মোনা বারান্দা থেকে চলে যেতেই মৃদু শব্দে হাসল ফন হামেল। 'আদর দিয়ে মাথায় তুলেছি, বুঝলে? যদি জানতাম চুপচাপ বসে থাকবে, তাহলে তাড়াতাম না! কিন্তু ওর স্বভাবই এমন যে প্রতিটি কথার মাঝখানে ফোড়ন কাটবে, নাক গলাবে! ভাগিয়ে না দিয়ে উপায় কি? ওর ওপর রাগ করলাম বলে তুমি আবার কিছু মনে করলে নাকি হে?'

মাথা নাড়ল রানা। আর কি করা উচিত ভেবে পেল না।

লম্বা একটা আইভরি হোল্ডারে সিগারেট গুঁজে তাতে আগুন ধরাল ফন হামেল। সিলিঙের দিকে মুখ তুলে ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'ব্র্যাডি ফিল্ডের ওপর কালকের হামলা সম্পর্কে আমার কৌতূহল এখনও মেটেনি। লোক মুখে শুধু এইটুকু জেনেছি যে মান্ধাতা আমলের অচেনা একটা প্লেনই নাকি দায়ী। সত্যিই কি তাই?'

'পুরানো,' বলল রানা, 'কিন্তু অচেনা নয়।'

'অচেনা নয়?' অবাক দেখাল বুড়োকে। 'তারমানে তোমরা ওটাকে চিনতে পেরেছ?'

টেবিল থেকে একটা কাঁটাচামচ তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছে রানা, তাকিয়ে আছে ফন হামেলের চোখের দিকে। চামচটা টেবিলক্লথের ওপর নামিয়ে রেখে বলল, 'অ্যালব্যাট্রস ডি থ্রী।'

'পাইলট?' নিচু গলায়, কিন্তু দ্রুত জানতে চাইল বুড়ো জার্মান। 'তার পরিচয়ও কি জানতে পেরেছ তোমরা?'

'না। কিন্তু তার পরিচয় বের করতে খুব বেশি সময় লাগবে না।'

'তারমানে কি আশা করছ খুব তাড়াতাড়ি তাকে গ্রেফতার করতে পারবে?'

ইচ্ছে করেই উত্তর দিতে একটু দেরি করল রানা। তারপর বলল, 'ষাট-সত্তর বছরের পুরানো একটা অ্যান্টিক এয়ারক্রাফট, তার মালিককে খুঁজে বের করা তেমন কঠিন হবার তো কথা নয়।'

ফন হামেলের ঢিলেঢালা মুখের চামড়ায় বিদ্রূপের হাসি ছড়িয়ে পড়ল। 'ম্যাসেডোনিয়ান গ্রীস দুর্গম পাহাড়ী এলাকা, সমতল উপত্যকাতেও লোক-বসতি নেই। কয়েক হাজার বর্গমাইল জোড়া পাহাড়ের কোথায় তাকে পাবে তোমরা? একটা খুদে অ্যালব্যাট্রস নয়, এক স্কোয়াড্রন জেটও যদি এখানে লুকিয়ে রাখা হয়, সারা জীবন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না!'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'কে বলেছে পাহাড় আর উপত্যকায় খুঁজব আমরা?'

'খোঁজার আর কোন জায়গা আছে নাকি?'

'কেন, সাগর?' ঘাড় ফিরিয়ে নিচে, অন্ধকার ঈজিয়ানের দিকে তাকাল রানা।

'উনিশশো আঠারো সালে ঠিক যেখানে আলবার্ট কেসারলিং ক্র্যাশ করেছিল, হয়তো সেখানেই ওটাকে পাব আমরা।'

ফন হামেলের একটা ভুরু বাঁকা হয়ে কপালে উঠল। 'তুমি কি আমাকে ভূত-প্রেত বিশ্বাস করতে বলছ?'

'যখন ছোট ছিলেন তখন সান্তাক্রুজে বিশ্বাস রাখতেন। যুবক বয়সে সত্যিকার কুমারী মেয়ে আছে বলে বিশ্বাস করতেন। তালিকায় ভূতকে ঠাঁই দিতে আপত্তি কিসের?'

'ধন্যবাদ, মেজর রানা। কিন্তু সবিনয়ে জানাচ্ছি, আধিভৌতিক বা অলৌকিক কিছুতে আমার বিশ্বাস নেই। আমি অঙ্ক আর কঠোর বাস্তবতায় বিশ্বাসী।'

'বেশ,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'ভূতের সম্ভাবনা বাদ দেয়া যাক। তা বাদ দিলে আরেকটা সম্ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছেন?'

শক্ত পাথর হয়ে গেল ফন হামেলের চেহারা। রানার চোখে বিঁধে থাকা তার দৃষ্টি এক চুল নড়ল না।

'আলবার্ট কেসারলিং যদি বেঁচে থাকে, তাহলে?'

ঝুলে পড়ল বুড়ো জার্মানের মুখ। পরমুহূর্তে মনে হলো, গর্জে উঠতে যাচ্ছে সে। কিন্তু আশ্চর্য দ্রুততার সাথে সামলে নিল নিজেকে। ধীরেসুস্থে টান দিল সিগারেট পাইপে। তারপর বলল, 'এসব অর্থহীন প্রলাপ! আলবার্ট বেঁচে থাকলে তার বয়স হবে আশির ওপর। আমার দিকে ভাল করে তাকাও, মেজর। আঠারোশো নিরানব্বই সালে জন্মেছি আমি। তুমি কি মনে করো আমার বয়েসী একজন লোকের পক্ষে একটা খোলা-ককপিট প্লেন চালানো সম্ভব? এয়ারফিল্ডে হামলা চালাবার কথা না হয় নাই তুললাম। উঁহুঁ, আলবার্ট বেঁচে আছে এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'ফ্যাক্টস আপনার পক্ষে, তা ঠিক,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার কেন যেন মনে হয়, এসবের সাথে আলবার্টের কিছু একটা সম্পর্ক না থেকেই পারে না।' ফন হামেলের দিক থেকে সাদা কুকুরটার ওপর চোখ পড়ল রানার। হঠাৎ করে নিজের অজান্তেই সারা শরীরের পেশী টান টান হয়ে উঠল ওর। গোটা ব্যাপারটাই উদ্ভট লাগল ওর কাছে। মোনার দাওয়াত পেয়ে ভিলায় এল ও, আশা করেছিল হাসি-খুশির মধ্যে সময়টা কাটবে। তার বদলে মোনার নানা দখল করে নিল ওকে। উপলব্ধি করল ও, যতটুকু স্বীকার করছে হামলা সম্পর্কে তারচেয়ে অনেক বেশি জানে লোকটা।

পরিণতি যাই হোক, আরেকটু বাজিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল রানা।

'পঁয়ষট্টি বছর আগে গায়েব হয়ে গিয়ে কাল যদি আবার ফিরে এসে থাকে আলবার্ট,' বলল রানা, 'তাহলে জানতে ইচ্ছে করে মাঝখানের সময়টা কোথায় ছিল সে—স্বর্গে, নরকে, নাকি এই থাসোসেই?'

বুড়ো জার্মানের রগচটা চেহারায় থমথমে গাম্ভীর্য ফুটল। 'ঠিক কি বলতে চাইছ বুঝতে পারছি না।'

কঠিন সুরে বলল রানা, 'বলতে চাইছি, বোকা সাজবেন না। ব্র্যাডি ফিল্ডের হামলা সম্পর্কে আমার কাছ থেকে জানতে চান আপনি, অথচ আমার বিশ্বাস

হামলাটা সম্পর্কে আপনার চেয়ে বেশি আর কেউ জানে না।'

সাথে সাথে উঠে দাঁড়াল ফন হামেল। গোলগাল মুখটা টকটকে লাল হয়ে উঠল রাগে। 'আমার ভিলায় বসে আমার সাথে বেয়াদবি করতে সাহস পাও তুমি! তোমার অর্থহীন প্রলাপ শোনার ধৈর্য নেই আমার। এখন যদি চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও, খুশি হই।'

উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'বেশ।' বলে সিঁড়ির দিকে পা বাড়াল ও।

'ওদিকে নয়,' বাধা দিল ফন হামেল। ঝুল-বারান্দার শেষ প্রান্তে একটা দরজা, সেদিকে হাত তুলে বলল, 'ওদিকে।'

'যাবার আগে মোনার সাথে দেখা করতে চাই,' বলল রানা।

'কিন্তু আমি চাই এই মুহূর্তে আমার ভিলা থেকে বেরিয়ে যাও তুমি! ভবিষ্যতে আর কখনও মোনার সাথে দেখা করার চেষ্টা করো না। এটা আমার আদেশ।'

রানার আঙুলগুলো বেঁকে গিয়ে শক্ত মুঠো হয়ে গেল। 'যদি দেখা করি?'

ভয় দেখানো হাসি ফুটল ফন হামেলের ঠোঁটে। 'তোমাকে হয়তো কিছু বলব না আমি, মেজর রানা। কিন্তু নিঃসন্দেহে জেনো, মোনাকে শাস্তি দেব।'

বুড়োর তলপেটে কষে একটা লাথি মারার ইচ্ছে হলো। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে রাখল রানা। তারপর ধীর, ঠাণ্ডা সুরে বলল, 'কিছু একটা নিয়ে খেলছেন আপনি, ফন হামেল। কিন্তু আপনার ওপর চোখ যখন একবার পড়েছে আমার, সেই খেলার ইতি ঘটতে বেশি সময় লাগবে না।' এক সেকেন্ড বিরতি নিল ও, তারপর আবার বলল, 'যে উদ্দেশ্যে ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালানো হয়েছিল সেটা সফল হয়নি। জেনে রাখুন, নুমার জাহাজ ব্লু লিডার ঈজিয়ান ছেড়ে কোথাও যাচ্ছে না। ওদের রিসার্চ শেষ না হওয়া পর্যন্ত যেখানে আছে সেখানেই দেখতে পাবেন ওটাকে।'

মুখের চেহারা একটুও বদলাল না ফন হামেলের, কিন্তু হাত দুটো থরথর করে কাঁপতে শুরু করল। 'ধন্যবাদ, মেজর। এই রকম একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এত তাড়াতাড়ি আশা করিনি আমি।'

এতই রেগে গেছে, ভাবল রানা, হামলার সাথে নিজের জড়িত থাকার কথাও স্বীকার গেল। এখন আর কোন সন্দেহই থাকল না। ফন হামেলই যে ব্লু লিডারকে ঈজিয়ান থেকে সরাতে চায়, বোঝা গেল। কিন্তু কেন? উত্তরটা পাবার আশায় অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ল রানা। 'আপনি শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন, ফন হামেল। ব্লু লিডারের ডাইভাররা এরই মধ্যে সাগরতলার গুপ্তধনের খোঁজ পেয়ে গেছে। তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ওরা।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ফন হামেল। সাথে সাথে বুঝল রানা, ভুল করে ফেলেছে ও।

'আন্দাজে বাঘ মারতে চেষ্টা করছ, তাই না?' হাসি থামিয়ে বলল ফন হামেল, 'গুপ্তধনের ধারণাটা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলার পরামর্শ দেব আমি।' এগিয়ে গিয়ে বারান্দার শেষ প্রান্তে দাঁড়াল সে। দরজাটা খুলল।

দরজার ওপারে একটা করিডর আর মোমবাতির ম্লান আলো ছাড়া আর কিছু

দেখতে পেল না রানা।

'বেরিয়ে যাও, মেজর। তোমার ভালর জন্যেই মেজাজ এরচেয়ে বেশি খারাপ করতে চাই না আমি।' শোল্ডার হোলস্টার থেকে ল্যুগারটা বের করে রানার দিকে তাক করে ধরল ফন হামেল।

দরজার দিকে এগোল রানা। এক পা পিছিয়ে গিয়ে রানার নাগালের বাইরে সরে দাঁড়াল ফন হামেল। 'চমৎকার ডিনারের জন্যে মোনাকে আমার ধন্যবাদ দেবেন,' বলল রানা।

'ভুল হবে না,' বিদ্রূপের সুরে বলল ফন হামেল।

দরজার সামনে এসে দাঁড়াল রানা। তাকাল বিশাল কুকুরটার দিকে। প্রভুর পাশে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে রানার দিকে, মুখটা খোলা, বেরিয়ে আসা লম্বা জিভ থেকে লালা ঝরছে।

খিলান আকৃতির দরজা, কিন্তু অস্বাভাবিক নিচু। টানেলের মত দেখতে করিডরটা, ভেতর ঢোকার জন্যে মাথা নিচু করল রানা।

'মি. রানা?'

করিডরে পা দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'ইয়েস?' বারান্দায় একটা আবছা মূর্তির মত দেখাল ফন হামেলকে।

অদ্ভুত একটা পরিতৃপ্তির সুর পেল রানা ফন হামেলের গলার স্বরে, 'দুঃখ কি জানো? গোলাপী অ্যালব্যাট্রসের দ্বিতীয় ফ্লাইটটা দেখার কপাল করে আসোনি তুমি!'

কিছু করা বা বলার আগেই দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেল ভারী ওক কাঠের দরজা। বোল্ট পড়ার আওয়াজটা বিস্ফোরণের মত শোনাল, কেঁপে উঠল নির্জন করিডর। শব্দটা অসংখ্য প্রতিধ্বনি তুলে ফিরে আসতে লাগল রানার কানে।

নয়

ভয় নয়, রাগে জ্বালা করে উঠল রানার শরীর। মুঠো পাকানো হাত দিয়ে দরজার গায়ে ঘুসি মারার একটা ঝোঁক চাপল, কিন্তু লাভ নেই বুঝতে পেরে ক্ষান্ত হলো ও। ভারী ওক কাঠের তক্তা দিয়ে তৈরি পুরানো আমলের দরজা, লোহার চেয়েও শক্ত। ঘুরে দাঁড়িয়ে করিডরের দিকে মুখ করল ও। কেউ নেই। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল শরীরটা। বুড়ো জার্মানের ফাঁদে যে আটকা পড়েছে, সে-ব্যাপারে মনে কোন সন্দেহ নেই ওর। ফন হামেল ওকে ভিলা থেকে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে যেতে দিতে চায় না। ছুরির কথা মনে পড়তেই মোজার ভেতর থেকে বের করে হাতে নিল সেটা। দেয়ালের অনেক উঁচুতে, মরচে ধরা মেটাল হোল্ডারে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারি সারি মোমবাতি। লম্বা, ধারাল ছুরিটা হলুদ আলোয় ঝিক করে উঠল। কিন্তু খুব একটা ভরসা পেল না রানা। আত্মরক্ষার জন্যে সামান্য একটা ছুরি যথেষ্ট বলে মনে হলো না। তবু, নেই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল মনে করে এতেই সন্তুষ্ট থাকতে হবে ওকে। সিগারেট ছেড়ে দিলেও, পকেটে লাইটার রাখার অভ্যেসটা ত্যাগ

করেনি ও, প্রয়োজনে সেটাও একটা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারে।

পা বাড়াতে যাবে রানা, হঠাৎ হিম শীতল একটা বাতাস ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল ওকে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সব ক'টা মোমবাতি নিভে গেল। সাথে সাথে গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা পড়ে গেল করিডর, চোখের সামনে তুলে নিজের হাত জোড়াও দেখতে পেল না ও। অক্সিজেনের কোন অভাব নেই. কিন্তু আলোর অভাবে দম আটকে এল ওর। কোন শব্দ না করে গভীর মনোযোগের সাথে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করল ও।

প্রায় মিনিট খানেক অপেক্ষা করল রানা। কোথাও থেকে কোন শব্দ এল না। হঠাৎ অনুভব করল, ভয় ভয় করছে ওর। মনে পড়ল, কোথায় যেন পড়েছিল, মানুষের মন সবচেয়ে বেশি ভয় করে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারকে। হিংস্র জানোয়ার বা সাপ. আগুন বা পানির তুলনায় শুধু অন্ধকারকে বিপদ বলা চলে না, কিন্তু তবু এই অন্ধকারই নাকি মানুষের মনে সবচেয়ে বেশি আতঙ্কের সৃষ্টি করে। ধীরে ধীরে ঠিক তাই ঘটতেও শুরু করল। কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলেই দুনিয়ার ভয়ঙ্কর সব বিপদগুলো ওর জন্যে সামনে অপেক্ষা করছে বলে মনে হতে লাগল ওর। অজানা ভয়ে কেঁপে উঠল বুক। মুশকিল হলো, ব্রেন যদি কিছু দেখতে না পায়, জায়গাটা খালি পড়ে থাকে না, সে নিজেই কিছু একটা তৈরি করে বসিয়ে নেয় সেখানে। যার যার দুঃস্বপ্ন থেকে উপকরণ নিয়ে তৈরি হয় এই কিছু-একটা। কিন্তু কি থেকে কি হয় জানা আছে বলে, সাবধান হতে পারল রানা। ভয়ের প্রথম ঢেউটা পেরিয়ে যাবার পরপরই নিজেকে সামলে নিতে পারল ও। যুক্তি দিয়ে বোঝাল নিজেকে, শান্ত করে তুলল মনটাকে। কোন শব্দ না করে আপন মনে হাসল ও।

লাইটার দিয়ে মোমগুলো জ্বালবে কিনা ভাবল রানা। সাথে সাথে বাতিল করে দিল ধারণাটা। করিডরের আরও সামনে কেউ বা কিছু যদি ওত্ পেতে বসে থাকে অন্ধকারে তারও অসুবিধে হবার কথা। ঝুঁকে পায়ের জুতো খুলে ফেলল ও। ছুঁয়ে দেখল, বরফের মত ঠাণ্ডা দেয়াল। দেয়ালে একটা হাত রেখে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে এগোল সামনের দিকে। এক, দুই করে বেশ কয়েকটা দরজার গায়ে হাঁত পড়ল। লোহার পাত দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে কবাট। একটা দরজা পরীক্ষা করছিল, হঠাৎ হাত দুটো স্থির হয়ে গেল ওর। সমস্ত মনোযোগ এক করে সজাগ করে তুলল কান দুটো।

সামনে কোথাও থেকে একটা আওয়াজ ভেসে এল। অস্পষ্ট, কিসের তা বোঝা গেল না। কিন্তু হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কেউ কি গুঙিয়ে উঠল, বা হাই তুলল? আবার হলো আওয়াজটা। ভোঁতা গোঙানির মত লাগল কানে। কিন্তু শব্দটা শেষ হলো একটু ভারী হয়ে উঠে, গলার গভীর থেকে ঘড় ঘড় চাপা আওয়াজের মত শোনাল। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে।

সামনে যে বিপদ আছে তাতে এখন আর কোন সন্দেহ নেই। মূর্তিমান বিপদ, শারীরিক একটা অস্তিত্ব আছে, আওয়াজ করতে পারে। নিশ্চয়ই বুদ্ধিও রাখে। মানুষ তো? নাকি অন্য কিছু? সাবধান হয়ে গেল রানা। ধীরে ধীরে করিডরের মেঝেতে শুয়ে পড়ল ও। শব্দ না করে হামাগুড়ি দিয়ে এগোল। কান দুটো সজাগ, বাতাসের নড়াচড়াও শুনতে পাবে। আঙুল দিয়ে এগোবার পথটা ছুঁয়ে দেখে নিল প্রথমে,

তারপর ক্রল করে এগোল। মেঝেটা সমতল আর শক্ত। এখানে সেখানে ভিজে স্যাঁতসেঁতে একটা ভাব। কোথাও আবার চটচটে লাগল, যেন এঁটেল মাটি ছড়িয়ে আছে। এক সময় মনে হলো, ঘণ্টা কয়েক ধরে এগোচ্ছে ও, অন্তত মাইল দুয়েক পেরিয়ে এসেছে। কিন্তু বাস্তব বুদ্ধি জানিয়ে দিল, খুব বেশি হলে আশি ফুটের মত এগিয়েছে সে। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের একটা দুর্গন্ধ আসছে নাকে—বাসী, ছাতা-পড়া, ভাপসা। এর খানিক পরই হঠাৎ করে মেঝে আর দেয়াল মসৃণতা হারিয়ে ফেলল। এদিকের মেঝে উঁচু-নিচু, কর্কশ। দেয়ালের গা থেকে প্লাস্টার খসে পড়েছে। তারপর হাতের স্পর্শ দিয়ে অনুভব করল ও, দেয়ালটা শেষ হয়ে গেছে, বাঁক নিয়ে শুরু হয়েছে আরেক দিকে। মুখে বাতাসের ক্ষীণ একটু ছোঁয়া অনুভব করে বুঝল, একটা মোড়ে এসে পৌঁচেছে ও। শরীরটাকে স্থির করে কান পাতল।

আবার সেই শব্দ। ধীর লয়ে, থেমে থেমে। ভয়ঙ্কর। এবারের আওয়াজটা ঠিক আগের মত নয়। লম্বা নখওয়ালা পশু শক্ত মেঝে আঁচড়ালে এই ধরনের শব্দ হতে পারে। নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। ঘামতে শুরু করেছে ও। একবার মনে হলো, আওয়াজটা এগিয়ে আসছে। স্যাঁতসেঁতে মেঝেতে শরীরটাকে লম্বা করে দিয়ে ছুরির ডগাটা বাতাসে ভেসে আসা শব্দের দিকে তাক করল ও।

মেঝে আঁচড়াবার আওয়াজ ক্রমশ বাড়তেই থাকল। তারপর হঠাৎ করে থেমে গেল সেটা। রহস্যময় অন্ধকারে অটুট নিস্তব্ধতা অসহ্য লাগতে শুরু করল আবার।

ভাল ভাবে শুনতে পাবার জন্যে একটু একটু করে নিঃশ্বাস ছাড়ল রানা। কিন্তু নিজের হার্টবিট ছাড়া আর কিছু শুনতে পেল না। কানের পিছন থেকে সড় সড় করে গড়িয়ে ঘামের ধারা নেমে এল গলায়। আর কোন আওয়াজ নেই, কিছু দেখতেও পেল না, কিন্তু অনুভূতি দিয়ে জানে, কিছু একটা ওত পেতে আছে সামনে, খুব বেশি হলে ফুট দশেক দূরে। ভাপসা দুর্গন্ধটা মগজে গিয়ে আঘাত করছে। প্রায় অসুস্থ করে তুলল ওকে। সেই সাথে ক্ষীণ আরেকটা গন্ধ পেল ও। কোন পশুর গায়ের গন্ধ! কিন্তু কি ধরনের পশু?

বিদ্যুৎ চমকের মত একটা বুদ্ধি খেলে গেল রানার মাথায়। একটা ঝুঁকি নিয়ে হলেও শত্রুর পরিচয় জানতে হবে ওকে। আক্রান্ত হবার জন্যে তৈরি হলো ও। ধীরে ধীরে ট্রাউজারের পকেট থেকে বেরিয়ে এল জিপো লাইটারটা। ক্লিক করে শব্দের সাথে জ্বলে উঠল। এক সেকেন্ড অপেক্ষা করল রানা, উজ্জ্বলভাবে জ্বলে উঠতে দিল সলতেটাকে। তারপর উঁচু করে ছুঁড়ে দিল সামনের দিকে। খুদে আগুনের শিখাটা অন্ধকার চিরে দিয়ে উড়ে গেল, আলোকিত করে তুলল এক জোড়া জ্বলজ্বলে চোখ। চোখ জোড়ার পিছনে প্রকাণ্ড একটা ছায়া দেখতে পেল ও। এদিক ওদিক দুলছে। ঠকাস করে মেঝেতে পড়েই নিভে গেল লাইটার। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল, পাথুরে টানেলে প্রতিধ্বনিত হতে থাকল রোমহর্ষক আওয়াজটা।

বিদ্যুৎ খেলে গেল রানার শরীরে। জড়ো করা রশির আকৃতিতে গুটিয়ে নিল শরীরটা, চিৎ হয়ে শুয়ে ঘামে ভেজা দু'হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে রাখল ছুরির হাতল। শত্রুকে দেখতে পেল না ও, কিন্তু চিনতে পেরেছে।

লাইটারের সংক্ষিপ্ত আলোয় রানার পজিশন জেনে নিয়েছে জানোয়ারটা। তবু

এক সেকেন্ড ইতস্তত করল সে। তারপর লাফ দিল।

আক্রমণের আগে শিকারের গন্ধ নেয়ার অভ্যেসটাই কাল হলো তার। প্রস্তুতির জন্যে পুরো এক সেকেন্ড সময় পেয়ে গেল রানা। লাইটারের আলোয় যেখানে রানাকে দেখল সাদা কুকুরটা, লাফ দেবার সময় সেখানে ছিল না রানা। রানার ওপর দিয়ে উড়ে গেল সে। চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা, রানা শুধু অনুভব করল, কোমল পশমের ভেতরটা চিরে দিল তার হাতের ধারাল ছুরি। উষ্ণ, ভেজা, ভারী কোন তরল পদার্থের ঝর ঝর পতন অনুভব করল মুখে। আহত পশুর বিকট আর্তনাদ বোমার মত বিস্ফোরিত হলো রানার কানে। পরমুহূর্তে দড়াম করে দেয়ালে ধাক্কা খেল প্রকাণ্ড শেফার্ড, সেখান থেকে ধপাস করে পড়ল মেঝেতে। মৃত্যু যন্ত্রণায় অস্থির পশু এরপর তড়াক তড়াক লাফাতে শুরু করল। কিছুই দেখতে পেল না রানা, কিন্তু আওয়াজ শুনে বুঝল, দেয়াল থেকে মেঝেতে, মেঝে থেকে দেয়ালে অনবরত ধাক্কা খাচ্ছে কুকুরটা। ক্রমশ দুর্বল হয়ে এল তার চাপা গর্জন। কিন্তু মারা যেতে অনেকক্ষণ সময় নিল সে, এবং যতক্ষণ বেঁচে থাকল অন্ধকার টানেলের গায়ে বারবার বাড়ি খেল। তারপর হঠাৎ করেই অটুট নিস্তব্ধতা নেমে এল টানেলের ভেতর।

প্রথমে রানার মনে হয়েছিল কুকুরটা তাকে ছুঁতে পারেনি। কিন্তু হঠাৎ বুকের ওপর হু হু জ্বালা অনুভব করল ও। কুকুরটা মারা যাবার পরও অনেকক্ষণ নড়ল না, যতক্ষণ না টেনশন মুক্ত হয়ে ঢিল পড়ল পেশীতে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও, হেলান দিল দেয়ালে। সাথে সাথে ভিজে গেল শার্ট, চট চটে একটা স্পর্শ অনুভব করল চামড়ায়। রক্ত! শিউরে উঠল ও।

মেঝে হাতড়ে লাইটারটা খুঁজে পেতে বেশি সময় লাগল না। আলো জ্বেলে দেখল, বুকের কাছে ছিঁড়ে গেছে শার্ট, বাম বুকের ওপর চারটে আঁচড়ের লাল দাগ স্পষ্টভাবে ফুটে আছে। শেফার্ডের নখগুলো ওর বুকের শুধু চামড়া নয়, বেশ খানিকটা মাংসও তুলে নিয়ে গেছে। রক্ত পড়া বন্ধ হয়নি এখনও। এগিয়ে গিয়ে কুকুরটার সামনে দাঁড়াল ও।

পাঁজরের পিছনে, পেটের একটা অংশ চিরে গেছে। নাড়িভুঁড়ি সব বেরিয়ে এসে জড়ো হয়ে আছে শরীরের পাশে। রক্তের ধারাগুলো গড়িয়ে গিয়ে এক জায়গায় জমা হচ্ছে। কুকুরটাকে দেখতে দেখতে রাগে সারা শরীর রী রী করে উঠল রানার। মনে হলো, এই মুহূর্তে ফন হামেলকে হাতের কাছে পেলে নির্দ্বিধায় খুন করবে ও।

ভাবাবেগ, উত্তেজনা মানুষের বুদ্ধিকে ঘোলা করে তোলে, নিজেকে স্মরণ করিয়ে দিল রানা। এই টানেল থেকে বেরুতে হলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তার।

পরমুহূর্তে ভাবল, বেরুতে হবে বটে, কিন্তু এখান থেকে বেরুবার আদৌ কোন পথ আছে কি? যদিও ব্যর্থতার সম্ভাবনা একবারও উঁকি দিল না ওর মনে। পথ যদি থাকে তো ভাল, ভাবল ও, তা না হলে পথ একটা তৈরি করে নেবে সে। আত্মবিশ্বাস ফিরে পাবার সাথে সাথে ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতিটা যাচাই করল ও। ব্লিডার নিজের জায়গা ছেড়ে নড়ছে না জানার পর ফন হামেল এখন অ্যালব্যাট্রস পাঠিয়ে আবার হামলা চালাবে। ধরে নেয়া যায়, এবার প্রথমবারের মত বিকেলে হামলা চালাবার ঝুঁকি নেবে না সে, অ্যালব্যাট্রসকে পাঠাবে ভোরের দিকে।

তাছাড়া বিকেলের দিকে হামলা চালাতে হলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে তাকে। ব্লু লিডার নড়ছে না জানার পর অতক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবে না সে।

কমান্ডার হ্যানিবলকে সাবধান করে দেয়া দরকার!

হাতঘড়ির লিউমিনাস ডায়ালের দিকে তাকাল রানা। ন'টা পঞ্চান্ন। ভোরের আলো ফুটবে চারটে চল্লিশে, পাঁচ মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে। তার মানে ছ'ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় পাওয়া যাচ্ছে। এর মধ্যে কমান্ডারকে সাবধান করে দিতে হবে ওর। এরই মধ্যে হামলা ঠেকাবার জন্যে প্রস্তুতি নিতে হবে কমান্ডারকে।

ছুরিটা বেল্টে গুঁজে রাখল রানা। ফুয়েল শেষ করা উচিত হচ্ছে না মনে করে নিভিয়ে দিল লাইটার। চুপচাপ দাঁড়িয়ে বাতাসের স্পর্শ নিল ও। বাতাসটা যেদিক থেকে আসছে বলে মনে হলো সেদিকে পা বাড়াল। হাঁটার মধ্যে কোনরকম ইতস্তত ভাব থাকল না। স্পর্শ দিয়ে অনুভব করল, টানেলটা চওড়ার দিকে ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে। এক সময় মাত্র তিন ফুটে দাঁড়াল। তবে সিলিঙটা মাথার অনেক ওপরেই থাকল।

একটা হাত সামনে বাড়িয়ে রেখেই এগোচ্ছিল ও, হঠাৎ নিরেট পাথরের গায়ে ঠেকল সেটা। মনে মনে আঁতকে উঠল ও। প্যাসেজ শেষ হয়ে গেছে এখানে। লাইটার জ্বেলে দেখল, পাথরের মাঝখানে সরু একটা ফাটল। ঠাণ্ডা বাতাসটা ওই ফাটল দিয়েই ভেতরে ঢুকছে। ক্ষীণ একটা গুঞ্জন শুনল রানা। মনোযোগ দিয়ে শোনার পর বুঝল, ইলেকট্রিক মটরের আওয়াজ, দেয়ালের ওপারে পাহাড়ের তলপেটে কোথাও লুকানো আছে।

আরেকটা প্যাসেজ ধরতে হবে রানাকে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে এল মোড়ে। একটু অসতর্ক হলেই হোঁচট খাবার সম্ভাবনা, কারণ এদিকের মেঝেটা নুড়ি পাথর দিয়ে তৈরি। মাটিতে গায়ে গা লাগিয়ে বসানো হয়েছে পাথর, মাটির ওপর মাথা বের করে আছে সবগুলো। এই কি প্রথম একজনকে টানেলের ভেতর আটক করেছে ফন হামেল? ভাবল ও। মনে হয় না। কুকুরটাকে দিয়ে নিশ্চয়ই আরও অনেককে খুন করিয়েছে শয়তান বুড়ো। শীত শীত করল রানার, অথচ সারা শরীর ঘামছে। বুকের ক্ষতটা জ্বালা করছে, তবে এখনও অসহ্য লাগছে না। অনুভব করল, ঘামের সাথে মিশে প্যান্টের দিকে নামছে রক্ত। তেমন কোন অমানুষিক খাটা-খাটনি যায়নি ওর ওপর দিয়ে, অথচ ভীষণ ক্লান্ত বোধ করল ও। মনে হলো, এখানে একটু শুয়ে জিরিয়ে নিলে হত। কিন্তু জানে, একবার বসে বা শুয়ে পড়লে ঘুম এসে যাবে, হয়তো নিজের অজান্তে ঘুমিয়েও পড়বে। ঝুঁকিটা নিতে রাজি নয় ও। যতক্ষণ পারে এই গোলকধাঁধায় হাঁটতে হবে তাকে, খুঁজে বের করতে হবে টানেল থেকে বেরিয়ে যাবার রাস্তা। বিশ্রাম নেবার কথা বারবার ফিরে এল মনে, প্রতিবারই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল ও।

খানিক পরপরই নিরেট পাথরের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। লাইটার জ্বেলে দেখল, আবার শেষ হয়ে গেছে প্যাসেজ। ফিরে আসতে হলো মোড়ে, নতুন প্যাসেজ ধরে এগোল আবার। কোথাও মানুষের তৈরি দেয়াল পথ বন্ধ করে রেখেছে, কোথাও পাথর আর মাটির ধস নেমে রুদ্ধ হয়ে গেছে। কোত্থেকে কোথায়

যাচ্ছে, কোন ধারণাই পেল না রানা। প্রতিটি প্যাসেজ থেকে শাখা বেরিয়েছে। কতবার কোনদিকে বাঁক নিল ও, বলতে পারবে না। লাইটারের ফুয়েল শেষ হয়ে এসেছে। তাই সামনে দেয়ালের স্পর্শ পেলেই সেটা জ্বালল না। পাথরের গায়ে ঘষা খেয়ে ইতিমধ্যে আঙুলের চামড়া ছড়ে গেছে, জ্বালা করছে। এইভাবে একঘণ্টা কাটল। তারপর আরও এক ঘণ্টা। থামল না রানা, ক্লান্ত শরীরটাকে অন্ধকার টানেলের ভেতর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল।

তারপর হাতে নয়, পায়ে ঠেকল শক্ত পাথর। আছাড় খেল ও। পরমুহূর্তে বুঝল, শক্ত সিঁড়ির নিচের ধাপে পা লেগেছে। চার নম্বর ধাপের কিনারার সাথে ঠুকে গেল নাক, তীব্র ব্যথায় ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল মাথা। রক্তের একটা ধারা ঠোঁটের ওপর দিয়ে ঝর ঝর করে নামতে শুরু করল বুকে। সিঁড়ির ধাপের ওপর পড়ে গেল ও, অসাড় লাগল সারা শরীর। মাথাটা পড়ে থাকল একটা ধাপের ওপর, সেটার পিছনের ধাপে টপ টপ করে রক্ত পড়ছে, শব্দটা পরিষ্কার শুনতে পেল ও। অসুস্থ, আচ্ছন্ন বোধ করল, তারপর আর কিছু মনে নেই ওর।

অনেকক্ষণ পর মাথা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল রানা। মনে পড়ে গেছে সব। উঠে দাঁড়াতে যাবে, ঘুরে উঠল মাথা। সিঁড়ির নিচের ধাপগুলো রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে। ক্রল করে ওপরে উঠতে শুরু করল ও। এক, দুই করে ধাপ পেরিয়ে উঠে এল সিঁড়ির মাথায়।

সামনে লোহার বার দিয়ে তৈরি গ্রিল। পুরানো, মরচে ধরা রড, কিন্তু মোটা আর ভারী। দেখে মনে হলো, হাতীকেও ঠেকিয়ে রাখতে পারবে। তাজা বাতাস পেয়ে আগের চেয়ে সুস্থ বোধ করল ও। ভাপসা গন্ধটা নেই এখন। রডের মাঝখানে চৌকো ফাঁকগুলো দিয়ে বাইরে তাকাল। মিটি মিটি তারা জ্বলছে কালো আকাশে। নিজেকে মুক্ত করে বেরিয়ে পড়ার একটা প্রচণ্ড ব্যাকুলতা অনুভব করল ও। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল, এবার মাথাটা ঘুরে উঠল না। লোহার গ্রিল ধরে ঝাঁকি দিল খানিকক্ষণ। প্রথমে আস্তে আস্তে, তারপর জোরে। খুলল না লোহার গেট। লাইটার জ্বেলে মস্ত তালাটা পরীক্ষা করল ও। খুব বেশি দিন হয়নি ওয়েল্ডিঙের সাহায্যে লোহার বারের সাথে জোড়া লাগানো হয়েছে তালা।

একটা বারের সাথে আরেকটা বারের দূরত্ব মাপল রানা, সবচেয়ে বড় ফাঁকটা খুঁজছে ও। বাঁ দিক থেকে তিন নম্বর ফাঁকটা আর সবগুলোর চেয়ে প্রশস্ত। সাড়ে আট ইঞ্চি। ধীরে ধীরে পরনের সব কাপড় খুলে ফেলল ও, সবগুলো গ্রিলের ফাঁক দিয়ে বাইরে রাখল। এরপর ঘামে ভেজা শরীরে রক্ত মাখল। শ্বাস ছেড়ে যতটা সম্ভব ছোট করে নিল বুক। তারপর ফাঁকের ভেতর মাথা গলিয়ে দিয়ে একশো ষাট পাউন্ড ওজনের শরীরটাকে ধীরে ধীরে বের করে নিয়ে আসার চেষ্টা করল। বারের খরখরে মরচে পিচ্ছিল শরীরে লেপ্টে গেল। অক্সিজেনের জন্যে ছটফট করে উঠল রানা। অর্ধেকটা শরীর বের করে আনতেই দম ফুরিয়ে গেল ওর। বাকি অর্ধেকটা আটকে গেছে, কোনমতে বেরিয়ে আসতে চাইছে না। নিতম্ব তার তলপেটের দু'পাশের হাড় বেধে গেছে লোহার বারে। মাঝখানে আটকা পড়ে হাঁসফাঁস করতে থাকল ও। তারপর শরীরের শেষ শক্তিটুকু দিয়ে ঝাঁকি দিল একটা। কাতর একটা

আওয়াজ বেরিয়ে এল গলার ভেতর থেকে, হাড়ে ব্যথা পেয়েছে। কিন্তু সেই সাথে সারা শরীরে শান্তির ঠাণ্ডা পরশও অনুভব করল। টানেল থেকে বেরিয়ে এসেছে ও।

ত্রিশ সেকেন্ড বিশ্রাম নিয়ে উঠে দাঁড়াল রানা। গেট পেরিয়েছে, কিন্তু তারমানে কি ফন হামেলের ফাঁদ থেকে বেরুতে পেরেছে ও? এখনও চারদিক অন্ধকার, তবে গভীর গাঢ় নয়। ইতিমধ্যে সেটা সয়েও এসেছে চোখে। চারদিকে তাকাল ও।

গ্রিল দেয়া গেটের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল এক অ্যাম্ফিথিয়েটারের স্টেজে ঢোকার প্রবেশ পথ। চাঁদ আর তারার আলোয় সব কিছু পরিষ্কার দেখা না গেলেও রঙ্গমঞ্চের বিশালত্ব টের পাওয়া গেল। কালো আকাশের গায়ে আরও ঘন কালো ছায়ার মত একটা পাহাড় চূড়া, তার মাথায় আধখানা চাঁদ। অ্যাম্ফিথিয়েটারটা দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের গোড়ায়। ধাঁচ দেখে মনে হলো, গ্রীসিয়ান আর্কিটেকচার, কিন্তু প্রকাণ্ড আকার রোমান হাতের ছোঁয়া লেগেছে বলে ইঙ্গিত দেয়। গোলাকার স্টেজের কিনারা আর থিয়েটারের ওপরের কার্নিসের মাঝখানে কম করেও চল্লিশ সারি আসনের ব্যবধান। গোটা অ্যাম্ফিথিয়েটার ফাঁকা, খাঁ খাঁ করছে।

কাপড়চোপড় পরে নিল রানা, শুধু শার্টটা ছিঁড়ে বুকে একটা ব্যান্ডেজ বেঁধে নিল। টানেল থেকে বেরিয়ে আসতে পারায় সারা শরীরে নতুন শক্তির জোয়ার অনুভব করল ও।

মুখ তুলে তাকাল রানা। তারাগুলো দেখে দিক-নির্দেশ নেবে। ধ্রুবতারা মিটমিট করে তাকাল ওর দিকে, কোন্‌টা উত্তর দিক জানিয়ে দিল মোটামুটি। আকাশের তিনশো ষাট ডিগ্রী বৃত্তের ওপর চোখ বুলাল রানা। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু অমিল আছে, ভাবল ও। তারপর ধরা পড়ল ব্যাপারটা। টরাস আর সপ্তকন্যা থাকার কথা মাথার ওপর। অথচ ওরা রয়েছে অনেক পশ্চিমে!

ঝট্ করে চোখের সামনে হাতঘড়ি তুলল রানা। 'সর্বনাশ!' আঁতকে উঠল ও। তিনটে বেজে বত্রিশ মিনিট। ভোর হতে আর মাত্র একঘণ্টা আঠারো মিনিট বাকি! যেভাবেই হোক পাঁচটা ঘণ্টা পেরিয়ে গেছে। তারপর মনে পড়ল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিল ও।

অস্থির হয়ে উঠল রানা। সময় নেই, সময় নেই! প্রবেশ পথ দিয়ে অ্যাম্ফিথিয়েটারে ঢুকে পড়ল ও। হন হন করে এগোল সারি সারি আসনের পাশ দিয়ে। খুব বেশি খুঁজতে হলো না, সরু একটা সিঁড়ি পাওয়া গেল। ধাপগুলো নেমে গেছে পাহাড়ের গোড়ার দিকে।

সিঁড়ির নিচে নেমে এসে হন-হন করে এগোল রানা। খানিক পর ছুটতে শুরু করল। সূর্য ওর প্রতিদ্বন্দ্বী, হারাতেই হবে তাকে।

দশ

সিকি মাইল লম্বা ঢাল পেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল রানা। এটাকে ঠিক রাস্তা বলা যায় না—মাটির ওপর টায়ারের জোড়া দাগ, বুঝে নিতে হয় এটাই রাস্তা; চুলের কাঁটার

মত অনেকগুলো বাঁক নিয়ে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে গেছে। দরদর করে ঘামছে রানা, হাপরের মত হাঁপাচ্ছে। ঠিক দৌড়াচ্ছে না, আবার হাঁটছেও না, দুটোর মাঝখানের একটা ভঙ্গিতে এগিয়ে চলেছে দ্রুত। মারাত্মকভাবে আহত হয়নি ও, কিন্তু প্রচুর রক্তক্ষরণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছে। এখন যদি কোন ডাক্তারের সামনে পড়ে ও, জোর-জার করে হাসপাতালে পাঠাতে চাইবে।

মাঝে মধ্যেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ব্লু লিডারের ছবি। দেখল, অসহায় বিজ্ঞানী আর ক্রুরা দিশেহারা হয়ে পড়েছে, প্রাণ বাঁচাবার ব্যর্থ চেষ্টায় ছুটোছুটি করছে সবাই। ওদিকে মাথার ওপর বারবার ফিরে আসছে সেই অ্যালব্যাট্রস, প্রতিবার ঝাঁক ঝাঁক বুলেট ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করছে ওশেনোগ্রাফির রিসার্চ শিপটাকে। এবার গ্রেনেড ফেলাও বিচিত্র নয়। ব্র্যাডি ফিল্ড থেকে ইন্টারসেপ্টর জেট আকাশে ওঠার আগেই সর্বনাশ যা হবার হয়ে যাবে, ভাবল রানা। অবশ্য নর্থ আফ্রিকা থেকে রিপ্লেসমেন্ট এয়ারক্রাফট যদি ভোর হবার আগে পৌঁছায় তবেই সেগুলোর আকাশে ওঠার সম্ভাবনা, নইলে···

হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। সামনের ছায়ায় কি যেন নড়ল। টায়ারের দাগ ছেড়ে সরু পায়ে চলা একটা পথ ধরল ও। কয়েক সারি নারকেল গাছকে পাশ কাটিয়ে খানিক দূর এগোতেই বুনো ঝোপের আড়াল থেকে দেখতে পেল, বড় সড় পাথরের সাথে চারপেয়ে একটা জন্তু বাঁধা রয়েছে। ভাল করে তাকাতে বুঝল, ওটা ঘোড়াও নয়, গরুও নয়, একটা গাধা। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এগোল রানা। ওর দিকে ফিরে কান খাড়া করল গাধা। চারদিকে তাকাল রানা। কেউ নেই আশপাশে।

গাধার পাশে দাঁড়িয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিল রানা। 'তুমি আমার সাত রাজার ধন,' বিড় বিড় করে বলল ও। 'কমান্ডার হ্যানিবল নিশ্চয়ই বড় ধরনের কোন পুণ্যের কাজ করেছিল, তাই পেয়ে গেলাম তোমাকে!' রশি খুলে গাধার নাকের ওপর দিয়ে জড়িয়ে নিল সেটা, তারপর উঠে বসল পিঠে। 'চলো, ভাই!' আদর করে বলল ও। 'তাড়াতাড়ি!'

যেন কত যুগের পরিচয় রানার সাথে, বলতেই লক্ষ্মী ছেলের মত এগোতে শুরু করল গাধা। 'তোমার নাম রাখলাম বিদ্যুৎ,' গাধার পিঠে চাপড় দিয়ে বলল রানা। 'নামটা যে ঠিক হয়েছে এবার সেটা প্রমাণ করো দেখি!' চাপড় খেয়ে ছুটতে শুরু করল রানার বাহন।

চাঁদের আলোয় পথ দেখে লিমিনাসের কাছাকাছি পৌঁছল রানা। ঘাস ঢাকা প্রান্তরগুলোকে মাথা উঁচু বনভূমি ঘিরে রেখেছে। এই রকম একটা জঙ্গলঘেরা সমতল জায়গার ওপর গ্রামটা। আর সব উপকূলবর্তী গ্রীক গ্রামের মতই প্রাচীন শহরের ধ্বংসাবশেষের পাশে গড়ে উঠেছে মনোরম টালির ছাদওয়ালা বাড়ি-ঘর। গ্রামের এক দিকে সাগর, খুদে হারবারে নিচু ফিশিং বোট নোঙর করা রয়েছে। তেল, মাছ আর লোনা বাতাসের গন্ধ ঢুকল নাকে। তীর বরাবর লম্বা কাঠের পিলারে ঝুলছে নেট। পিছনেই গ্রামের মেইন রোড। রাস্তার দু'পাশে বাড়ি-ঘর। দরজা বা জানালা, একটাও খোলা দেখল না রানা। ভোরের আবছা আলোয় প্রাণের কোন স্পন্দন চোখে পড়ল না ওর। অপ্রশস্ত একটা মোড়ে এসে গাধার পিঠ

থেকে নামল ও, একটা মেইল বক্সের সাথে বেঁধে রাখল রশিটা। প্যান্টের পকেট থেকে ওয়ালেট বের করল। দশ মার্কিন ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল গাধার নাক আর রশির মাঝখানে। 'ধন্যবাদ, বিদ্যুৎ, খুচরো পয়সা ফেরত দিতে হবে না, ওগুলো তোমাকে বখশীশ দিলাম।' গাধার পিঠ চাপড়ে দিয়ে সৈকতের দিকে এগোল রানা।

রাস্তার এদিক ওদিক তাকাল ও, কিন্তু টেলিফোনের লাইন দেখল না। রাস্তার কোথাও কোন রকম গাড়িও পার্ক করা নেই। থাকার মধ্যে একটা বাড়ির গেটের পাশে হেলান দিয়ে আছে একটা বাই-সাইকেল। কিন্তু গায়ে শক্তি কম, এবং ব্র্যাডি ফিল্ড এখান থেকে সাত মাইলের ধাক্কা! সবচেয়ে ভাল হত গাড়ি বা টেলিফোন পেলে।

ওমেগা দেখল রানা। তিনটে উনষাট। ভোর হতে একচল্লিশ মিনিট বাকি। এই সময়ের মধ্যে কমান্ডার হ্যানিবলকে সাবধান করে দিতে হলে কোন না কোন বাহনের সাহায্য নিতে হবে ওকে। গাধা সময় মত পৌঁছতে পারবে না। সাইকেল চালাবার মত শক্তি নেই ওর। সৈকতের ওপর দিয়ে সাগরের দিকে তাকাল ও। বাই রোড ব্র্যাডি ফিল্ড সাত মাইল, কিন্তু সাগর পথে মাত্র চার মাইল। কাজেই একটা বোট চুরি না করার কি কারণ থাকতে পারে? নিজেকে জিজ্ঞেস করল রানা। উত্তরও পেয়ে গেল সাথে সাথে, কোন কারণই নেই। যে একটা গাধা কিডন্যাপ করতে পারে তার জলদস্যু সেজে একটা বোটও হাইজ্যাক করতে পারা উচিত।

ছোট সাইজের নিচু বোট, এক সিলিন্ডারের গ্যাসোলিন ইঞ্জিন। পছন্দ হলো রানার। অন্ধকারে হাতড়ে থ্রটল লিঙকেজ, আর ইগনিশন সুইচ পেয়ে গেল। ফ্লাইহুইলটা বেশ বড়সড়। ঘোরাতে বেশ শক্তি লাগে।

প্রথমবারের চেষ্টাতেই স্টার্ট নিল ইঞ্জিন। ছুরি দিয়ে লাইন কাটল রানা। রিভার্স গিয়্যার দিয়ে পিছিয়ে নিয়ে এল বোট, একশো আশি ডিগ্রী বৃত্ত রচনা করে পুরানো রোমান ব্রেকওয়াটার পেরিয়ে এল, তারপর ছুটল খোলা সাগরের দিকে।

ফুল থ্রটল দিল রানা, ছোট ছোট ঢেউ কেটে, নাক উঁচু করে, প্রায় সাত নট গতিতে এগোল বোট। স্টার্ন সীটে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল রানা। দুই হাত দিয়ে শক্ত করে ধরে থাকল টিলার। চামড়া ছড়ে যাওয়া তালু আর আঙুলের ডগা থেকে রক্ত ঝরছে, ব্যথা করছে, কিন্তু গ্রাহ্য করল না ও।

আধঘণ্টা কাটল। ধীরে ধীরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল পুব আকাশ। সাধ্যের সবটুকু ব্যয় করে এগোল বোট, কিন্তু রানাকে সন্তুষ্ট করতে পারল না। প্রচণ্ড ক্লান্তিতে বারবার অসুস্থ বোধ করল ও, ঝিমুনি ভাব এসে গ্রাস করতে চাইল ওকে। শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরে টিলার ধরে বসে থাকল ও। মাঝখানে একবার নিজের অজান্তে চোখ দুটো বুজে গিয়েছিল, কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠে চোখ মেলল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখের পাতা রগড়াল, জ্বালা করছে চোখ। এর একটু পরই দেখতে পেল রানা—নিচু, মেটে রঙের একটা আকৃতি। বড় জোর মাইল খানেক দূরে। বড়, সাদা, থারটি-টু পয়েন্ট লাইট দুটো চিনতে পারল ও। বো আর স্টার্ন। এর অর্থ, জাহাজ নোঙর ফেলা অবস্থায় আছে। দিগন্তরেখার নিচ থেকে সারা আকাশে ছড়িয়ে পড়ছে রোদ। উজ্জ্বল পুব আকাশের গায়ে প্রথমে দেখা গেল ব্লু

লিডারের সুপারস্ট্রাকচার, তারপর ক্রেন আর রাডার মাস্ট, তারপর ডেকে ছড়ানো সায়েন্টিফিক ইকুইপমেন্ট।

পানির কিনারা আর দিগন্তরেখা যেখানে এক হয়ে মিলেছে সেদিকে তাকিয়ে ছিল রানা, হঠাৎ দেখল লাফ দিয়ে আকাশে উঠল মস্ত একটা লাল রঙের থালা। সূর্যের আলো মেখে ঝলমল করে উঠল সাগর। বোটের গতি কমাল রানা। ধীরে ধীরে ব্লু লিডারের গায়ে ভিড়ল সেটা।

'হ্যালো!' চিৎকার করতে গিয়ে আবিষ্কার করল রানা, গলায় জোর নেই।

'আরে! মেজর রানা, আপনি?' জাহাজের রেলিঙ থেকে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ল ড. খালেদ।

তিন মিনিট পর কমান্ডার হ্যানিবলের কেবিনে পৌঁছল রানা। সদ্য ঘুম থেকে জাগা কমান্ডারের পরনে শর্টস ছাড়া কিছু নেই, চোখ দুটো বিস্ফারিত। 'মাই গড! একি অবস্থা হয়েছে তোমার, রানা?'

রক্তাক্ত একটা হাত কমান্ডারের কাঁধে তুলে দিয়ে তাল সামলাল রানা। জোর করে একটু হাসল। জানতে চাইল, 'জাহাজে মিটিয়রলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে?'

প্রশ্নের জবাব না দিয়ে ড. খালেদের দিকে তাকাল হ্যানিবল। 'ডাক্তারকে ডাকো। জলদি!' রানাকে দু'হাত দিয়ে ধরল সে, টেনে নিয়ে এসে বসিয়ে দিল বাঙ্কের ওপর। বলল, 'কোন কথা নয়। শুয়ে পড়ো। ডাক্তার আগে দেখুক তোমাকে, দু'মিনিটের বেশি লাগবে না।'

বাঙ্ক থেকে নেমে দাঁড়াল রানা, হ্যানিবলের একটা কব্জি চেপে ধরল শক্ত করে। 'সর্বনাশ ঘটে যেতে দু'মিনিটও হয়তো বাকি নেই! তাড়াতাড়ি বলো, মিটিয়রলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে?'

দু'সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল হ্যানিবল, রানার চেহারায় উত্তেজনা আর অস্থিরতা লক্ষ্য করে ঘাবড়ে গেল সে। 'হ্যাঁ, নানা ধরনের মিটিয়রলজিক্যাল ডাটা রেকর্ড করার জন্যে প্রচুর ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আমাদের। কেন, রানা?'

হ্যানিবলের হাত ছেড়ে দিয়ে জোর করে একটু হাসল রানা। 'এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে আক্রান্ত হতে পারে জাহাজ। ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়েছিল যে অ্যালব্যাট্রস, আবার সেটা আসছে।'

'তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে, রানা?' হতভম্ব দেখাল কমান্ডারকে।

'শরীর খারাপ হয়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু মাথাটা আমার এই মুহূর্তে তোমার চেয়েও ভাল আছে। কি করতে হবে শোনো, মন দিয়ে শোনো।'

প্রকাণ্ড এ-ফ্রেম ক্রেনের প্রায় মগডালে পাহারা আছে, সেখান থেকেই প্রথমে দেখা গেল প্লেনটাকে। দিগন্তজোড়া নীল আকাশের গায়ে গোলাপী একটা ফড়িং—অ্যালব্যাট্রস। এরপর রানা আর কমান্ডারের চোখেও পড়ল সেটা, প্রায় মাইল দুয়েক দূরে। উড়ে আসছে আটশো ফুট ওপর দিয়ে। আরও আগে দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা না পাবার কারণ—সোজা একেবারে সূর্যের চোখ থেকে বেরিয়ে আসছে ওটা।

'দশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে পাইলট,' বলেই ব্যথায় কাতরে উঠল রানা। একটা হাত মাথার ওপর উঁচু করে রেখেছে ও, সন্ন্যাসীর মত দাড়ি-গোঁফে ঢাকা মুখ নিয়ে রানার সামনে দাঁড়িয়ে আছে জাহাজের প্রৌঢ় ডাক্তার, দ্রুত হাতে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিচ্ছে ওর বুকে।

শান্ত-সৌম্য চেহারা ডাক্তারের, কিন্তু চোখ দুটো কঠিন। ব্রিজে কেন রয়েছে রানা, কমান্ডারের সাথে ওর কি সম্পর্ক সবই তার জানা হয়ে গেছে। ওদের কথাবার্তা শুনে বুঝতেও পারছে হামলা করার জন্যে দ্রুত ছুটে আসছে একটা প্লেন, কিন্তু কোন কিছুই টলাতে পারছে না তাকে। জানে, রানাকে বসানো বা শোয়ানো যাবে না, তাই সে-চেষ্টাও করেনি সে। রানা ব্যথা পেয়ে ককিয়ে উঠতেও তার চেহারায় কোন প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা গেল না। এমনকি প্লেনটা এসে পড়েছে বুঝতে পেরেও হাতের কাজ থামিয়ে একবার পিছন ফিরে তাকাল না সে। ডাক্তারের হাবভাব লক্ষ করে তার ওপর শ্রদ্ধা জন্মে গেল রানার।

শেষ নটটা বেঁধে দিয়ে গম্ভীর মুখে রানার চোখে তাকাল ডাক্তার। 'এর বেশি এখন আর কিছু করা সম্ভব হলো না, মেজর।'

'দুঃখিত, ডাক্তার,' আকাশ থেকে চোখ নামাল না রানা। 'ঝামেলাটা চুকে গেলেই আবার আপনার হাতে ধরা দেব আমি। এখন আপনি নিচে পালান। আর, হ্যাঁ, তৈরি থাকবেন, যুদ্ধে আমাদের কৌশল যদি না টেকে, রোগীর কোন অভাব হবে না আপনার।'

কথা না বলে পুরানো লেদার কেসটা বন্ধ করল ডাক্তার। তরতর করে মই বেয়ে নেমে গেল ব্রিজ থেকে। রেলিঙের কাছ থেকে পিছিয়ে এল রানা, দ্রুত তাকাল কমান্ডারের দিকে। 'তার জোড়া লাগানো হয়েছে?'

'সব রেডি!' উত্তেজিত গলায় জানাল হ্যানিবল। হাতে একটা ছোট কালো বাক্স, সেটার সাথে জুড়ে থাকা তারটা রাডার মাস্ট ধরে উঠে গেছে, সেখান থেকে সোজা আকাশে। 'পাইলট টোপটা গিলবে বলে মনে হয়?'

'হিস্ট্রি নেভার ফেইলস্ টু রিপিট ইটসেলফ,' আত্মবিশ্বাসের ছাপ ফুটে উঠল রানার চেহারায়। তাকিয়ে আছে আকাশে। দ্রুত এগিয়ে আসছে প্লেনটা।

এই বিপদ আর উত্তেজনাকর মুহূর্তেও ভিন-দেশী এই যুবকের কথা ভেবে বিস্মিত না হয়ে পারল না কমান্ডার হ্যানিবল। আর সব কথা বাদ দিলেও, চরম সংকটময় মুহূর্তে মাথা ঠাণ্ডা রেখে প্ল্যান তৈরি করা, সবার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নেয়া এবং মধু-মাখানো কথা আর ব্যবহার দিয়ে সবার মন জয় করার যে অসাধারণ গুণের পরিচয় আজ ও দিয়েছে ঠিক এই রকমটি আর কারও মধ্যে দেখেনি সে। আহত শরীর, ক্লান্তিতে জ্ঞান হারাবার অবস্থা, অথচ চেহারা দেখে সেটি বোঝার কোন উপায় নেই। ওদিকে বিনয় প্রকাশে কারও চেয়ে কম যায় না। কনুইয়ের ওপর রানার হাতের খামচি অনুভব করে সংবিৎ ফিরল কমান্ডারের।

'শক ওয়েভের ধাক্কায় পানিতে পড়বে,' চিৎকার করে বলল রানা। 'শুয়ে পড়ো!' নিজেও শুয়ে পড়ল ও। কমান্ডার শুয়ে পড়েছে দেখে আবার বলল, 'তৈরি থাকো। বললেই তার জোড়া লাগাবে!'

জাহাজের কাছ থেকে এখনও কিছু দূরে রয়েছে অ্যালব্যাট্রস, এই সময় হঠাৎ

কাত হয়ে গেল সেটা। জাহাজটাকে মাঝখানে রেখে ঘুরছে, দেখে নিতে চাইছে ডিফেন্সের অবস্থা। পানির ওপর দিয়ে ভেসে এল ইঞ্জিনের ভোঁতা আওয়াজ, কানের পর্দায় ভাইব্রেশন অনুভব করল রানা। ধার করা এক জোড়া বিনকিউলার দিয়ে প্লেনটাকে দেখছে ও। ডানা আর ফিউজিলাজে কালো রঙের ছোট ছোট গোল দাগ দেখে হাসল—বুঝল, ওগুলোর জন্যে বেনের কারবাইন দায়ী। গ্লাস জোড়া প্রায় খাড়া ভাবে নিচে থেকে ওপর দিকে তুলল ও, সারাটা পথ অনুসরণ করল কালো তারটাকে। বেলুনের নিচে একটা প্যাকেট, সেটার ভেতরে সেঁধিয়ে গেছে ওটা। আশাটা দৃঢ় বিশ্বাসে পরিণত হলো: বেলুনটাকে আক্রমণ করার লোভ বা ঝোঁক সামলাতে পারবে না পাইলট।

'হ্যানিবল···হ্যানিবল···' রুদ্ধশ্বাসে বিড়বিড় করে উঠল রানা। বেলুনটার দিকে ক্রমশ এগোল প্লেন। 'সাবধান! রেডি থাকো! বোধহয় মৌচ্যাকে ঠোকর দিতেই যাচ্ছে···লক্ষ্য রাখো!'

আরেকটু হলে হেসেই ফেলছিল কমান্ডার। একশো পাউন্ড বিস্ফোরক, তাকে কিনা মৌচাক বলছে রানা! কেউ ভাবতে পারেনি মিটিয়রলজিক্যাল ইকুইপমেন্ট আছে কিনা জানতে চেয়ে রানা আসলে জানতে চাইছিল ওয়েদার বেলুন আছে কিনা। সিসমিক ল্যাবে এক্সপ্লোসিভ আছে, বা থাকার কথা, সেটা জানা ছিল রানার। ওয়েদার বেলুনও আছে শুনে মহাখুশি হয়ে উঠেছিল ও। একশো পাউন্ড বিস্ফোরক নিজের হাতেই বেঁধে দিয়েছে বেলুনের সাথে। তারপর সবাই মিলে তোলা হয়েছে বেলুনটাকে আকাশে। প্রকাণ্ড রূপালী চাঁদের মত সাগরের মাথার ওপর আকাশে ভাসছে সেটা। বিস্ফোরকের প্যাকেজটা বেলুনের সাথে, ওটার ঠিক নিচেই ঝুলছে। জাহাজ থেকে আটশো ফুট ওপরে এবং চারশো ফুট পিছনে রয়েছে বেলুন। সব মিলিয়ে চারটে ফুটবল মাঠের দূরত্ব। আপনমনে মাথা নাড়ল কমান্ডার। সাধারণত আন্ডারওয়াটার শকওয়েভ তৈরি করে সাগর-তল স্টাডি করার জন্যে ব্যবহার করা হয় এই এক্সপ্লোসিভ চার্জ, অথচ এখন সেটা আকাশের একটা প্লেন উড়িয়ে দেবার কাজে ব্যবহার হতে যাচ্ছে!

আবার কাত হয়ে পড়ল অ্যালব্যাট্রস। বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল ব্লু লিডারের দিকে। প্রতিমুহূর্তে বাড়ছে ইঞ্জিনের গর্জন। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো রানার, গোত্তা দিয়ে সোজা জাহাজের দিকেই নেমে আসবে ওটা। ডাইভ শুরু করে নামতেও শুরু করল। কিন্তু রানা লক্ষ করল, নেমে আসার অ্যাঙ্গেলটা অনেক বেশি নিচু। বেলুনের পাশ ঘেঁষে যাবার জন্যে একটা কাল্পনিক রেখার ওপর আসতে চাইছে পাইলট। জানে ওকে দেখামাত্র গুলি করার ঝোঁক চেপে বসবে পাইলটের মাথায়, তবু ভাল করে দেখার জন্যে উঠে দাঁড়াল রানা। তীক্ষ্ণ, ধারাল হয়ে উঠল ইঞ্জিনের আওয়াজ। গান সাইটগুলো তাক করা রয়েছে অলস বেলুনটার দিকে। দেরি করল না পাইলট, রেঞ্জ অ্যাডজাস্ট করার সময়টুকু পর্যন্ত নিল না সে। কাত হয়ে গেল প্লেন। গোলাপী ডানা দুটো রোদ লেগে ঝিক্ করে উঠল। ডানার আড়ালে পড়ে যাওয়ায় কাউলিঙে বসানো গান দুটো থেকে বেরিয়ে আসা আগুনের ঝলক দেখতে পাওয়া গেল না। দু'ধরনের আওয়াজ পেল ওরা। ফড় ফড় করে সুতী কাপড় টেনে ছিঁড়লে যে আওয়াজ হয়, একটা সেই রকম। প্রায় একই সাথে শোনা

গেল বাতাস কেটে বুলেট ছোটার আরেকটা শব্দ। হামলা শুরু হলো।

ব্যাগটা নাইলনের তৈরি, রাবারের আচ্ছাদন আছে গায়ে, ভেতরে হিলিয়াম। একনাগাড় গুলিবর্ষণে কাঁপতে শুরু করল সেটা। তারপর চুপসে গেল। বেঢপ হয়ে উঠল আকৃতি, সেই সাথে শুরু হলো পতন। সাগরের দিকে দ্রুত নামার সময় ভাঁজ খেয়ে চ্যাপ্টা হয়ে গেল বেলুনটা। সেটার ওপর দিয়ে দ্রুত উড়ে এল অ্যালব্যাট্রস, সোজা রু লিডারের দিকে।

'এখনই সময়!' বলেই ডাইভ দিয়ে ব্রিজের ডেকে পড়ল রানা।

সুইচটা নিচে ঠেলে দিল কমান্ডার। প্রায় সাথে সাথে বিস্ফোরণ। খোল থেকে মাস্তুল পর্যন্ত প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। ভোরের নিস্তব্ধতা চুরমার করে দিয়ে আওয়াজটা হলো যেন টর্নেডোর ধাক্কায় এক হাজার কাঁচের জানালা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। ঘন, কালো আর কমলা রঙের বিশাল একটা মেঘ দেখা গেল আকাশে। ধোঁয়া। ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এল আরও উজ্জ্বল কমলা রঙের আগুন। শকওয়েভের ধাক্কায় সমস্ত বাতাস বেরিয়ে রানা আর হ্যানিবলের ফুসফুস খালি হয়ে গেল, মনে হলো দম ফুরিয়ে যাওয়ায় মারা যেতে বসেছে ওরা।

ধীরে ধীরে, আঁটসাঁট ব্যান্ডেজের ভেতর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে, বাতাসের জন্যে হাঁসফাঁস করতে করতে, উঠে দাঁড়িয়ে দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়া ধোঁয়ার মধ্যে অ্যালব্যাট্রসটাকে খুঁজল রানা। শকওয়েভের ধাক্কা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি শরীর, ওর চোখের দৃষ্টি অনেক বেশি ওপরে গিয়ে পৌঁছুল। মুহূর্তের জন্যে নিরাশায় ছেয়ে গেল মন। নেই অ্যালব্যাট্রস! ধোঁয়ার বিশাল স্তম্ভগুলো শুধু পাক খাচ্ছে আকাশের গায়ে।

কি ঘটেছে এক সেকেন্ড পরই বুঝতে পারল রানা। ওর দেয়া সিগন্যাল আর বিস্ফোরণের মাঝখানে সময়ের একটা ব্যবধান ছিল, সেই সামান্য সময়ের ভেতরই বিস্ফোরণের কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেশ একটু দূরে সরে গিয়েছিল অ্যালব্যাট্রস, সেজন্যেই সাথে সাথে সহস্র টুকরো হয়ে যাওয়া থেকে বেঁচে গেছে ওটা। দৃষ্টি দিগন্তরেখার কাছে নামিয়ে আনতেই দেখতে পেল ওটাকে। গ্লাইড করার ছন্দহীন ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।

ছোঁ দিয়ে পাশ থেকে বিনকিউলার তুলে নিল রানা। চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, আগুনের ফুলকি আর ধোঁয়া ছেড়ে এগোচ্ছে অ্যালব্যাট্রস। তারপর ধীরে ধীরে ডিগবাজি খেতে শুরু করল ওটা। হঠাৎ পিছন দিকে ভাঁজ হয়ে গেল একটা ডানা, ফিউজিলাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সোজা পড়তে শুরু করল সাগরে। এরপর দ্রুত হলো ডিগবাজিগুলো। উঁচু অফিস বিল্ডিং থেকে এক টুকরো কাগজ যেভাবে পড়ে সেভাবে পড়তে শুরু করল। তারপর মনে হলো, দিগন্তরেখার ওপর স্থির হয়ে ঝুলে আছে। এক সেকেন্ড পর সাগরে পড়ল অ্যালব্যাট্রস। ধোঁয়ার রেখা ছাড়া থাকল না কিছু আর।

'বাজি মার দিয়া!' চিৎকার করে বলল কমান্ডার। 'সাবাস ওয়েদার বেলুন! সাবাস মাসুদ রানা!'

ঝট করে হ্যানিবলের দিকে ফিরল রানা। কখন যে সে ওর পাশে উঠে দাঁড়িয়েছে টেরও পায়নি। 'কোথাও ব্যথা পাওনি তো?'

'বুকে বাতাস একটু কমে গেছে, তাছাড়া,' নিজের শরীরের ওপর চোখ বুলাল কমান্ডার, '...সব ঠিক আছে।'

কাজের কথা পাড়ল রানা। 'কিছু লোককে ডাবল-এন্ডারে করে পাঠিয়ে দাও এখুনি। ডাইভ দিয়ে দেখুক কি পাওয়া যায়। ভূতটার চেহারা কেমন দেখতে চাই আমি।'

'অবশ্যই,' ব্যস্ত ভাবে বলল কমান্ডার। 'আমি নিজেই ডাইভিং পার্টির নেতৃত্ব দেব। কিন্তু এক শর্তে।'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'এখুনি তোমাকে আমার কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়তে হবে।'

'তুমিই ক্যাপ্টেন!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা। রেলিঙের দিকে ঘুরল ও। অ্যালব্যাট্রস যেদিকে সলিল সমাধি লাভ করেছে সেদিকে তাকাল। ব্রিজ থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল হ্যানিবল।

বিশ মিনিট পর ডাবল-এন্ডারে ডাইভিং গিয়্যার তোলা শেষ হলো, তখনও রানা সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। ডাবল-এন্ডারে আর সবাই আগেই চড়েছে, এবার তাতে কমান্ডারও উঠল। বৃত্ত রচনা না করে, বা সাগরের সারফেস সার্চ করার কোন চেষ্টা না করে সোজা অ্যালব্যাট্রস যেখানে ডুবে গেছে সেই স্পটের দিকে এগোল বোট। জায়গামত পৌঁছে থামল সেটা, ডুবুরীরা নেমে গেল পানির নিচে।

'এবার আমার হাতে ছেড়ে দিন নিজেকে,' রানার পিছন থেকে মৃদু গলায় বলল ডাক্তার।

ঘুরে দাঁড়াল রানা। 'কখন এলেন?'

'এই তো,' বলে ঘুরে দাঁড়াল ডাক্তার, এগোল মইয়ের দিকে।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাকে অনুসরণ করল রানা। হঠাৎ দুর্বল, নিঃশেষিত, ক্লান্ত লাগল নিজেকে। মনে হলো মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। কিন্তু মই বেয়ে নিরাপদেই নেমে এল ব্রিজ থেকে। কমান্ডারের কেবিন পর্যন্ত কিছুই ঘটল না। কিন্তু বাঙ্কে উঠে শোবার পর আর কিছু মনে থাকল না রানার—ঘুমিয়ে পড়ল।

এগারো

ঘুম ভাঙল চার ঘণ্টা পর। সারা শরীর ভিজে গেছে ঘামে। মনে হলো গরম তন্দুরের ভেতর রয়েছে ও। ভেন্টিলেটারটা বন্ধ দেখে খুলল সেটা, কিন্তু ক্ষতি যা হবার আগেই হয়ে গেছে। কেবিনের গরম বাতাসকে কাবু করতে ঘণ্টা কয়েক সময় লাগবে এয়ারকন্ডিশনারের। ট্যাপ খুলে চোখেমুখে পানি ছিটাল ও। একটা চেয়ারে বসে এক এক করে স্মরণ করল সবগুলো ঘটনা। কার্ল আর তার মেবাক-জেপেলিন। ভিলা। ফন হামেলের সাথে ডিনার। মোনার চোখে পানি। তারপর টানেল, কুকুর, প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা। বিদ্যুৎ...তাকে কি খুঁজে পেয়েছে মালিক? ফিশিং বোট। গোলাপী অ্যালব্যাট্রস। বিস্ফোরণ। কমান্ডার হ্যানিবল আর

তার ক্রুরা সাগর থেকে উদ্ধার করবে প্লেনটাকে, এখন তারই অপেক্ষায় রয়েছে ও। পাইলটের লাশ কি পাবে ওরা? এসবের সাথে কিভাবে, কতটুকু জড়িত ফন হামেল? তার মতলবটা কি? আর মোনা? ফন হামেল ওকে টানেলে ঢুকিয়ে দিয়ে কুকুর লেলিয়ে দিতে যাচ্ছে, সে কি জানত? সে কি ওকে সাবধান করে দিতে চেষ্টা করেছিল? নাকি ফন হামেল তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছে, ওর কাছ থেকে তথ্য আদায় করার জন্যে?

সমস্ত চিন্তা আর প্রশ্ন মাথা থেকে বের করে দিল রানা। ব্যান্ডেজের ভেতর সড় সড় করছে, ইচ্ছে হচ্ছে চুলকায়।

'উফ্, এই গরমে মানুষ বাঁচে!' চেয়ার ছেড়ে ভেন্টিলেটরের সামনে দাঁড়াল রানা। শর্টস ছাড়া আর সব কাপড়চোপড় ওর শরীর থেকে খুলে নিয়েছে ডাক্তার। বেসিনের কাছে পাওয়া গেল সেগুলো। সাবান দিয়ে ধুলো সব। পানি নিঙড়ে পরেও ফেলল। কয়েক মিনিট যেতে না যেতে শুকিয়ে গেল সব।

মৃদু টোকা পড়ল দরজায়। ধীরে ধীরে খুলে যেতে শুরু করল কবাট। উঁকি দিয়ে ভেতরে তাকাল লালচুলো একটা কেবিন বয়। 'মেজর রানা, আপনার ঘুম ভেঙেছে?'

'ভেঙেছে কিনা জানতে হলে এক বোতল ঠাণ্ডা গ্রীক বিয়ার নিয়ে আসতে হবে,' বলল রানা।

বত্রিশ পাটি দাঁত বের করে হাসল ছেলেটা। 'ইয়েস, স্যার!' বলেই অদৃশ্য হয়ে গেল সে। কিন্তু এক সেকেন্ড পর আবার তাকে উঁকি দিতে দেখা গেল। 'স্যার, কর্নেল লী কোসকি আর ক্যাপ্টেন বেন নেলসন আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন। কর্নেল সরাসরি এখানে ঢুকতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমাদের জাহাজের ডাক্তার বাধা দিয়ে ঠেকিয়ে রেখেছেন ওঁদেরকে। কর্নেল জোর-জার করলে তাঁকে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবার হুমকিও দিয়েছেন তিনি।'

হাসি চেপে বলল রানা, 'ঠিক আছে, ওদেরকে আসতে বলো। আর মনে রেখো, বিয়ার নিয়ে আসতে দেরি করলে কেউ এসে কিছু পাবে না—স্রেফ বাষ্প হয়ে উড়ে যাব।'

'ইয়েস, স্যার!' চলে গেল কেবিন বয়।

বাঙ্কে শুয়ে মাথার পিছনে হাত রাখল রানা। কর্নেল আর বেন আসছে। নুমা হেডকোয়ার্টার থেকে উত্তরটা কি পেয়ে গেছে বেন? উত্তরটা পেলে জানা যাবে ফন হামেল গুপ্তধন উদ্ধারের আশায় আছে কিনা। হঠাৎ প্রকাণ্ড সাদা কুকুরটার কথা মনে পড়ল আবার। গোটা ধাঁধার মধ্যে এই কুকুরটারও একটা ভূমিকা আছে বলে মনে হলো ওর। কিন্তু ফন হামেল আর আলবার্ট কেসারলিঙের মাঝখানে কোনভাবেই কুকুরটাকে খাপ খাওয়াতে পারল না ও।

আচমকা দমকা বাতাসের মত কেবিনে ঢুকল কর্নেল কোসকি। মুখটা লাল হয়ে আছে, ঘামছেও দরদর করে। রানাকে দেখে বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল ঠোঁটে। 'আমার দাওয়াতটা পায়ে ঠেললেন, সেজন্যে নিশ্চয়ই পস্তাচ্ছেন এখন, মেজর রানা?'

মুচকি হেসে বাঙ্কের ওপর উঠে বসল রানা। 'কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে, আপনার

দাওয়াতে গেলে যা হত না।'

চেহারাটা গম্ভীর করে তুলে কর্নেল জানতে চাইল, 'শরীরটা এখন কেমন, ভাল তো?'

'ভাল,' বলল রানা। তাকাল বেনের দিকে। 'খবর কি?'

'তার আগে বলো, কাল রাতে আসলে ঘটেছিলটা কি? রেডিও মেসেজে একটা কুকুরের কথা বললেন কমান্ডার হ্যানিবল। ব্যাপারটা কি বলো তো?'

'বলব,' জানাল রানা। 'কিন্তু তার আগে আমার দুটো প্রশ্ন,' কর্নেলের দিকে তাকাল ও। 'ফন হামেলকে চেনেন আপনি, কর্নেল?'

'সামান্য। স্থানীয় গণ্যমান্যদের পার্টিতে কেউ একজন তার সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল, এই রকম দু'চারটে পার্টিতে মাঝে মধ্যে দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। এই পর্যন্তই। তবে লোকমুখে শুনেছি, আজব একটা চরিত্র বটে! হঠাৎ ফন হামেলের কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?'

'কিসের ব্যবসা তার, জানেন?'

'জাহাজের ছোট একটা ফ্লিট আছে তার,' মুহূর্তের জন্যে থেমে চোখ বুজল কর্নেল, চিন্তা করল খানিক, তারপর চোখ মেলে হাসল। 'মনে পড়েছে। ফ্লিটের নাম, মুনমুন লাইন্স।'

'আগে কখনও নামটা শুনিনি তো!'

'সেটাই স্বাভাবিক,' কর্নেলের চেহারায় তাচ্ছিল্যের ভাব ফুটে উঠল। 'থাসোসের পাশ দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে মাঝে মধ্যে যেতে দেখি মুনমুন লাইন্সের দু'একটা জাহাজ, তোবড়ানো বালতি বললেই হয়। ওরা নিজেরা ছাড়া আর কেউ বোধহয় ওটার অস্তিত্বের কথা জানে না।'

ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। 'ফন হামেলের জাহাজ থাসোস কোস্টলাইন ধরে যাওয়া-আসা করে?'

'হ্যাঁ। হপ্তায় বোধহয় একটা করে। দেখলেই চেনা যায় ওগুলোকে—প্রকাণ্ড আকারের জোড়া এম (M) আঁকা আছে স্মোক ফানেলে।'

'সাগরে নোঙর ফেলে, নাকি লিমিনাস ডকইয়ার্ডে ভেড়ে?'

মাথা নাড়ল কর্নেল। 'কোনটাই না। দক্ষিণ দিক থেকে আসে, দ্বীপটাকে মাঝখানে রেখে চক্কর দেয়, তারপর ফিরে যায় আবার দক্ষিণ দিকেই।'

'একবারও না থেমে?'

'খুব জোর আধঘণ্টার জন্যে থামে বটে, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের কাছে।'

বাঙ্ক থেকে নেমে পড়ল রানা। চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল বেনের দিকে, তারপর আবার ফিরল কর্নেলের দিকে। 'আশ্চর্য ব্যাপার, তাই না?'

সিগার ধরাল কর্নেল। জানতে চাইল, 'কেন?'

'মেইন সুয়েজ ক্যানেল শিপিংলেন থেকে থাসোস কম করেও পাঁচশো মাইল দূরে,' ধীরে ধীরে বলল রানা। 'নিজের জাহাজকে শুধু শুধু এক হাজার মাইল বেগার খাটাবে কেন ফন হামেল?'

'জানি না,' তিক্ত স্বরে বলল বেন। 'জানতে চাইও না। এসব ফালতু কথা বাদ দিয়ে কাল রাতে কি ঘটেছিল-তাই বলো। তার সাথে কি ফন হামেলের কোন

সম্পর্ক আছে?'

পায়চারি শুরু করল রানা। তারপর বলতে শুরু করে কিছুই বাদ দিল না ও, সংক্ষেপে সবই জানাল। বলা শেষ হতে তখুনি কেউ কোন মন্তব্য করল না। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল কর্নেল।

'উদ্ভট, অবিশ্বাস্য লাগছে আমার। আবার এ-কথাও সত্যি, কোন কোন ঘটনা মানুষের কল্পনাকেও হার মানায়...'

'কিন্তু ফন হামেল এত সব ঝামেলা করতে গেল কেন সেটাই আমার মাথায় ঢুকছে না!' কর্নেলকে থামিয়ে দিয়ে বলল বেন। 'একটা এয়ারবেস, একটা রিসার্চ শিপে হামলা চালাল সে—কি দিয়ে? না, মান্ধাতা আমলের একটা বাই-প্লেন দিয়ে! কেন? না, শুধুমাত্র ব্লু লিডারকে ভাগাবার জন্যে।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'শুধু উদ্ভট নয়, সাংঘাতিক জটিল লাগছে আমার।'

'ব্লু লিডারকে ভাগাবার জন্যে প্রথমে ছোটখাট স্যাবোটাজ করেছে ফন হামেল,' বলল রানা, 'কিন্তু তাতে যখন কোন কাজ হলো না তখনই সে বাধ্য হয়ে বাই-প্লেন পাঠিয়ে হামলা চালাবার প্ল্যান করে। মান্ধাতা আমলের, ওই প্লেনটা ব্যবহার করে বুদ্ধি এবং প্রতিভার পরিচয় দিয়েছে লোকটা।'

'তারমানে? কি বলতে চাও তুমি?' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল বেন।

'ব্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাবার জন্যে সে যদি একটা আধুনিক জেট পাঠাত, দুনিয়াময় হৈ-চৈ পড়ে যেত না? গ্রীক সরকার, রাশিয়া, আরব—সবাই জড়িয়ে পড়ত না? সামরিক বাহিনীর লোক গিজগিজ করত দ্বীপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ব্যাপারটাকে হালকা ভাবে নিতে পারত না, এখন যেমন নিয়েছে। মার্কিন সরকারকে কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে ফেলেছে বটে অ্যালব্যাট্রস, কয়েক মিলিয়ন ডলার ক্ষতিও করেছে, কিন্তু একটা সশস্ত্র সংঘর্ষ এবং কূটনৈতিক হাঙ্গামায় জড়িয়ে পড়া থেকে বাঁচিয়েও দিয়েছে।'

'ভেরি ইন্টারেস্টিং, মেজর রানা,' ঠাণ্ডা সুরে বলল কর্নেল। 'কিন্তু আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন কি?'

'বলুন?'

'থাসোসে ব্লু লিডারের কাজটা কি?'

'একটা মাছ ধরতে চায় ওরা।'

প্রায় আঁতকে উঠল কর্নেল। 'হোয়াট? মাছ? আমি কি ভুল শুনলাম?'

মৃদু হাসল রানা। 'ঠিকই শুনেছেন। মাছটার নাম টীজার। দুর্লভ একটা নমুনা। কমান্ডার হ্যানিবল আমাকে জানিয়েছেন, ওটা পাওয়া গেলে বিজ্ঞান নাকি এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় সাফল্যের মুখ দেখবে।'

কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল কর্নেল কোসকি। 'বেসটা আমার পার্সোনাল কমান্ডে রয়েছে, মেজর রানা। এই অবস্থায় পনেরো মিলিয়ন ডলারের এয়ারক্রাফট ধ্বংস হয়ে গেছে। সেই সাথে ধ্বংস হয়ে গেছে আমার ক্যারিয়ার। আপনি বলতে চাইছেন, এসবই ঘটেছে শুধু একটা মাছের জন্যে?'

চেহারায় সিরিয়াস ভাব ফোটাবার যথাসাধ্য চেষ্টা করল রানা। 'হ্যাঁ, কর্নেল, তা বলা যেতে পারে, শুধু একটা মাছের জন্যে।'

'মাই গড!' হাত তুলে কপাল চাপড়ালেন কর্নেল। 'ইট'স্ নট ফেয়ার। ইট'স্ নট...'

দরজায় নক হলো, কবাট খুলে ভেতরে ঢুকল কেবিন বয়। হাতে ট্রে, তাতে বাদামী রঙের তিনটে বোতল।

'যতক্ষণ মানা না করি, আসতে থাকুক,' বলল রানা। 'ঠাণ্ডা হয় যেন।'

'ইয়েস, স্যার!' ডেস্কের ওপর ট্রে-টা নামিয়ে রেখে বেরিয়ে গেল কেবিন বয়।

কর্নেলের হাতে একটা বিয়ার ধরিয়ে দিল বেন। 'ব্র্যাডিতে কি হয়েছে না হয়েছে ভুলে থাকার চেষ্টা করুন, কর্নেল,' বলল সে। 'আরও অনেক ধাক্কার মত এটাও সামলে নেবে আপনাদের ট্যাক্সদাতারা।'

'কিন্তু,' গম্ভীর থমথমে মুখে জানতে চাইল কর্নেল, 'ইতিমধ্যে আমি যে হার্টঅ্যাটাকে আক্রান্ত হতে যাচ্ছি, তার কি হবে?'

ঠাণ্ডায় ঘেমে গেছে বিয়ারের বোতলগুলো। নিজেরটা তুলে নিয়ে কপালে ছোঁয়াল রানা।

দু'ঢোক বিয়ার গেলার মাঝখানে জানতে চাইল বেন, 'এখান থেকে কোথায় যাব আমরা?'

'এখনও জানি না,' বলল রানা। 'সাগরের নিচে অ্যালব্যাট্রস থেকে কি পাওয়া যায় না যায় তার ওপর অনেক কিছু নির্ভর করবে।'

'কি পাওয়া যেতে পারে বলে আশা করছ?'

'কোন ধারণাই নেই,' বলল রানা।

ফস্ করে দিয়াশলাই জ্বেলে সিগারেট ধরাল বেন। 'কাল এই সময়ের তুলনায় আজ অনেক এগিয়ে আছি আমরা। হামলার পিছনে লোকটা কে তা এখন জানি। আমাদের শুধু গ্রীক অথরিটিকে সব কথা জানাতে হবে, তাহলেই ফন হামেলকে গ্রেফতার করতে পারে তারা।'

'এতই যদি সহজ হত ব্যাপারটা তাহলে তো কথাই ছিল না,' চিন্তিত ভাবে বলল রানা। 'সেটা অনেকটা এই রকম হবে—মোটিভ নেই অথচ খুনের সন্দেহে একজন লোককে গ্রেফতার করতে বলা। কিন্তু একজন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি তা পারে না।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ, বেন। এখন যদি গ্রেফতার করতে চাওয়া হয়, পিছলে বেরিয়ে যাবে ফন হামেল। আগে তার মোটিভ জানতে হবে আমাদের। জানতে হবে কেন সে এই ধ্বংসযজ্ঞে মেতে উঠেছে।'

'মোটিভ যাই হোক, গুপ্তধন অন্তত নয়,' বলল বেন।

'জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি। অ্যাডমিরাল তোমার মেসেজের উত্তর পাঠিয়েছেন?'

খালি বোতলটা ওয়েস্ট বাস্কেটে ফেলে দিল বেন। 'আজ সকালে, আমি আর কর্নেল ব্র্যাডি ফিল্ড থেকে রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তে পেয়েছি উত্তরটা। দশজন লোককে ন্যাশনাল আর্কাইভে পাঠিয়েছিলেন অ্যাডমিরাল। সার্চ শেষ করে তারা সবাই একমত হয়ে জানিয়েছে, থাসোস এলাকার কোস্টলাইন বরাবর ধন-সম্পদ নিয়ে কোন জাহাজ-ডুবি ঘটেনি।'

'দামী কোন কার্গো?'

'কার্গো নিয়ে জাহাজ ডুবির ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু সেগুলো তেমন কোন মূল্যবান কিছু নয়। অ্যাডমিরালের সেক্রেটারি রিটা অ্যালেন রেডিও মেসেজের সাথে জাহাজের একটা তালিকাও আওড়েছে। গত দুশো বছরে এই ক'টাই ডুবেছে থাসোসে।'

'দু' একটার কথা শোনাও দেখি।'

বুক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বের করল বেন। ভাঁজ খুলে হাঁটুর ওপর রাখল। পড়তে শুরু করল গলা চড়িয়ে।

'মিস্ত্রাল, ফেঞ্চ ফ্রিগেট, সতেরোশো তিপান্ন সালে ডুবেছে। ক্লারা জি, ব্রিটিশ কোল কলিয়ার, আঠারোশো ছাপ্পান্ন সাল। অ্যাডমিরাল ডি ফসি, ফ্রেঞ্চ আয়রনক্ল্যাড, আঠারোশো বাহাত্তর। স্কাইলা, ইটালিয়ান ব্রিগ, আঠারোশো ছিয়াত্তর। ব্রিটিশ গানবোট...'

'লাফ দিয়ে উনিশশো পনেরো সালে চলে এসো,' বাধা দিয়ে বলল রানা।

'এইচ.এম.এস. ফরশায়ার, ব্রিটিশ ক্রুজার, মেইনল্যান্ড থেকে জার্মান শোর ব্যাটারি ডুবিয়ে দেয়, উনিশশো পনেরো সালে। ফন স্ক্রোডার, জার্মান ডেস্ট্রয়ার, উনিশশো ষোলো সালে ব্রিটিশ ওয়রশিপ ডুবিয়ে দেয়। ইউ-নাইনটিন, জার্মান সাবমেরিন, উনিশশো আঠারো সালে ব্রিটিশ এয়ারক্রাফট ডুবিয়ে দেয়।'

'থাক, আর দরকার নেই,' মুখের সামনে হাত তুলে একটা হাই ঠেকাল রানা। 'তালিকায় বেশিরভাগই যুদ্ধ জাহাজ, ওগুলোয় রাজা-বাদশাদের সোনার পাহাড় থাকার আশা কম!'

'কিন্তু প্রাচীন গ্রীক বা রোমান ভেসেল সম্পর্কে খোঁজ নেয়ার উপায় কি?' গুপ্তধনের কথা শুনে কর্নেলের চেহারায় আগ্রহ আর উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। 'সে-সময় কোন জাহাজ যদি এদিকে ডুবে গিয়ে থাকে, তাতে গুপ্তধন পাবার প্রচুর সম্ভাবনা!'

'এর উত্তর আগেই দিয়ে রেখেছে রানা,' বলল বেন। 'শিপিং লাইন্সের যাতায়াতের পথে পড়ে না থাসোস। যুদ্ধ জাহাজ ছাড়া এদিকের পানিতে আর কিছু বড় একটা আসেনি।'

'কিন্তু বলা তো যায় না, আমাদের পায়ের নিচে বিরাট কোন গুপ্তধন থাকতেও পারে,' বলল কর্নেল। 'আর ফন হামেল যদি কোনভাবে সেটার কথা জেনে থাকে, তাহলে তো সে চেষ্টা করবেই কেউ যাতে জানতে না পারে।'

'সাগরে ডুবে থাকা গুপ্তধন খুঁজে বের করার বিরুদ্ধে কোন আইন নেই,' বলল বেন। 'গোপন করার চেষ্টা কেন করবে?'

'লোভ,' বলল রানা। 'সবটুকু হাতাবার লোভ। হয়তো সরকার বা কাউকে ভাগ বসাতে দিতে চায় না।'

'গুপ্তধন পেলে বেশ মোটা একটা অংশ সরকারকে দিয়ে দিতে হয়,' বলল কর্নেল। 'কাজেই ফন হামেল যদি ব্যাপারটাকে গোপন রাখতে চায়, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।'

আরও তিনটে বিয়ারের বোতল দিয়ে গেল কেবিন বয়। সবার আগে নিজের বোতলটা শেষ করল বেন। 'ব্যাপারটা তবু কেমন যেন ঘোলাটেই থেকে গেল।'

'হ্যাঁ, যুক্তি দিয়ে যেদিকেই এগোতে চেষ্টা করি, খানিক দূর গিয়ে দেখি, পথ বন্ধ। গুপ্তধনের সম্ভাবনাও আসলে তেমন জোরাল নয়। ফস হামেদকে কথাটা আমি বলেছিলাম, কিন্তু সেটা সে হেসেই উড়িয়ে দিল। হাবভাব দেখে মনে হলো, তার মোটিভ গুপ্তধন উদ্ধার করা নয়।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল রানা। 'উঁহুঁ। সমাধানটা অন্যখানে। হয় দ্বীপে, না হয় দ্বীপের কাছাকাছি, অথবা হয়তো দু'জায়গাতেই। অ্যালব্যাট্রস আর তার পাইলটকে পাওয়া গেলে আমরা হয়তো কিছুটা আলো দেখতে পাব।'

উঠে দাঁড়িয়ে হাই তুলল বেন, আড়মোড়া ভাঙল, তারপর অলস ভঙ্গিতে পায়চারি শুরু করে বলল, 'যাই হোক না কেন, আগামীকাল এই সময়ের মধ্যে ওয়াশিংটনে ফিরে যেতে কোন বাধা নেই আমাদের। হামলার জন্যে দায়ী প্লেনটা ধ্বংস করা গেছে, এসবের পেছনে কে আছে তাও জানা গেছে, কাজেই পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আমাদের ফিরে না যাবার পেছনে আমি তো কারণ দেখি না।'

'অসম্ভব!' চটে উঠে বলল কর্নেল। 'আমাদেরকে এই রকম একটা অনিশ্চিত অবস্থায় ফেলে কোনমতেই ফিরে যেতে পারেন না আপনারা! যা কিছু ঘটেছে, এখানে নুমার উপস্থিতিই সেজন্যে দায়ী। কাজেই··· দরকার হলে অ্যাডমিরালের সাথে যোগাযোগ করব আমি···'

'আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই, কর্নেল,' দোরগোড়া থেকে বলল কমান্ডার হ্যানিবল। 'মেজর রানা এবং ক্যাপ্টেন বেন থাসোস ছেড়ে এখুনি কোথাও যাচ্ছেন না।'

দ্রুত ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা। কিন্তু কমান্ডারের ভাবলেশহীন চেহারা দেখে বোঝা গেল না কিছুই। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত দেখাল তাকে। চার ঘণ্টা ডাইভিঙের মধ্যে কাটিয়েছে, ভাবল রানা, শরীরের ওপর দিয়ে ধকল তো যাবেই।

'কোন মেসেজ আছে, কমান্ডার?' জানতে চাইল রানা।

'দুঃসংবাদ, রানা,' এগিয়ে এসে একটা চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল কমান্ডার।

'কি?' এগিয়ে গেল রানা। দাঁড়াল হ্যানিবলের সামনে। 'প্লেনটা তুলতে পারোনি? লাশটা···?'

কাঁধ ঝাঁকাল হ্যানিবল। 'ঠিক ধরেছ।'

'কিন্তু···'

কমান্ডার অসহায় ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে শুরু করায় মাঝপথে থেমে গেল রানা। ঝাড়া ত্রিশ সেকেন্ড চোখ বুজে বসে থাকল কমান্ডার। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত ভাবে বলল, 'বিশ্বাস করো, চেষ্টার কোন ত্রুটি করিনি আমরা! আন্ডারওয়াটার সার্চট্রিক সবগুলো খাটিয়েছি। কিন্তু··· কিন্তু···'

'কিন্তু কি?' বেন আর কর্নেল একযোগে জানতে চাইল।

'কিন্তু প্লেনটাকে পেলাম না,' আবার মাথা নাড়ল কমান্ডার হ্যানিবল। 'গায়েব হয়ে গেছে সেটা। কোথায়, তা একমাত্র খোদাই বলতে পারে।'

বারো

'থাসিয়ানরা ছিল থিয়েটারের ভারি ভক্ত। নাট্য-শিল্পকে শিক্ষার একটা অঙ্গ বলে বিবেচনা করত তারা। সবাইকে, এমনকি শহরের দীন-হীন ভিখারীটিকেও থিয়েটারে আসার জন্যে উৎসাহিত করা হত। মেইনল্যান্ড থেকে নতুন ড্রামা নিয়ে নাট্য-শিল্পীরা প্রাচীন নগরী থাসোসে পা রাখার সাথে সাথে সমস্ত ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেত, জেলখানা থেকে ছেড়ে দেয়া হত বন্দীদের। এমনকি শহরের পতিতারা, সমস্ত সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হত যাদেরকে, তারাও থিয়েটারের মেইন গেটে দাঁড়িয়ে খদ্দের ধরার অনুমতি পেত, দিন কয়েকের জন্যে আইন তাদের জন্যে কোনরকম ঝামেলার কারণ হয়ে দাঁড়াত না।'

ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশনের গাইড বর্ণনা শেষ করে সকৌতুকে হাসি চাপল। পুরুষ এবং মেয়েদের প্রতিক্রিয়া সব সময় একরকম হলেও, প্রতিবারই ব্যাপারটা সে উপভোগ করে। অপ্রতিভ আড়ষ্টতার ভান করে ফিসফাস করছে মেয়েরা, ওদিকে বারমুডা শার্ট পরা, কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো পুরুষের দল পরস্পরের পাঁজরে কনুই দিয়ে ঠেলা দিচ্ছে, চোখ মটকাচ্ছে।

ঘন, মোটা গৌফের একটা প্রান্ত মুচড়ে নিয়ে গ্রুপটাকে আরও গভীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল গাইড। মোটাসোটা, ফোলা-ফাঁপা পেট, পুরুষগুলোকে দেখলেই বোঝা যায় ব্যবসা থেকে পালিয়ে এসেছে। স্ত্রীরাও এক একটা হস্তিনী। করার আর কোন কাজ নেই, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে চলে এসেছে। যতটা না ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ, তারচেয়ে বেশি লোভ প্রতিবেশীদের কাছে বড় হবার বাসনা। ফিরে গিয়ে কি দেখেছে না দেখেছে তার সত্য-মিথ্যে এমন ফিরিস্তি দিতে শুরু করবে, দিন কয়েক অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে প্রতিবেশীরা। চারজন স্কুল টীচারের ওপর চোখ বুলাল সে। এরা আলহামরা, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে এসেছে। সাধারণ চেহারা এদের, চশমা পরা, কারণে-অকারণে সারাক্ষণ হাসছে। কিন্তু মেয়েগুলোর বয়স বেশি, একজন বাদে তিনজনেরই চল্লিশের কম নয়। বাকি একজনের শুধু বয়স কম নয়, চেহারাটাও ভারি মিষ্টি। বড় বড় বুক, পা দুটো লম্বা, শরীরে কোথাও মেদ জমেনি, গঠনটাও দারুণ। এর ওপর একটা চান্স নেয়া যেতে পারে, ভাবল গাইড। আজ একটু রাত হলে, চাঁদের আলোয় ওকে ধ্বংসাবশেষ দেখাবার প্রস্তাব দেয়া যেতে পারে।

হাতের লাল গোলাপটা বাটনহোলে গুঁজে রাখল গাইড। গায়ের রঙ শ্যামলা হলেও নাক-নকশা খারাপ তা কেউ বলতে পারবে না। খারাপ হলে কি মেয়েদের ব্যাপারে ভাগ্যটা তার এত ভাল হয়? প্রায়ই তো গেঁথে ফেলে! ধীরে ধীরে স্কুল-টীচার মেয়েটার ওপর থেকে সবার পিছনে দৃষ্টি দিল সে। দলের সাথে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা থামের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ওরা কারা?

হঠাৎ সতর্ক, সন্দিহান হয়ে উঠল গাইডের চোখ। বয়সে তরুণ, অলস ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে, কিন্তু স্বাস্থ্য আর শারীরিক গঠন দেখে মনে হয় এরা সাধারণ কেউ

নয়। দু'জনের মধ্যে একজনের চেহারায় আশ্চর্য মার্জিত একটা ভাব আছে, অথচ তার ঘাড় ফেরানো, চোখ তুলে তাকানো, দাঁড়াবার ভঙ্গি ইত্যাদি আচরণে যেন পরিষ্কার লেখা আছে—'সাবধান! বিপজ্জনক চরিত্র।' আরেকজন মোটাসোটা, চোখে ভোঁতা দৃষ্টি এবং বুনো একটা ভাব আছে তার আচরণে। আবার গোঁফের ডগা মোচড়াল গাইড। মোটা লোকটা জার্মান হতে পারে, ভাবল সে। আর বিপজ্জনক চরিত্রটি দক্ষিণ আমেরিকান অথবা এশিয়ান হতে পারে। জাহাজের নাবিক হতে পারে এরা, হয়তো ভেগেছে।

গ্রুপের মাঝখান থেকে প্রশ্ন উঠতে শুরু করল।

আবার শুরু করল গাইড। 'মাটি খুঁড়ে এই থিয়েটার আবিষ্কার করা হয়েছে উনিশশো বাহান্ন সালে। একটানা দু'বছর লেগেছিল বের করে আনতে। মানুষের হাতে নয় প্রকৃতির নিজের হাতে রঙ করা পাথর দিয়ে তৈরি এর মেঝে…' বলে চলল গাইড।

পাথুরে সিঁড়ির ধাপে ধপ্ করে বসে পড়ল রানা, ওর দেখাদেখি বেনও। পরিশ্রান্ত ট্যুরিস্টের অভিনয় করছে ওরা। আড়চোখে লক্ষ্য করল, গ্র্যানাইট পাথরের ধাপ টপকে সিঁড়ির মাথায় উঠে গেল গ্রুপটা, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল তাদের মাথা। ওমেগায় সাড়ে চারটে বাজে। ব্লু লিডার থেকে তিন ঘণ্টা আগে রওনা হয়েছে ওরা। চুরি করা বোটটা নিয়ে ভিড়েছিল লিমিনাসে। ওটা যে চুরি গেছে, বোটের মালিক সেটা জানতে পারেনি, কাজেই জায়গা মত বোট রেখে দেবার সময় কেউ বাঁধতে আসেনি ওদেরকে। লিমিনাসেই ট্যুরিস্টদের গ্রুপটার সাথে ভিড়ে যায় ওরা।

আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে ওরা, পরিষ্কার বুঝে নেবে ওদেরকে ছাড়াই ট্যুর করছে গ্রুপটা, তারপর নিজেদের পথে এগোবে। গাইড বা আর কেউ যদি ওদেরকে দেখতে না পেয়ে খোঁজ নেয়, তাহলেই বিপদ। মিনিট পনেরো অপেক্ষা করল ওরা, ওদের খোঁজে ফিরে এল না কেউ। বেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অ্যাম্ফিথিয়েটারের স্টেজ-ডোরের দিকে তাকাল রানা।

'এই দিন-দুপুরে কাজটা না করলেই কি হত না, রানা?' ফিসফিস করে জানতে চাইল বেন। 'আর সব চোরের মত রাতের অন্ধকারে ঢুকলে কি ক্ষতি ছিল?'

'সময় দিতে চাই না ফন হামেলকে,' বলল রানা। 'অ্যালব্যাট্রস হারিয়ে তাল হারিয়ে ফেলেছে সে, এখনই আরেকটা চমক দেবার সময়। দিনের বেলা কাউকে সে আশা করছে না, কাজেই…বুঝেছ?'

রানার চেহারা আর চোখের ভাষা লক্ষ্য করে একটু অবাকই হলো বেন। প্রতিশোধ নেবার জন্যে উদগ্রীব হয়ে আছে ও।

'কিন্তু অন্য কোন ভাবে কিছু করা যেত কিনা ভেবে দেখেছ, রানা? এর চেয়ে হয়তো সহজ উপায় ছিল…'

'এটাই একমাত্র উপায়,' বেনকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'অ্যালব্যাট্রসটাকে তিমি গিলে খায়নি, অথচ একটা নাট-বল্টুও না রেখে সাগর থেকে গায়েব হয়ে গেল সেটা! তার কারণ, ফন হামেল জানে, পাইলটের লাশ পাওয়া গেলে তার পরিচয়

আমরা উদ্ধার করে ফেলব, তাই কৌশলে সব সরিয়ে নিয়ে গেছে সে। এ থেকে বোঝা যায়, বুদ্ধিমান, শক্তিশালী একটা শত্রুর পিছনে লেগেছি আমরা। আইনের পথ ধরে তাকে কাবু করা যাবে না। আমাদের প্রথম কাজ ভিলাটা সার্চ করা। দেখা যাক কি পাই।'

'কিন্তু এটা তোমার বা আমার দেশ নয়, রানা,' মৃদু গলায় বলল বেন। 'এটা গ্রীস। কারও ব্যক্তিগত বাসা-বাড়িতে ঢোকার আইনগত অধিকার নেই আমাদের।'

'নেই, জানি,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রানা। 'কিন্তু গ্রীক অথরিটির হাতে ধরা পড়লে খুব একটা ভুগতে হবে না আমাদের। অ্যাডমিরালের চাপে পড়ে মার্কিন সরকার অনুরোধ করবে, গ্রীক সরকার আমাদের ছেড়ে দেবে। কাজেই ভয় পাবার কিছু নেই।'

'সেজন্যই কি আমরা কোন অস্ত্র নিইনি সাথে?'

'সেজন্যেই।' সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল রানা। এগোল সরু প্রবেশ পথটার দিকে।

'কিন্তু ফন হামেলের হাতে ধরা পড়লে?'

'তা নিয়ে এখনও কিছু ভাবতে শুরু করিনি আমি,' সত্যি কথাই বলল রানা।

খিলানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল ওরা। দিনের আলোয় লোহার গ্রিলটাকে অন্য রকম দেখাল রানার চোখে। আগের মত মোটা, ভারী বলে মনে হলো না। এগিয়ে গিয়ে রডের গায়ে লেগে থাকা শুকনো রক্তের দাগ দেখাল বেনকে। 'এটাই।'

চোখ কপালে তুলল বেন। 'এই এত্তটুকুন ফাঁক দিয়ে গলে বেরিয়ে এসেছিলে?'

'তাড়াতাড়ি করো, সময় নেই,' ব্যস্ত সুরে বলল রানা। 'এরপর ট্যুরিস্টদের আরেকটা গ্রুপ আসবে, পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর।'

কাজে লেগে গেল বেন। ব্যাগ থেকে সতর্কতার সাথে বের করল কয়েকটা জিনিস। গ্রিলের একটা রডে টি.এন.টি-র দুটো চার্জ ফিট করল সে, মাঝখানে ব্যবধান রাখল বিশ ইঞ্চি। চার্জের সাথে তার জুড়ল, তারপর টেপ দিয়ে মুড়ে দিল দুটোই। তারের অপরপ্রান্ত ডিটোনেটরের সাথে আগেই জুড়ে দেয়া হয়েছে। খিলানের বাইরে, একটা পাথরের আড়ালে, ডিটোনেটরের পাশে চলে এল ওরা।

'কি রকম আওয়াজ হবে?' চারদিকটা দেখে নিয়ে জানতে চাইল রানা। কোথাও লোকজনের ছায়া দেখল না ও।

'সেটিঙে যদি কোন ভুল না করে থাকি,' বলল বেন, 'একশো ফুট দূর থেকে পপগানের মত আওয়াজ শোনা যাবে।' আরও কিছুক্ষণ চারদিকটা দেখল রানা। তারপর ফিরল বেনের দিকে। 'ফাটাও তোমার আণবিক বোমা।'

ডিটোনেটরের গায়ে ছোট্ট প্লাস্টিকের সুইচটায় চাপ দেবার আগে রানার দেখাদেখি মাথা নিচু করে নিল বেন। সুইচ দেবার সাথে সাথে একটা শব্দ হলো, কিন্তু মাত্র পনেরো ফুট দূর থেকেও মৃদু ধুপ ছাড়া আর কিছু শোনা গেল না। পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়েই ছুটল ওরা।

চার্জে জড়ানো টেপ ফেটে গেছে। হালকা একটু ধোঁয়া দেখল ওরা। লোহার রড যেমন ছিল তেমনি আছে, ভাঙেনি।

'এর মানে?'

পিছিয়ে এসে লোহার রডে কষে একটা লাথি দিল বেন। সাথে সাথে ভেঙে

গেল রডটা।

লোহার গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, ব্যাগটা তুলে নিয়ে ওকে অনুসরণ করল বেন।

'দরজায় পৌঁছুতে কতক্ষণ লাগবে?' জানতে চাইল বেন।

'কাল রাতে বেরিয়ে আসতে আট ঘণ্টা লেগেছিল আমার,' মুচকি হাসল রানা। 'কিন্তু ঢুকতে পারব আট মিনিটেই।'

'কিভাবে? ম্যাপ আছে?'

'তারচেয়েও ভাল কিছু,' হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠে বলল রানা। ফ্লাইং ব্যাগটা দেখাল ইঙ্গিতে। 'লাইটটা দাও আমাকে।'

ব্যাগ থেকে হলুদ একটা লাইট বের করল বেন, ডায়ামিটারে প্রায় ছয় ইঞ্চি। 'অ্যালেন ডাইভ ব্রাইট বলে এটাকে। এই যে অ্যালুমিনিয়াম কেসিং দেখছ, পানির নিচে নয়শো ফুট পর্যন্ত ওয়াটার প্রুফ। আমরা পানিতে নামছি না বটে, কিন্তু ডাঙাতেও এর কেরামতি কম নয়। জ্বেলে দেখো, আলোটা হবে চিকণ, দু'ইঞ্চি ডায়া, কিন্তু দৌড় অনেক দূর। আলোর পাওয়ার আট হাজার মোমবাতির সমান। জাহাজ থেকে ধার করে এনেছি।'

বোতাম টিপে আলোটা জ্বালল রানা। 'এসো।'

'এক মিনিট,' বলল বেন। 'প্রমাণগুলো মুছে দিই আগে।' কাজটা শেষ করে সিধে হয়ে দাঁড়াল সে। 'চলো।'

সামনের দিকটা ইঙ্গিতে দেখাল রানা। 'কিছু দেখতে পাচ্ছ?'

'রক্ত।'

'ম্যাপের চেয়ে ভাল, বলিনি?'

সিঁড়ির ধাপ ক'টার ওপর জমাট বেঁধে শক্ত হয়ে গেছে রক্ত। কোথাও এক ঝাঁক ফোঁটা, কোথাও ছোট্ট একটা পুকুর। হঠাৎ বদলে গেল টেম্পারেচার—বাইরে ছিল ঘাম ঝরানো গরম, গোলকধাঁধার ভেতর শীতকালের ঠাণ্ডা। দ্রুত এগোল ওরা। দু'পাশে প্যাসেজ, ছায়ার মধ্যে মুখ হাঁ করে আছে। নিচের দিকে চোখ রেখে রক্তের দাগ অনুসরণ করল রানা। এক-একটা চৌমাথায় এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। টানেলের উপশাখায় ঢুকে আবার যদি বেরিয়ে এসে থাকে রক্তের দাগ তাহলে বুঝতে হবে ওদিকে পথ নেই। যেদিকে একটা মাত্র দাগ আছে সেদিকেই শুধু এগোল ওরা।

'আর বেশি দূরে নয়,' এক সময় নিচু গলায় বলল রানা। 'আর দু'তিনটে বাঁকের পর দেখতে পাব কুকুরটাকে।'

কিন্তু পাওয়া গেল না। কুকুরটাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। মেঝেতে, দেয়ালে রক্তের মোটা দাগ দেখে বোঝা গেল, এখানেই মারা গিয়েছিল জন্তুটা। ভাপসা গন্ধের সাথে রক্তের দুর্গন্ধ অসহ্য লাগল ওদের। 'এখানে দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।' বলে পা বাড়াল ও। 'সামনের বাঁকটা ঘুরলেই দরজা।'

ডাইভ ব্রাইটের উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভারী দরজা। রানাকে পাশ কাটিয়ে দরজার সামনে থামল বেন, হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মেঝের ওপর। এদিকের, অর্থাৎ ভেতর দিকের বোল্টটা পরীক্ষা করল ও। সময় নষ্ট করার ধাত নয়,

এরই মধ্যে তার আঙুলগুলো সরু ফাঁকের ভেতর ঢুকে পড়েছে, এই ফাঁকটাই ফ্রেম মোল্ডিং থেকে আলাদা করছে দরজাটাকে।

'গড ড্যাম,' চটে উঠে বলল সে।

'কি হলো?'

'ওদিকে বড় স্লাইডিং ল্যাচ। এদিক থেকে ওটাকে সরাবার মত যন্ত্রপাতি নেই আমার কাছে।'

'কব্জাগুলো খোলা যায় কিনা দেখো,' ফিসফিস করে বলল রানা। দরজার উল্টোদিকে আলো ফেলল ও। কিন্তু ও মুখ খোলার আগেই সেদিকে হাত বাড়িয়ে ব্যাগটা টেনে নিয়েছে বেন। ব্যাগ থেকে ছোট একটা ছুঁচাল বার বের করল সে। কব্জার স্ক্রুগুলো মরচে ধরা শ্যাফট থেকে একটা একটা করে দ্রুত খুলে পড়তে লাগল।

সবগুলো স্ক্রু খোলা শেষ হতে ধীরে ধীরে দরজাটা সরাল রানা। প্রথমে এক ইঞ্চি। সরু ফাঁকে চোখ রেখে তাকাল ওদিকে। কাউকে দেখতে পেল না বারান্দায়, নিজেদের নিঃশ্বাস পতনের শব্দ ছাড়া কোন আওয়াজও ঢুকল না কানে।

দরজা তুলে দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল ওরা। ঝুল-বারান্দা ধরে এগোল রানা, হঠাৎ রোদের আলোয় ধাঁধিয়ে গেল চোখ। পিছনেই বেন। তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে এল নিচে। স্টাডিতে ঢোকার দরজাটা খোলা দেখল। বাতাসে দুলছে পর্দাটা। দরজার পাশের দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে কান পাতল রানা। কোন আওয়াজ পেল না। তারপর সাবধানে উঁকি দিল ও। খালি।

স্টাডিতে ঢুকে চারদিকে তাকাল রানা। বইয়ের শেলফ, বার, শো-কেস সব যেমন দেখেছিল তেমনি আছে। আগের মতই বেমানান লাগল শো-কেসের মাথার ওপর মডেল সাবমেরিনটাকে। নিঃশব্দ পায়ে এগিয়ে গিয়ে খুদে ডুবোজাহাজের সামনে দাঁড়াল ও। কালো মেহগনি কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে। খোল আর কনিং টাওয়ার সিল্কের মত চকমক করছে। প্রতিটি পেরেক থেকে শুরু করে এক চিলতে সুঁই-সুতোর কাজ, সবই যেন ইম্পিরিয়াল জার্মান ব্যাটল ফ্ল্যাগের হুবহু নকল। কনিং টাওয়ারের পাশে রঙ করা নাম্বার দেখে বোঝা গেল, এটা একটা ইউ-নাইনটিন—এই ইউ-বোটের একটা সিসটার শিপই লাসিতানিয়াকে টর্পেডো মেরেছিল।

কনুইয়ের ওপর স্পর্শ পেতেই ঝট করে ফিরল রানা।

'কিসের যেন আওয়াজ শুনলাম,' ফিসফিস করে বলল বেন।

'কোথায়?'

'বুঝতে পারিনি কোন্‌দিক থেকে এল...' খানিক ইতস্তত করে আবার শোনার চেষ্টা করল বেন, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে আবার বলল, 'কানের ভুল হতে পারে।'

মডেল সাবমেরিনের দিকে ফিরল রানা। 'মনে আছে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ঈজিয়ানের এদিকে একটা সাবমেরিন ডুবে গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। হঠাৎ এ-প্রশ্ন কেন?'

'সেটার নাম্বার মনে আছে?' জানতে চাইল রানা।

'আছে। ইউ-নাইনটিন। কেন?'

'পরে বলব। এসো, কেটে পড়ি।'

'সেকি!' আকাশ থেকে পড়ল বেন। 'এই তো মাত্র এলাম। সার্চ করবে না?'

মডেলের গায়ে টোকা দিল রানা। 'যা খুঁজছিলাম পেয়ে গেছি।' হঠাৎ প্রায় চমকে উঠল রানা। বেন অনুভব করল, রানার সমস্ত পেশী এবং ইন্দ্রিয় সজাগ, সতর্ক হয়ে উঠল। একটা হাত তুলে বেনকে কোন শব্দ করতে নিষেধ করল সে।

'কেউ আছে এখানে,' রানার নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে এল শব্দ ক'টা। 'দু'জন দু'দিক থেকে এগোব। আমি জানালার দিকে, তুমি পিলার ঘেঁষে। সোফার কাছে এক হব আমরা।' কথা শেষ করে বসে পড়ল রানা, ক্রল করে এগোল। বেন এগোল হামাগুড়ি দিয়ে।

এক মিনিট পর সোফার পেছনে থামল ওরা। একটু একটু করে এগিয়ে সোফার ব্যাকরেস্টের ওপর দিয়ে উঁকি দিল রানা। কিছু না বলে, কোন আওয়াজ না করে নিজের পায়ে দাঁড়াল ও। কয়েক সেকেন্ড কেটে গেল, কিন্তু বেনের মনে হলো রানা যেন বছরখানেক ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে। ধৈর্য রাখতে পারল না, রানার পাশে উঠে দাঁড়াল সে-ও। দেখল, সোফার ওপর হাত-পা গুটিয়ে শুয়ে আছে একটা মেয়ে। পরনে বিশেষ কিছু নেই, শুধু লাল একটা নেগলিজি, গলা থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ঢাকা পড়ে আছে। স্বচ্ছ নাইলন, থাকা না থাকা সমান। মেয়েটার উদ্ভিন্ন যৌবন দেখে চোখ দুটো বড় বড় করে মস্ত একটা ঢোক গিলল বেন।

'মোনা,' ফিসফিস করে বলল রানা। পরমুহূর্তে পকেট থেকে রুমাল বের করে মোনার মুখের ভেতর কয়েকটা আঙুল ভরে দিল। মুখটা খুলে ভেতরে রুমালটা ঢুকিয়ে দিল ও। কি করতে হবে রানা বলে না দিলেও বুঝতে দেরি করল না বেন। ছটফট করতে শুরু করল মোনা, কিন্তু ঘুমটা এখনও পুরোপুরি ভাঙেনি। নেগলিজির হেম ধরে মোনার মাথার ওপর তুলল বেন, তারপর ফিতে দিয়ে বেঁধে দিল মাথার চারধারে। ইতিমধ্যে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করছে মোনা। তাকে কাঁধে তুলে নিয়েই ছুটে স্টাডি থেকে বেরিয়ে এল রানা। ঠিক পিছনেই রয়েছে বেন।

টানেলে বেরিয়ে এসে বেনের জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল রানা। দরজাটা জায়গা মত বসিয়ে কব্জা এঁটে দিল বেন, ওটা যে খোলা হয়েছিল তার কোন চিহ্নই থাকল না আর।

পাশাপাশি থাকল ওরা। আলো জ্বেলে পথ দেখাল বেন। মোনাকে কাঁধে নিয়ে ছুটল রানা। সিঁড়ির নিচে পৌঁছতে মাত্র পাঁচ মিনিট লাগল ওদের। কিন্তু এরই মধ্যে অসুস্থ শরীর নিয়ে বেদম হাঁপাতে শুরু করেছে রানা।

'বোঝাটা লোভনীয়,' বলল বেন। 'কিছুক্ষণের জন্যে দেবে আমাকে?'

সিঁড়ির মাথায় রোদ পড়েছে, সেদিকে তাকিয়ে ছিল রানা। 'না,' বলল ও। তারপর ধাপ বেয়ে উঠতে শুরু করল।

লোহার গ্রিল দেয়া গেট দিয়ে বেরিয়ে এল রানা, পাশেই রয়েছে বেন। হঠাৎ গলা ফাটানো অট্টহাসি শুনে থমকে দাঁড়াল দু'জনেই।

A. H. M. Mohit
Boi Lover's Pulapan

হামলা-২

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর, ১৯৮২

এক

হাসিটা ভেসে এল খিলানের ওদিক থেকে।

টানেল থেকে মাত্র বেরিয়ে এসেছে মাসুদ রানা, পাশেই রয়েছে বেন নেলসন। রানার কাঁধ থেকে বস্তার মত ঝুলছে অর্ধনগ্ন মোনা, স্বচ্ছ লাল নাইলনের একটা নেগলিজি ছাড়া আর কিছু নেই তার পরনে।

হাসির শব্দে চমকে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জনেই।

যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ থেমে গেল অট্টহাসি। লোকটাকে দেখা গেল না। কিন্তু তার তীব্র বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠস্বর শুনে বোঝা গেল, খিলানের ওদিকে ছড়ানো বড় আকারের কোন একটা পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে আছে সে।

'আপনারা তো অদ্ভুত লোক! চুরি করার জন্যে ভাল জিনিস বেছে নিয়েছেন! কিন্তু আপনারা বোধহয় জানেন না, হিস্টরিক্যাল সাইট থেকে মূল্যবান কিছু চুরি করা বড় ধরনের অপরাধ। গ্রীক আইন এ ব্যাপারে সাংঘাতিক কড়া।'

কাঁধে মোনাকে নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল রানা, এরই মধ্যে বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে, কিন্তু বিপদের ধরনটা পরিষ্কার বুঝতে না পারায় অসহায় বোধ করল ও। লোকটা একা, নাকি সঙ্গে কেউ আছে? নিরস্ত্র, নাকি সশস্ত্র? পুলিসের, নাকি ফন হামেলের লোক?

চট করে খানিক পিছিয়ে গেছে বেন, ডাইভ ব্রাইট আর ফ্লাইট ব্যাগটা লোহার গেটের ফাঁকে ঢুকিয়ে হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে, সিঁড়ির ধাপের ওপর পড়ল ওগুলো। এদিকটা অন্ধকার মত, খিলানের ওদিক থেকে ব্যাপারটা দেখতে বা শুনতে না পাবারই কথা।

রানার আন্দাজই ঠিক হলো। খিলানের ওদিকে ছড়িয়ে থাকা একটা বড় পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। দেখেই তাকে চিনতে পারল ওরা। ঘন, পুরু, কালো গোঁফ। কালো প্যান্ট, সাদা পপলিনের শার্ট। একটু বেঁটে, কিন্তু শক্ত-সমর্থ। আস্তিন গোটানো হাতের পেশী বলে দেয়, নিয়মিত ব্যায়াম করে এই লোক। খিলানের নিচে দিয়ে রানার সামনে চলে এল সে। হাতে রয়েছে নাইন মিলিমিটারের ক্লিসেন্টি অটোমেটিক পিস্তল, ব্যারেলটা সরাসরি রানার হৃৎপিণ্ড বরাবর তাক করে ধরা। লোকটা গ্রীক ন্যাশনাল ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশনের সেই গাইড।

চেহারাটা কঠোর করে তুলল রানা। আশা, চোটপাট দেখিয়ে ঝামেলাটা কাটিয়ে উঠতে পারবে। বলল, 'আপনার কাছ থেকে আরও ভদ্র ভাষা আশা করি

আমরা। চোর বলছেন কাকে?'

'চোর যদি না হন তো কিডন্যাপার?' ব্যঙ্গের হাসি হেসে বলল গাইড। তার ইংরেজীতে কোথাও একটু খুঁত নেই। 'আশা করি এবারের নামকরণটা ঠিক হয়েছে?'

'না। আপনি আমাদেরকে ভুল বুঝেছেন,' কিভাবে যেন বুঝতে পেরেছে রানা, চোটপাট দেখিয়ে এই লোকের সাথে সুবিধে করা যাবে না। খানিক ইতস্তত করে, চেহারায় অপ্রতিভ ভাব ফুটিয়ে তুলে, মৃদু গলায় বলল আবার, 'মানে···সত্যি কথাটাই বলি তাহলে। আমরা আসলে জাহাজী। অনেকদিন পর ডাঙায় পা দিয়েছি। তাই···মানে···একটু ফুর্তি করার জন্যে বেরিয়েছি আর কি···বুঝলেন না!'

'বুঝেছি বৈকি!' গাইডের হাতে পিস্তলটা এক চুল নড়ল না। রানার চোখে তাকিয়ে আছে, কিন্তু বেনকেও নজরের আড়ালে পড়তে দেয়নি। উপলব্ধি করল রানা, একে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। 'সেজন্যেই তো আপনাদেরকে গ্রেফতার করা হলো।'

তলপেটের ভেতর একটা আলোড়ন অনুভব করল রানা। ওদের এই ধরা পড়ে যাওয়াটা বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে। গাইডকে যদি ভুল বোঝানো না যায়, পুলিসী ঝামেলায় পড়তে হবে ওদেরকে। এয়ারবেস কমান্ডিং অফিসার কর্নেল কোসকি অথবা ব্লু লিডারের কমান্ডার হ্যানিবলের নাক গলানো গ্রীক পুলিস যদি গ্রাহ্য না করে, জেল-হাজতে পাঠানো হবে ওদেরকে, এবং বিচারের কাজটাও তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা হবে। রায় কি হবে, এখনই অনুমান করা যায়। গ্রীস থেকে বহিষ্কার করা হবে ওদেরকে। তার মানে রানার সমস্ত প্ল্যান পরিকল্পনা ভণ্ডুল হয়ে যাবে।

চেহারায় নিরীহ গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে তুলল রানা। 'বিশ্বাস করুন, আমরা কাউকে কিডন্যাপ করিনি। দেখুন,' ইঙ্গিতে মোনার প্রায় নিরাবরণ নিতম্ব দেখাল ও, 'একে দেখে মনে হয় না, কলগার্ল? মনে আছে তো, আপনার সাথে লিমিনাসে দেখা হলো আমাদের? তার আগেই এর সাথে কথা হয় আমাদের। মেয়েটাই প্রস্তাব দিয়েছিল আমাদের জন্যে অ্যাম্ফিথিয়েটারে অপেক্ষা করবে সে। আপনার দল থেকে বেরিয়ে ওর সাথে একটু বেড়াব আমরা, গল্প করব···বিশ্বাস করুন, এর মধ্যে আর অন্য কিছু নেই।'

কৌতুক ফুটে উঠল গাইডের চেহারায়। একটা হাত বাড়িয়ে দু'আঙুল দিয়ে মোনার নেগলিজি ধরল সে, তারপর সবজান্তার মত মাথা দোলাল। ফিরিয়ে নেবার আগে মোনার উন্মুক্ত নিতম্বে একবার বুলিয়ে নিল হাতটা। এলোপাতাড়ি পা ছুঁড়তে শুরু করল মোনা।

'তাই? কলগার্ল? তা কতোয় রফা হয়েছে?'

'প্রথমে দুই ড্রাকমা চেয়েছিল,' অভিযোগের সুরে বলল রানা। 'কিন্তু কাজ সারার পর বলে কিনা বিশ ড্রাকমা দিতে হবে। স্বভাবতই রাজি হইনি আমরা।'

'কেন রাজি হব?' রানার পিছন থেকে ঝাঁঝের সাথে বলল বেন। 'যা কথা হয়েছে তার চেয়ে একটা ফুটো পয়সাও বেশি দেব না। ইয়ার্কি নাকি? এ-দেশে আইন নেই?'

'অভিনয় বটে!' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল গাইড। 'কিন্তু আপনাদের কপাল খারাপ, এমন একজন লোকের চোখে পড়ে গেছেন, ফুটো খুঁজে বেড়ানোই যার কাজ। প্রথমে মেয়েটার গায়ের রঙের কথাই বলি। বড় বেশি ফর্সা। স্থানীয় মেয়েদের গায়ের রঙ এতটা সাদা হয় না। আর, এখানে কলগার্ল বলতে স্থানীয় মেয়েদেরকেই বোঝায়। আমাদের মেয়েদের কোমর আরও বড়সড়, সুগঠিত হয়, কিন্তু এরটা সরু। তাছাড়া, আমাদের মেয়েরা এ-ধরনের নেগলিজি পরে না।'

কিছু বলল না রানা। গাইডের দিকে তাকিয়ে সুযোগের অপেক্ষায় আছে। জানে, ইঙ্গিত পেলে বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে বেন। কিন্তু গ্রীক গাইডের চেহারায় পরিষ্কার লেখা রয়েছে, এ লোক বিপজ্জনক! পিস্তলের ট্রিগারে চেপে বসে আছে আঙুল। চোখে সতর্ক দৃষ্টি। দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, বিপদ আসছে দেখলে বিদ্যুৎ খেলে যাবে এর শরীরে।

'মেয়েটাকে নামান,' বলল গাইড। 'ওর বাকি অর্ধেকটা দেখব।'

গাইডের চোখের দিকে তাকিয়ে থেকেই ধীরে ধীরে মোনাকে মেঝেতে নামিয়ে দিল রানা। মেঝেতে নেমে টলমল করে উঠল মোনা। অন্ধের মত সামনে হাত বাড়িয়ে একবার এদিক, একবার ওদিক এগোল। এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়াল বেন, গিঁটটা খুলে মাথা থেকে নামিয়ে দিল নেগলিজি। এক ঝটকায় মুখের ভেতর থেকে রুমালটা বের করে ছুঁড়ে ফেলে দিল মোনা। চোখে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে তাকাল বেনের দিকে, হাত দুটো উঠে গেল কোমরের দু'পাশে।

'ইউ, ব্লাডি বাস্টার্ড!' রাগে কেঁপে উঠল মোনা। 'এসবের মানে কি?'

'সুইট হার্ট,' গোবেচারা ভঙ্গি করে বলল বেন, 'আইডিয়াটা আমার নয়।' চোখ-ইশারায় মোনার ডান পাশটা দেখাল সে। 'তোমার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করে দেখতে পারো।'

ঝট করে মাথা ঘোরাল মোনা। সেই সাথে কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রানাকে দেখে গলার ভেতর আটকে গেল আওয়াজ, হাঁ হয়ে গেল মুখ। পটলচেরা চোখ জোড়া মুহূর্তের জন্যে বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে উঠল। কিন্তু তারপরই অদ্ভুত একটা শীতল ভাব ফুটল চেহারায়। সেটাও বদলে গেল, ধীরে ধীরে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল মুখটা। আচমকা রানার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। ওর গলা জড়িয়ে ধরে চুমো খেল ঠোঁটে।

'রানা, আমি স্বপ্ন দেখছি না তো? অন্ধকারে একবার মনে হলো বটে তোমার গলা···কিন্তু ঠিক চিনতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম তোমাকে বোধহয়···মানে, আর বুঝি তোমার সাথে আমার দেখা হবে না!'

মুচকি হাসল রানা। 'তাই?'

নানা বলল, 'তুমি নাকি আর কখনও আমার খোঁজ করবে না!'

'বেরসিক নানারা এই রকম রসিকতা করেই থাকেন।'

রানার বুকে, ব্যান্ডেজের ওপর হাত বুলাল মোনা। 'আহত হলে কিভাবে?' উদ্বেগ ফুটে উঠল চেহারায়। পরমুহূর্তে ঘৃণায় জ্বলে উঠল চোখ জোড়া। 'এর জন্যে কি আমার নানা দায়ী? তোমাকে কোন রকম ভয় দেখিয়েছে নাকি?'

'আরে না!' হেসে উড়িয়ে দিল রানা। 'সিঁড়ির মাথা থেকে পা পিছলে পড়ে

গিয়েছিলাম।'

'এসবের মানেটা কি?' বিরক্তির সাথে জানতে চাইল গাইড। পিস্তল ধরা হাতটা নামতে শুরু করেছে। 'মিস, আপনার নামটা কি জানতে পারি?'

'আমি ফন হামেলের নাতনী,' গলায় বিদ্রূপের সুর টেনে বলল মোনা। 'কিন্তু আমার পরিচয়ে আপনার কি দরকার?'

বিস্ময়ের একটা আবছা ধ্বনি বেরিয়ে এল গাইডের গলা থেকে। দু'পা এগিয়ে এসে ভাল করে দেখল মোনাকে। ঝাড়া আধ মিনিট তাকিয়ে থাকার পর ধীরে ধীরে আবার পিস্তলটা তুলল সে, তাক করল রানার দিকে।

'আপনি হয়তো সত্যি কথাই বলছেন, কিন্তু,' ইঙ্গিতে রানা আর বেনকে দেখিয়ে বলল গাইড, 'এদেরকে বাঁচাবার জন্যে মিথ্যে কথা বলছেন না তাই বা বুঝব কিভাবে?'

'আপনাকে কিছুই বুঝতে হবে না!' ঝাঁঝের সাথে, গ্রীবা উঁচু করে বলল মোনা। 'ভাল চান তো কেটে পড়ুন। আমার নানার কি রকম প্রভাব আপনার তা অজানা থাকার কথা নয়। আইল্যান্ড অথরিটি তাঁর কথায় ওঠে, তাঁর কথায় বসে। তিনি চাইলে সারাজীবন জেলে পচে মরবেন আপনি।'

'মি. ফন হামেলের প্রভাব সম্পর্কে জানা আছে আমার,' ঠাণ্ডা গলায় বলল গাইড। 'কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমার ওপর তাঁর প্রভাব খাটে না। আপনাদেরকে জেলে ভরা হবে নাকি মুক্তি দেয়া হবে তা বিবেচনা করবেন আমার সুপিরিয়র, ইন্সপেক্টর বোথাস। তিনি পানাঘিয়ায় আছেন, আমার দায়িত্ব তাঁর সামনে আপনাদেরকে হাজির করা।' অ্যাম্ফিথিয়েটার থেকে বেরিয়ে যাবার পথটা ইঙ্গিতে দেখাল সে। 'ওদিকে দুশো গজ এগোলেই একটা গাড়ি দেখতে পাবেন।' রানার দিক থেকে মোনার দিকে তাক করল পিস্তল। 'সাবধান, কোনরকম বাহাদুরি দেখাতে গিয়ে প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেবেন না!' ধীরে ধীরে মোনার পিছনে চলে এল সে। 'সন্দেহ হলেই সুন্দরীর শিরদাঁড়া গুঁড়িয়ে দেব। নিন, আগে বাড়ুন।'

পাঁচ মিনিট পর গাড়ির কাছে পৌঁছুল ওরা। কালো একটা মার্সিডিজ, ফার গাছের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। ড্রাইভারের দিকের দরজাটা খোলা, হুইলের পিছনে সাদা আইসক্রীম স্যুট পরে বসে আছে একজন লোক। ওদেরকে আসতে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে পিছনের দরজাটা খুলে দিল সে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে সাথে সাথে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারল না রানা। ওর চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা হবে। নাক, চোয়ালের হাড়, চোখ, কপাল, ঠোঁট···কিছুই নিখুঁত নয়। সব মিলিয়ে কদাকার জল্লাদের চেহারা। এই রকম চওড়া কাঁধ আর কারও দেখেনি ও। দুশো ষাট থেকে আশি পাউন্ড ওজন হবে। শান্ত, নিভাঁজ মুখে হিংস্রতার ছাপ ফুটে আছে। এই লোক হাসতে হাসতে মানুষ খুন করতে পারে।

'পেরিয়াস,' লোকটাকে বলল গাইড, 'এরা তিনজন আমাদের মেহমান। ইন্সপেক্টর বোথাসের কাছে নিয়ে যাচ্ছি।' রানার দিকে ফিরল সে। 'ইন্সপেক্টর গাঁজাখুরি গল্প শুনতে ভালবাসেন, কাজেই আপনাদের দুশ্চিন্তার কিছু নেই।'

গাড়ির ব্যাক সীট দেখিয়ে ওদেরকে বলল পেরিয়াস, 'আপনারা এখানে বসবেন। আপনাদের সঙ্গিনী বসবেন সামনের সীটে, আমাদের মাঝখানে।'

চেহারার সাথে কণ্ঠস্বরটা মানিয়ে গেছে—ভারী, কর্কশ, ঝগড়াটে।

সীটে বসার আগে পর্যন্ত পালাবার ডজনখানেক প্ল্যান খেলে গেল রানার মাথায়। কিন্তু কোনটাই সুবিধের বলে মনে হলো না। মোনা সাথে রয়েছে, সেটাই সবচেয়ে বড় বাধা। সে না থাকলে গাইড এবং ড্রাইভারকে কাবু করার একটা ঝুঁকি নিতে পারত ওরা। গাইড লোকটা হয়তো মোনাকে গুলি করতে সাহস পাবে না, কিন্তু সেটা জানার জন্যে মোনার প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিতে পারে না ও।

গাড়ি স্টার্ট দিল পেরিয়াস। কৃত্রিম ভদ্রতা দেখিয়ে গাইড তাকে বলল, 'ওহে পেরিয়াস, মেয়েটার ওপর একটু সদয় হও। গায়ের কোটটা খুলে পরতে দাও বেচারীকে। একে সুন্দরী, তার ওপর খোলামেলা—অ্যাক্সিডেন্ট ঘটিয়ে বসলে তখন কি হবে?'

'আমার দিকে কেউ না তাকালেই খুশি হব,' ঝাঁঝের সাথে বলল মোনা। 'কারও গায়েরটা পরতে ঘৃণা হবে আমার।'

কাঁধ ঝাঁকাল গাইড।

গাড়ি ছেড়ে দিল পেরিয়াস। সরু, আঁকাবাঁকা রাস্তা। প্রতি মুহূর্তে ঝাঁকি খেল ওরা। ড্রাইভার আর গাইডের মাঝখানে বসে আছে মোনা। তার কানে পিস্তল চেপে ধরে পিছনে তাকিয়ে আছে গাইড, রানা আর বেনের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রেখেছে। কোন রকম ঝুঁকি নিতে রাজি নয় লোকটা।

'পেশায় গাইড, নামটা?' জানতে চাইল রানা।

'আজানডার রেনো,' ঠাণ্ডা গলায় বলল গাইড।

'জানলেন কিভাবে, ওখানে আমাদেরকে পাওয়া যাবে?'

'আগেই বলেছি, ফুটো খুঁজে বেড়ানোই আমার কাজ,' বলল রেনো। 'যখন দেখলাম গ্রুপ থেকে কেটে পড়েছেন আপনারা, তখনই বুঝলাম, নিশ্চয়ই কোন খারাপ মতলব আছে। আমার এক বন্ধু গাইডের হাতে গ্রুপটাকে ছেড়ে দিয়ে সোজা চলে এলাম অ্যাম্ফিথিয়েটারে। কিন্তু ওখানে আপনাদের দেখা পেলাম না। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের প্রতিটি ইঁট, প্রতিটি কোণ আমার চেনা। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই লোহার গেটের ভাঙা বারটা চোখে পড়ে গেল। জানতাম, এক সময় না এক সময় বেরুবেনই আপনারা, তাই পাথরের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে অপেক্ষা করছিলাম...'

'কিন্তু আমরা যদি অন্য কোন দিক দিয়ে বেরুতাম?'

'ওই টানেলের নাম হেডসের গোলকধাঁধা। ওখান থেকে বেরুবার রাস্তা ওই একটাই।'

'হেডসের গোলকধাঁধা?' কৌতূহল জাগল রানার মনে। 'কেন দেয়া হয়েছে নামটা?'

'হঠাৎ আর্কিওলজির ওপর আপনার আগ্রহ দেখে আশ্চর্যই লাগছে আমার,' কাঁধ ঝাঁকাল গাইড রেনো। 'বেশ, শুনুন। গ্রীসের তখন স্বর্ণযুগ। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা অপরাধীদের বিচার করতেন অ্যাম্ফিথিয়েটারে। নির্বাচিত একশোজন নগরবাসী ছিলেন জুরি, তাঁদেরকে বসতে দেবার জন্যেই এই লোকেশানটা বেছে নেয়া হয়েছিল। সাক্ষ্য-প্রমাণ বিবেচনা করে দেখার পর রায় ঘোষণা করা হত।

কেউ দোষী সাব্যস্ত হলে হয় তখুনি মৃত্যুদণ্ড, নয়তো হেডসের গোলকধাঁধা বেছে নিতে বলা হত তাকে।'

'এই গোলকধাঁধাকে এত ভয়ঙ্কর মনে করার কারণ কি?' জিজ্ঞেস করল বেন, রিয়ার ভিউ মিররে তাকাতেই ড্রাইভার পেরিয়াসের সাথে চোখাচোখি হয়ে গেল তার।

'একশোর ওপর প্যাসেজ আছে,' বলল রেনো, 'কিন্তু মাত্র দু'দিকে খোলা। একটা ঢোকার, আরেকটা গোপনে বেরুবার পথ।'

'তবু মুক্তি পাবার একটা সুযোগ থাকত অপরাধীর···' শুরু করল রানা।

ওকে থামিয়ে দিয়ে রেনো বলল, 'আরেকটু শুনুন, তাহলে বুঝবেন ওটা আসলে কোন সুযোগই ছিল না। টানেলের ভেতর অদ্ভুত একটা সিংহ থাকত। কালেভদ্রে দু'একটা ইঁদুর ছাড়া কিছুই জুটত না তার।'

রানার শান্ত চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল বুড়ো ফন হামেলের চেহারা। লোকটা তার রহস্যময় মতলব ঐতিহাসিক উপকরণ দিয়ে হাসিল করার চেষ্টা করছে কেন? একি স্রেফ একটা খেয়াল, বাতিক, নাকি আলাদা কোন তাৎপর্য বহন করে?

মৃদু গলায় বলল ও, 'পুরানো গল্প, শুনতে ভালই লাগে।'

'গল্প নয়!' প্রতিবাদ জানাল রেনো। 'লোকে বলাবলি করে, আজও নাকি টানেলের ভেতর অশান্ত আত্মারা ঘুরে বেড়ায়। অনেকে চিৎকার শুনেছে, কান্নার আওয়াজ পেয়েছে। এই তো মাত্র বছর কয়েক আগেও, ঢোকার পথটা লোহার গেট দিয়ে বন্ধ করা হয়নি তখনও, কৌতূহলী কিছু লোক গোলকধাঁধায় ঢুকেছিল, একজনও ফিরে আসেনি। কি হয়েছে তাদের, কেউ বলতে পারে না। বেরিয়ে আসার কোন ঘটনার কথা জানা যায়নি আজ পর্যন্ত।'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বলল রানা।

কয়েক মুহূর্ত পর মেইন রোডে উঠে এল মার্সিডিজ। রাস্তার দু'ধারে সার সার দাঁড়িয়ে আছে গাছ। গাছের পিছনে খেত-খামার। পশ্চিম দিগন্তরেখার কাছাকাছি নেমে গেছে সূর্য, আগের চেয়ে অনেক ঠাণ্ডা লাগল বাতাস। পনেরো মিনিট পর মন্থর হয়ে এল মার্সিডিজের গতি। আবার বাঁক নিল পেরিয়াস। কাঁকর ছড়ানো, উঁচু-নিচু, গ্রাম্য পথ। আবার ঝাঁকি খেতে শুরু করল গাড়ি।

গাইড রেনোর ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না রানা। গাইডই যদি হবে, তার কাছে পিস্তল থাকে কেন? পুলিসের দায়িত্ব পালন করার অধিকারই বা পেল কোথায় সে? ঘাড়ের পেছনে একটা মৃদু, আলতো স্পর্শ অনুভব করল রানা, বিশ্বস্ত বন্ধুর মত কে যেন বিপদের আভাস দিয়ে গেল।

আরও দু'বার বাঁক নিয়ে ছোট একটা খামার বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ল মার্সিডিজ। সামনেই একটা ইমারত, বয়সের ভারে যেন কুঁজো হয়ে আছে। প্লাস্টার খসে গেছে কোন্ কালেই, সারি সারি বেরিয়ে আছে লালচে ইঁট। দোতলাটা কাঠের, তারও অবস্থা ঝড়ে পড়া কাকের বাসার মত।

'এই বুঝি গ্রীক ট্যুরিস্ট অর্গানাইজেশনের হেড-অফিস?' বলেই হেসে উঠল বেন।

ঠোঁট টিপে একটু হাসল রেনো। উত্তর না দিয়ে কি যেন গোপন করে গেল সে। মনের সন্দেহটা আরও দৃঢ় হলো রানার—ওরা বোধহয় ফন হামেলের ফাঁদেই আটকা পড়তে যাচ্ছে!

গাড়ি থেকে নেমে পিছনের দরজাটা খুলে দিল রেনো। রানার মাথার দিকে পিস্তল তাক করে বলল, 'কোনরকম বাহাদুরি নয়! প্লীজ!'

নামল রানা। এগিয়ে গিয়ে সামনের দরজাটা খুলে ঝুঁকে পড়ল, হাত ধরে বের করে নিয়ে এল মোনাকে। বেরিয়ে এসেই রানার গলা জড়িয়ে ধরল মোনা, মুখটা টেনে নামিয়ে এনে চুমো খেল। মৃদু একটা ঠেলা দিয়ে তাকে সরিয়ে দিল রানা। 'পরে।'

হাততালি দিয়ে হেসে উঠল রেনো। 'চমৎকার! একেই বলে প্রেমে হাবুডুবু খাওয়া! কিন্তু তাই বলে কি লোক-লজ্জাও থাকতে নেই?'

ঝট করে রেনোর দিকে তাকাল মোনা। দু'চোখে ঘৃণা। তাচ্ছিল্যের সাথে মুখ ফিরিয়ে নিল সে।

'ইন্সপেক্টর বোথাস আপনাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন,' সবিনয়ে বলল রেনো। 'কেউ অপেক্ষা করিয়ে রাখলে তাঁর আবার মেজাজ ঠিক থাকে না। চলুন, চলুন!'

রেনো ছাড়া সবাই এগোল। পাঁচ ফুট পিছনে থাকল রেনো। সামনের দলটার দিকে পিস্তল ধরে আছে। ওদেরকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এল পেরিয়াস। মাঝারি আকারের মাঠ পেরিয়ে বারান্দায় উঠল ওরা, সেখান থেকে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে দোতলায়। ছোট একটা হলঘরে ঢুকল ওরা। হলের দু'দিকে কয়েকটা করে দরজা। বাঁ দিকের দ্বিতীয় দরজার সামনে দাঁড়াল পেরিয়াস। খুলল সেটা। ইঙ্গিতে ভেতরে ঢুকতে বলল রানা আর বেনকে। ওদের পিছু পিছু মোনাও এগোল, কিন্তু তাকে বাধা দিল পেরিয়াস।

'আপনাকে যেতে বলা হয়নি।'

ঝট করে আধ পাক ঘুরল রানা। 'আমাদের সাথেই থাকবে ও!'

'না,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রেনো। মোনার পাশ থেকে তাকাল রানার দিকে। 'হিরোইজম দেখাতে গিয়ে শুধু শুধু নিজেদের বিপদ ডেকে আনবেন না। আপনারা যদি কোন অন্যায় করে না থাকেন, ইন্সপেক্টর বোথাস আপনাদেরকে ছেড়ে দেবেন। কথা দিচ্ছি, আপনার বান্ধবীর কোন ক্ষতি হবে না।'

ঝাড়া পনেরো সেকেন্ড রেনোর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল রানা। লোকটার চেহারার শঠতা বা বেঈমানীর কোন চিহ্ন দেখল না ও। কেন যেন মনে হলো, লোকটা যা বলল তার মধ্যে সত্যতা আছে।

'ঠিক আছে,' মৃদু গলায় বলল ও। 'তোমার কথা বিশ্বাস করলাম। কিন্তু মোনার গায়ে যদি একটা টোকাও পড়ে, তোমাকে আমি নিজের হাতে খুন করব।'

'চিন্তা করো না, রানা,' দৃষ্টিতে রাজ্যের ঘৃণা নিয়ে রেনোর দিকে তাকাল মোনা। 'ফন হামেলের নাতনী আমি, আমার গায়ে হাত দেবার সাহস এই হনুমানের নেই!' একটু দম নিয়ে আবার বলল সে, 'ইন্সপেক্টর না কে যেন, আমার পরিচয়টা একবার পেতে দাও তাকে, দেখো কেমন বাপ-বাপ করে ছেড়ে দেয়।'

মোনার কথায় কান না দিয়ে পেরিয়াসের দিকে তাকাল রেনো। 'মেহমানরা কঠিন পাত্র, কাজেই সাবধান। একটু অসতর্ক হলে, প্রাণ হারাতে হতে পারে—কথাটা মনে রেখে পাহারা দাও।'

ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে পেরিয়াস বলল, 'সেটা আমাকে বলে দিতে হবে না!' হলঘরের আরেক দরজা দিয়ে মোনাকে নিয়ে গাইড রেনো বেরিয়ে যেতেই ছোট ঘরটার দরজা বন্ধ করে দিয়ে কপাটে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়াল সে। বিশাল বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে রাখল।

'এক জায়গায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে পায়চারি করা ভাল,' বলল বেন। 'কিন্তু ভয় করছে, ষাঁড়টা যদি লাফ দিয়ে গুঁতো মারতে আসে?'

'শুধু পায়চারি করার জন্যে ঝুঁকিটা নেয়া চলে না,' বলল রানা। ঘরের চারদিকে তাকাল ও। লম্বায় নয় ফুট, চওড়ায় আট ফুট, আন্দাজ করল ও। কাঠের কয়েকটা পিলারের গায়ে পেরেক দিয়ে লম্বা লম্বা তক্তা আটকে তৈরি করা হয়েছে দেয়াল। তক্তাগুলোর সাইজও এক রকম নয়, কোনটা বড়, কোনটা ছোট। বড়গুলোর প্রান্ত পিলার ছাড়িয়ে আরও খানিকদূর এগিয়ে গেছে। কোন জানালা নেই, নেই কোন ফার্নিচার। ছাদের কাছে আড়াআড়ি একটা ফাটল থেকে সামান্য একটু আলো আসছে।

'আমার অনুমান যদি মিথ্যে না হয়,' বলল রানা। 'এটা একটি পরিত্যক্ত ওয়্যারহাউস।'

'কাছাকাছি হয়েছে,' মন্তব্য করল পেরিয়াস। 'বিয়াল্লিশ সালে দ্বীপটা দখল করে এটাকে অর্ডিন্যান্স ডিপো বানিয়েছিল জার্মানরা।'

'সিগারেট আছে নাকি?' বেনকে জিজ্ঞেস করল রানা।

অন্যদিকে তাকিয়ে ছিল বেন, সেদিকে তাকিয়ে থেকেই পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে ছুঁড়ে দিল ওর দিকে। রানার যে কোন মতলব আছে, টের পেয়ে গেছে সে। জানে, সিগারেট ছেড়ে দিয়েছে রানা। রানার দিকে তাকালে পেরিয়াসও তার মুখের চেহারা দেখতে পাবে, তাই তাকালই না।

পেরিয়াসকে সিগারেট অফার করল না রানা। তাহলে সাবধান হয়ে যাবে গরিলা। এক পা পিছিয়ে এসে সিগারেট ধরাল ও। তারপর লাইটারটা বারবার শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে লুফতে শুরু করল। প্রতিবার আগের চেয়ে ওপরে ছুঁড়ে দিল। লক্ষ্য করল, চোখের কোণ দিয়ে লাইটারটাকে অনুসরণ করছে পেরিয়াস। এক, দুই, তিন, চার—ছয়বার ছুঁড়ল রানা। সাত বারের বার আঙুলের ফাঁক গলে পড়ে গেল ওটা। কাঠের মেঝেতে পড়ে খটাখট আওয়াজ তুলল। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিচু হলো রানা, হাত বাড়াল লাইটারটা ধরার জন্যে।

লাইটার নিয়ে সিধে হবে রানা, তা না হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ডাইভ দিল। উড়ে এসে পেরিয়াসের তলপেটে মাথা দিয়ে গুঁতো দিল ও। বৈদ্যুতিক শক খাওয়ার মত সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল তীব্র ব্যথা, মাথাটা যেন ইঁটের দেয়ালের গায়ে বাড়ি খেল। মুহূর্তের জন্যে আতঙ্কিত হয়ে ভাবল ও, ঘাড়টা বোধহয় মটকেই গেছে!

ফুটবল ট্রেনারের ভাষায় এটাকে রানিং রক বলে। এই ভঙ্গিতে হেড করলে গোলকীপারের সাধ্য কি বল ধরে! অপ্রস্তুত কোন লোকের পেটে আঘাতটা লাগলে

সাথে সাথে তাকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। কিন্তু পেরিয়াসের কিছুই হলো না। ক্ষীণ একটু কাতরে উঠল শুধু, ধাক্কা খেয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ল খানিক, দুই থাবা দিয়ে ধরে ফেলল রানার বাইসেপ, তারপর কাঠের মেঝে থেকে অনায়াসে ওকে তুলে ফেলল শূন্যে।

অসাড়, অবশ হয়ে গেল রানা। বিস্ময়ের ধাক্কাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি ও। যে লোকের খুন হয়ে যাবার কথা সে কিনা উল্টে ওকেই চেপে ধরেছে! ঘাড় আর হাতে এঁটে বসল পেরিয়াসের মুঠো, তীব্র ব্যথায় চোখে অন্ধকার দেখল ও। ওকে একটা কাঠের পিলারের গায়ে নিয়ে এসে ফেলল পেরিয়াস। ভাঁজ করা হাঁটু রাখল ওর তলপেটে, তারপর ওর ঘাড়ের পিছনটা ধরে নিচের দিকে চাপ দিতে শুরু করল। কাঠের পিলারের ভেতর ঢুকে যেতে চাইল রানার শিরদাঁড়া। অসহ্য ব্যথা সত্ত্বেও মাথাটা কাজ করছে এখনও। পেরিয়াসের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল ও। ওর মাথা নামিয়ে নিয়ে এসে কনুই দিয়ে ঘাড়ের ওপর গুঁতো মারবে—মারা যেতে দু'সেকেন্ডের বেশি লাগবে না ওর। আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করল রানা। সবটুকু ইচ্ছেশক্তি এক করে মুঠো পাকাল হাত দুটো, দমাদম ঘুসি চালাল পেরিয়াসের তলপেটে। আত্মরক্ষার শেষ আশাটুকু নিভে যাবার সাথে সাথে ভয়ে শিউরে উঠল রানা। ওর এরকম একটা ঘুসি খেয়ে যে কোন লোকের জ্ঞান হারাবার কথা, কিন্তু পেরিয়াস কিছু টের পেয়েছে বলেও মনে হলো না। ঝাপসা হয়ে এল রানার দৃষ্টি। বুঝল, জ্ঞান হারিয়ে ফেলবে ও।

আচমকা ঘাড়ের ওপর চাপটা হালকা হয়ে গেল। ধীরে ধীরে মাথা তুলে রানা দেখল, ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকিয়ে আছে পেরিয়াস, আটকে থাকা দম ফেলার জন্যে হাঁসফাঁস করছে। ওর তলপেট থেকে হাঁটু নামিয়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সে। পরমুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়ল বেনের ওপর।

রানা ডাইভ দিয়ে পড়ার সাথে সাথে আড়ালে পড়ে গিয়েছিল পেরিয়াস, অসহায় ভাবে অপেক্ষা করছিল বেন, কিন্তু রানাকে পেরিয়াস দেয়ালের সাথে চেপে ধরতেই সুযোগটা পেয়ে গেল সে। লাফ দিল শূন্যে, জোড়া পা দিয়ে পড়ল পেরিয়াসের কিডনির ওপর। ধারণা করেছিল, ছিটকে দেয়ালের সাথে বাড়ি খাবে পেরিয়াস! কিন্তু ঘটল ঠিক উল্টোটা। প্রচণ্ড এক দাঁত-ভাঙা ঝাঁকি খেয়ে অনেকটা টেনিস বলের মত ফেরত এল বেন, দড়াম করে পড়ল মেঝের ওপর। একমুহূর্ত স্থির ভাবে পড়ে থাকল সে, তারপর মাথা ঝাড়া দিয়ে, কনুই আর হাঁটুর ওপর ভর করে উঠে বসার চেষ্টা করল। ঘোঁৎ করে রোমহর্ষক আওয়াজ ছেড়ে ডাইভ দিল পেরিয়াস, হুড়মুড় করে পড়ল বেনের ওপর। হিংস্র এক টুকরো হাসি লেগে রয়েছে পেরিয়াসের ঠোঁটে। চোখ দুটো রক্তের তৃষ্ণায় জ্বলজ্বল করছে। দু'হাতের দশটা আঙুল পরস্পরের খাঁজে আটকে গেল, মাঝখানে আটকে আছে বেনের খুলি। চাপ দিতে শুরু করল পেরিয়াস।

দুই তালুর চাপে খুলিটা ফেটে যাবে। বুঝতে পেরে হাত-পা ছুঁড়তে শুরু করল বেন। কিন্তু ওর তুলনায় অনেক বেশি ভারী পেরিয়াস, তার শরীরের নিচ থেকে বেরুতেই পারল না সে। খুলি থেকে সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল অসহ্য ব্যথা। ধীরে ধীরে হাত তুলে পেরিয়াসের বুড়ো আঙুল দুটো মুঠোর ভেতর নিল ও, তারপর

টানতে শুরু করল নিচের দিকে। ষাঁড়ের মত প্রচণ্ড শক্তি রাখে বেন, কিন্তু যার নিচে চাপা পড়েছে তার তুলনায় নেহাতই দুর্বল শিশু সে। কাঁধ দুটো নিচু করে বেনের খুলিতে আরও জোরে চাপ দিতে শুরু করল পেরিয়াস।

নিজের পায়ে এখনও রানা দাঁড়িয়ে আছে বটে, কিন্তু লড়ার সাধ এবং শক্তি দুটোই ফুরিয়ে গেছে ওর। পিঠের ব্যথাটা উন্মাদ করে তুলল ওকে। ব্যথাটা ছড়িয়ে পড়ে অসাড় করে ফেলেছে সারা শরীর। ঝাপসা দৃষ্টিতে দেখল, পেরিয়াসের হাতে খুন হয়ে যাচ্ছে বেন। চিৎকার করে উঠল ও, কিন্তু গলা থেকে কোন আওয়াজ বেরুল না। উদ্‌ভ্রান্তের মত এদিক ওদিক তাকাল ও। কাঠের পিলারের সাথে সেঁটে থাকা একটা তক্তা, পেরেক খসে যাওয়ায় তেরছা ভাবে ঝুলছে সিলিং থেকে। টলতে টলতে সেদিকে এগোল ও। তক্তাটা ধরে টানাটানি শুরু করল ও। তক্তার ওপরের দিকটায় এখনও পেরেক আছে, সেগুলো ঢিলে হতে বেশ সময় নিল। চার ফুটের মত লম্বা ওটা, এক ইঞ্চি চওড়া। পেরেক মুক্ত হয়ে হাতে চলে এল সেটা। বেন এখনও বেঁচে আছে তো? ঘুরে দাঁড়িয়ে মাথার ওপর তক্তাটা তুলল রানা। শরীরের সবটুকু শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনল পেরিয়াসের মাথায়।

খুলির সাথে তক্তার সংঘর্ষে বিদঘুটে একটা আওয়াজের সাথে পেরিয়াসের মগজ বেরিয়ে পড়বে বলে আশা করেছিল রানা। নিদেন পক্ষে খুলি ফেটে রক্তের ফোয়ারা তো ছুটবে! ওসব কিছুই ঘটল না। জানালার ভঙ্গুর কাঁচের মত টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল উই খাওয়া কাঠ। ঘাড় না ফিরিয়ে, বেনের খুলি ছেড়ে দিল পেরিয়াস। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে রানার গায়ে ধাক্কা দিল সে। ধাক্কাটা কোমরে লাগল, ছিটকে পড়ল রানা মেঝের ওপর, সেখান থেকে গড়াতে গড়াতে দরজার কাছে গিয়ে থামল।

দরজার নব ধরে কিভাবে উঠে দাঁড়িয়েছে বলতে পারবে না ও। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে মাতালের মত দুলতে থাকল। কিছুই খেয়াল করতে পারল না। অসাড় হয়ে আছে শরীর, ব্যথা পর্যন্ত অনুভব করল না। বুকের ব্যান্ডেজ চুঁইয়ে রক্ত বেরিয়ে আসছে, সেদিকেও খেয়াল নেই। তাকিয়ে আছে বেনের দিকে। দু'হাতের মাঝখানে আবার ধরেছে তার মাথাটাকে পেরিয়াস। নীল হয়ে গেছে বেনের মুখ। চোখ দুটো বিস্ফারিত। হঠাৎ উপলব্ধি করল ও, বেন মারা গেছে অথবা তার মারা যেতে আর বেশি দেরি নেই। বন্ধুর জন্যে হাহাকার করে উঠল বুকের ভেতরটা। ইচ্ছে হলো, লাফ দিয়ে পড়ে, টিপে ধরে পেরিয়াসের টুঁটি। কিন্তু জানে, তাতে কোন লাভ হবে না।

বুঝল, মাত্র একটা সুযোগ পাবে ও। শেষ সুযোগ। বিদ্যুৎ চমকের মত মনে পড়ে গেল ট্রেনিং পিরিয়ডে শেখানো একটা কৌশলের কথা। ট্রেনার লোকটা কে ছিল, এখন তা আর মনে নেই, কিন্তু তার কথাগুলো স্পষ্ট মনে আছে।...'দি বিগেস্ট, টাফেস্ট, মীনেস্ট সান-অফ-এ-বীচ ইন দা ওয়ার্ল্ড উইল অলওয়েজ গো ডাউন, অ্যান্ড গো ডাউন ফাস্ট, ফ্রম এ গুড সুইফট কিক ইন দ্য বলস্।'

টলতে টলতে পেরিয়াসের পিছনে চলে এল রানা। বেনের খুলি ফাটাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে আছে পেরিয়াস, পিছনে রানার উপস্থিতি টেরই পেল না। লক্ষ্যস্থির করে পেরিয়াসের দুই উরুর মাঝখানে লাথি চালাল রানা। পায়ের আঙুলগুলো হাড়

আর রাবারের মত নরম কিছুর সাথে ধাক্কা খেল। বেনকে ছেড়ে দিয়ে প্রকাণ্ড হাত দুটো মাথার ওপর তুলল পেরিয়াস, আঙুলগুলো বাতাস খামচাতে শুরু করল। পরমুহূর্তে দড়াম করে পড়ল মেঝের ওপর। নিঃশব্দে গোঙাতে শুরু করল সে কুঁকড়ে গিয়ে।

বেনকে ধরে বসিয়ে দিল রানা। 'বেন? বেন?'

'বেঁচে আছি?' ক্ষীণ, দুর্বল একটু হাসি ফুটল বেনের ঠোঁটে। 'তুমি, রানা, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড?'

'তোমার সাথেই আছি আমি,' বলল রানা। 'মাথার কি অবস্থা?'

'না দেখে বলি কি করে? মনে হচ্ছে নেই ওটা।'

'আছে,' আশ্বস্ত করল রানা। 'ঘাড়ের ওপর দেখতে পাচ্ছি।'

পেরিয়াসের দিকে তাকাল রানা। ঘন ঘন হাঁপাচ্ছে দৈত্যটা, সাদা হয়ে গেছে মুখের চেহারা, সটান শুয়ে আছে মেঝের ওপর, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে উরু-সন্ধি।

বেনকে উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করল রানা। 'ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনটা সুস্থ হয়ে ওঠার আগেই কেটে পড়ি চলো।'

রানার কথা শেষ হতেই দরজা খুলে গেল। লম্বা, একহারা গড়নের একজন লোক ঢুকল ঘরের ভেতর। চোখ দুটো বিষণ্ণ, দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে আছে টোবাকো পাইপ, ট্রাউজারের পকেটে ঢুকে আছে একটা হাত। রানার দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা। কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে মুখ থেকে পাইপটা নামাল সে।

'আমি ইন্সপেক্টর বোথাস,' মার্জিত, পরিশীলিত আমেরিকান ইংরেজীতে বলল আগন্তুক। 'জানতে পারি, কি হচ্ছে এখানে?'

দুই

এটা ঠিক আশা করেনি রানা। উচ্চারণ ভঙ্গি, নিখুঁতভাবে আঁচড়ানো ছোট ছোট চুল, কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই পরিচয় দেবার রীতি, সব মিলিয়ে বুঝতে অসুবিধে হয় না ইন্সপেক্টর বোথাস একজন আমেরিকান।

ঝাড়া দশ সেকেন্ড রানা আর বেনকে দেখল বোথাস। তারপর ধীরে ধীরে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল মেঝেতে পড়ে থাকা পেরিয়াসের দিকে। এখনও গোঙাচ্ছে পেরিয়াস। তাকে দেখে ইন্সপেক্টরের চেহারায় কোন পরিবর্তন ঘটল না, কিন্তু সে যে বিস্মিত হয়েছে সেটা ফাঁস হয়ে গেল তার গলার আওয়াজে।

'দেখেও বিশ্বাস করতে পারছি না,' চোখ তুলে প্রথমে রানা, তারপর বেনের দিকে তাকাল সে। চেহারায় প্রশংসা এবং কৌতূহলের মিশেল লক্ষ্য করার মত। 'ট্রেনিং পাওয়া সেরা প্রফেশন্যালরাও পেরিয়াসের গায়ে টোকা দিতে পারে না। তাজ্জব ব্যাপার! ম্যাজিক জানেন নাকি? আপনাদের পরিচয়?'

কিছু বলতে যাচ্ছিল বেন, এই সময় ঘরে ঢুকল গাইড রেনো। পেরিয়াসকে

দেখে মুখটা ঝুলে পড়ল তার, স্তম্ভিত বিস্ময়ে পালা করে একবার রানা, তারপর বেন, তারপর পেরিয়াসের দিকে তাকাল সে। সবশেষে ফিরল ইন্সপেক্টরের দিকে।

'মাই ইন্সপেক্টর, আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি না তো?' বিড় বিড় করে জানতে চাইল সে।

রেনোর দিকে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করল না ইন্সপেক্টর। পাইপের ছাই ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'পেরিয়াসের যত্ন নাও। এই দুই কাপ্তানকে অফিসে নিয়ে যাচ্ছি আমি, দেখি চাবুকে ওদের ঘাড়ের ভূত নামানো যায় কিনা।'

'পেরিয়াসের এই অবস্থা করেছে দেখেও কি উচিত হবে, স্যার···?'

সরু ঠোঁট জোড়া নিঃশব্দে ফাঁক করে হাসল ইন্সপেক্টর। 'গায়ের জোর খাটিয়ে এখন যে আর কোন লাভ নেই তা আশা করি বুঝতে পেরেছেন ওঁরা। তবে, সাবধানের মার নেই।' ইঙ্গিতে রানাকে দেখাল সে। 'দেখে মনে হচ্ছে ইনিই হিরো, হ্যান্ডকাফের একটা কড়া ওর কব্জিতে পরাও।' তারপর বেনকে দেখিয়ে বলল, 'আরেকটা কড়া ওর কনুইয়ে আটকাও।'

বেল্টের ক্লিপ থেকে একজোড়া হ্যান্ডকাফ খুলে সামনে বাড়ল রেনো। কড়া ভাষায় কিছু বলতে যাচ্ছিল রানা, কিন্তু ক্ষান্ত হলো পকেট থেকে ইন্সপেক্টরের হাতটা বেরিয়ে আসতে দেখে। অটোমেটিক পিস্তলটা সোজা রানার দিকে তাক করে ধরল বোথাস।

হ্যান্ডকাফ পরাতে গিয়ে কোন বাধার সামনে পড়তে হলো না রেনোকে। বেনের চেয়ে ইঞ্চি কয়েক লম্বা রানা, তার ওপর ওর কব্জি আর বেনের কনুইয়ে কড়া লাগানোর ফলে বেনকে সামনের দিকে কুর্নিশ করার ভঙ্গিতে ঝুঁকে থাকতে হলো। ছাদের লম্বা ফাটলে চোখ রেখে রানা দেখল, রোদ পিছুতে শুরু করায় এরই মধ্যে ম্লান হয়ে এসেছে আকাশ। পিঠটা এখনও ব্যথা করছে ওর, কিন্তু বেনের মত ওকেও সামনের দিকে ঝুঁকে থাকতে হচ্ছে না বলে কৃতজ্ঞ বোধ করল ও। কাঁধ দুটো উঁচু-নিচু করল বার কয়েক, প্রতিবার ব্যথায় বিকৃত হয়ে উঠল মুখের চেহারা। তারপর ইন্সপেক্টর বোথাসের দিকে ফিরল ও।

শান্ত সুরে জানতে চাইল, 'মোনা কোথায়?'

'ভালই আছে,' বলল ইন্সপেক্টর। 'বলছে মি. ফন হামেলের নাতনী! খোঁজ নিয়ে দেখি, যদি সত্যি হয় ছেড়ে দেয়া হবে।'

'আমাদের কি হবে?' জানতে চাইল বেন।

'সময় হলে বলব।' ইঙ্গিতে দরজা দেখাল ইন্সপেক্টর।

রানার দিকে অনুমতির জন্যে তাকাল বেন। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল রানা।

দু'মিনিট পর ইন্সপেক্টর বোথাসের অফিসে ঢুকল ওরা। মাঝারি আকারের কামরা, কিন্তু নিপুণ হাতে গুছানো। দেয়ালে টাঙানো রয়েছে থাসোসের এরিয়াল ফটোগ্রাফ। ডেস্কের উল্টোদিকে একটা টেবিল, তাতে তিনটে টেলিফোন, একটা শর্টওয়েভ রেডিও। চারদিকে তাকিয়ে একটু অবাকই হলো রানা। সব কিছু বড় বেশি সাজানো-গোছানো, বড় বেশি প্রফেশন্যাল।

'দেখে মনে হচ্ছে একজন জেনারেলের কমান্ড হেডকোয়ার্টার,' বলল ও। 'পুলিস পুলিস গন্ধ পাচ্ছি না কেন?'

ডেস্কের পেছনে রিভলভিং চেয়ারে বসল ইন্সপেক্টর, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে উঠল সেটা। 'আপনাদের পরিচয়?'

'মাসুদ রানা। ডাইরেক্টর অভ স্পেশাল প্রজেক্টস, ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার মেরিন এজেন্সী। সাথে বেন নেলসন, আমার অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! এবং আমি হলাম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী···' কথার মাঝখানে থেমে গেল বোথাস। দ্রুত কপালে উঠল একটা ভুরু। ডেস্কের ওপর ঝুঁকে পড়ল সে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল রানার চোখে। 'আরেকবার বলুন তো! কি যেন বললেন আপনার নাম?' বিস্মিত এবং কোমল শোনাল তার গলা।

'মাসুদ রানা।'

একটানা দশ সেকেন্ড নড়ল না ইন্সপেক্টর, কথাও বলল না। তারপর চেয়ারে হেলান দিল সে। 'নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছেন আপনি···'

'তাই নাকি?'

চেয়ারের ওপর আবার সিধে হয়ে বসল ইন্সপেক্টর। 'আপনি রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চীফ?'

'আমিই।'

'তাহলে অপারেশন ফাইভ-ও-ফাইভ জিনিসটা কি ব্যাখ্যা করে বলুন আমাকে!' চ্যালেঞ্জের সুরে জানতে চাইল বোথাস।

'গতবছরের ঘটনা। কিউবা হয়ে ফ্লোরিডায় হিরোইনের বড় একটা চোরাচালান আসছিল। খবরটা রানা ইনভেস্টিগেশন জানতে পারে। আমরা সি.আই.এ.-কে জানাই। আলোচনা করে ঠিক করা হয় সাগরে থাকতেই হিরোইনসহ জাহাজটাকে আটক করতে হবে। খবরের উৎস রানা ইনভেস্টিগেশন, এ-ধরনের অপারেশনে আমাদের অভিজ্ঞতাও আছে, তাই আমাদেরকে অংশ গ্রহণের জন্যে অনুরোধ জানানো হয়। ফেডারেল ব্যুরো অফ নারকোটিকসের চারজন অপারেটর আর রানা ইনভেস্টিগেশন এজেন্সীর চারজন এজেন্টকে নিয়ে তৈরি করা হয়···' পাঁচ মিনিট এক নাগাড়ে বলে গেল রানা।

'থাক, থাক—আমি সন্তুষ্ট!' আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত তুলে হেসে ফেলল ইন্সপেক্টর বোথাস। 'কিন্তু মি. রানা, এই থাসোসে আপনি কি করছেন?'

'তার আগে আপনার পরিচয়, মি. বোথাস?' বলল রানা। 'আপনি গ্রীক তো ননই, এমনকি পুলিস কিনা সে-ব্যাপারেও ঘোরতর সন্দেহ আছে আমার।'

'তারও আগে,' রানা থামতেই মুখ খুলল বেন, 'আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করার দাবি জানাচ্ছি। কিছু মনে করবেন না ইন্সপেক্টর, আমার ব্লাডার ফুলে-ফেঁপে ফেটে যাবার মত অবস্থায় পৌঁছে গেছে। এখুনি যদি ওটা খালি করার ব্যবস্থা না হয়, এই অফিসেই একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তখন আমাকে দায়ী করতে পারবেন না!'

নিঃশব্দে হাসল রানা। 'শুধু মুখে বলছে তা মনে করবেন না,' ইন্সপেক্টরকে বলল ও। 'করেও দেখাবে।'

ভুরু কুঁচকে দু'জনের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর কাঁধ ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। তারপর ডেস্কে বসানো একটা বোতামে চাপ দিল।

প্রায় সাথে সাথে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল রেনো। হাতে উদ্যত পিস্তল। 'ওদের শায়েস্তা করতে হবে, মাই ইন্সপেক্টর?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'পিস্তলটা সরাও। ভদ্রলোকদের হ্যাণ্ডকাফ খুলে দাও। তারপর মি. বেন নেলসনকে বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে এসো।'

চোখ কপালে উঠে গেল রেনোর। 'আপনি ঠিক জানেন, স্যার···?'

'যা বলছি করো। এনারা আমাদের বন্দী নন, অতিথি।'

আর কোন কথা না বলে, চেহারায় প্রকাশ্যে কোন রকম বিস্ময়ের ভাব না ফুটিয়ে পিস্তলটা কোমরের হোলস্টারে গুঁজল রেনো। হ্যাণ্ডকাফ খুলে বেনকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল বাইরে।

'এবার আমার প্রশ্নের জবাব দিন,' বলল রানা। 'ফাইভ-ও-ফাইভের কথা আপনি কোত্থেকে জানলেন?'

'ফেডারেল ব্যুরো অফ নারকোটিকসের একজন ইন্সপেক্টর আমি,' বলল বোথাস। 'আমার নাম হারকিউলিস বোথাস। যে চারজন লোককে আপনি ব্যুরো অফ নারকোটিকস থেকে দলে পেয়েছিলেন আমিই তাদেরকে বাছাই করেছিলাম। গোটা অপারেশনের নেপথ্যে ছিলাম আমি, সেই সূত্রেই আপনাদের সবার পরিচয় জানতে হয়েছিল আমাকে।'

সমস্ত সন্দেহ দূর হয়ে গেল রানার মন থেকে। পরম স্বস্তি বোধ করল ও।

'এবার বলবেন কি, আপনি থাসোসে কেন?'

'নুমার চীফ ডাইরেক্টর অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন এখানে পাঠিয়েছেন আমাদের,' বলল রানা। 'রিসার্চ শিপ ব্লু লিডারে কিছু স্যাবোটাজের ঘটনা ঘটেছে, সেটা তদন্ত করে দেখার জন্যে।'

'ব্লু লিডার? হ্যাঁ, হ্যাঁ—দেখেছি বটে! ব্র্যাডি ফিল্ডের ওদিকে নোঙর ফেলে আছে, সাদা একটা জাহাজ?'

'হ্যাঁ,' বলল রানা। 'কিন্তু আপনি দেশের বাইরে এখানে কি করছেন?'

'মাসখানেক আগে আমরা ইন্টারপোলের কাছ থেকে একটা রিপোর্ট পেলাম—ম্যাকাও বন্দরে বিরাট হিরোইনের শিপমেন্ট লোড করা হয়েছে একটা ফ্রেটারে···'

বাধা দিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ওটা কি ফন হামেলের জাহাজ?'

অবাক দেখাল ইন্সপেক্টর বোথাসকে। 'আপনি কিভাবে জানলেন?'

মুচকি হাসল রানা। 'স্রেফ অনুমান! বাধা দেবার জন্যে দুঃখিত। বলে যান।'

'হ্যাঁ, ওটা মুনমুন লাইন্সেরই একটা জাহাজ। নাম, ডলফিন। ম্যাকাও বন্দর ছেড়ে রওনা হয়েছে তিন হপ্তা আগে। কাগজ-পত্রে যা বলা হয়েছে তাতে বোঝার উপায় নেই ওতে কোন বেআইনী কার্গো আছে। সয়াবিন, চা, কাগজ, কার্পেট এই সব।'

'ডেসটিনেশন?'

'ফার্স্ট পোর্ট অভ কল সিলোনের কলম্বো। ওখানে কার্গো নামিয়ে তোলা হবে নতুন কার্গো—কোকো আর গ্র্যাফাইট। এরপর ফুয়েল স্টপ মার্সেইলি, সবশেষে সেন্ট লরেন্স সীওয়ে হয়ে শিকাগো।'

একমুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'শিকাগো কেন? নিউ ইয়র্ক, বোস্টন কিংবা অন্য যে-কোন ইস্টার্ন সীবোর্ড পোর্টে স্মাগলারদের সুবিধে বেশি। ফরেন ড্রাগ শিপমেন্ট আনলোড করার জন্যে ওসব জায়গায় নিজেদের সংগঠন আছে ওদের।'

'শিকাগো নয় কেন?' পাল্টা প্রশ্ন করল ইন্সপেক্টর। 'যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ডিসট্রিবিউশন, সবচেয়ে বড় ট্রান্সপোর্টেশন সেন্টার তো ওখানেই। একশো ত্রিশ টন হিরোইন পাচার করার জন্যে এরচেয়ে ভাল জায়গা আছে আর?'

রানার চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'অসম্ভব! অতবড় একটা চালান কাস্টমসের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে না।'

'আর কেউ পারুক বা না পারুক, ফন হামেল পারে,' নিচু গলায় বলল ইন্সপেক্টর। 'লোকটা সম্পর্কে কিছু জানেন, মি. রানা? স্মাগলারদের শিরোমণি ও। এ লাইনে একটা প্রতিভা। ফন হামেল ওর আসল নাম হতেই পারে না।'

'আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে ফন হামেলকে আপনি শতাব্দীর সবচেয়ে কুখ্যাত ভিলেন বলে ধরে নিয়েছেন,' বলল রানা। 'কি এমন করেছে সে যে তাকে এই দুর্লভ সম্মান দিচ্ছেন?'

'এশিয়া, আফ্রিকা, সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার কথা ধরুন। বিপ্লব আর অভ্যুত্থানের নামে গত ত্রিশ বছর ধরে রক্তের নদী বয়ে যাচ্ছে ওই সব মহাদেশে। অথচ ইউরোপ থেকে গোপন অস্ত্রের চালান না গেলে ঘটনাগুলো ঘটত না। উনিশশো চুয়ান্ন সালের গ্রেট স্প্যানিশ গোল্ড রবারির কথা মনে আছে? স্পেনের অর্থনীতি আগে থেকেই টলমল করছিল, এই সময় মিনিস্ট্রি অভ ট্রেজারীর গোপন ভল্ট থেকে বিরাট পরিমাণ সরকারী সোনা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় তার অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়ে যায়। এর কিছুদিন পরই স্পেনের প্রতীক চিহ্ন আঁকা গোল্ড বারে ভারতের ব্ল্যাক মার্কেট ছেয়ে যায়। অতবড় একটা কার্গো সাত হাজার মাইল পাড়ি দিল কিভাবে? ব্যাপারটা আজও একটা রহস্য হয়ে আছে। কিন্তু আমরা জানি, চুরির রাতে মুনমুন লাইন্সের একটা ফ্রেটার বার্সেলোনা ছেড়ে যায়, এবং ভারতে সোনার বার ছড়িয়ে পড়ার কয়েকদিন আগে নোঙর ফেলে বোম্বাইয়ে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে টোবাকো পাইপে আগুন ধরাল ইন্সপেক্টর। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল সিলিঙের দিকে। তারপর শুরু করল আবার।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়, জার্মানীর আত্মসমর্পণের দিন, পঁচাশি জন উঁচু পদের নাজী অফিসার হঠাৎ করে বুয়েন্স আইরেসে উদয় হয়। ওখানে তারা পৌঁছুল কিভাবে? আবার সেই একই ঘটনা। সেদিন একমাত্র যে জাহাজটা বন্দরে ভিড়েছিল সেটা ছিল মুনমুন লাইন্সেরই একটা ফ্রেটার। আরেকটা ঘটনার কথা বলি। উনিশশো চুয়ান্ন সাল, ইতালির নেপলস, পিকনিকে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে গেল স্কুল বাস ভর্তি কিশোরী মেয়ের দল। চার বছর পর ইতালিয়ান দূতাবাসের একজন সহকারী হারানো মেয়েদের একজনকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কাসাব্লাঙ্কার নোংরা পল্লীর গলিতে ঘুরে বেড়াতে দেখেছিল।' প্রায় মিনিটখানেক চুপ করে থাকল বোথাস,

তারপর নিচু গলায় বলল, 'মেয়েটাকে পাগল বললেই হয়। আমি তার শরীরের ফটো দেখেছি। যে-কোন সুস্থ লোককে পাগল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট।'

'কথা বলতে পেরেছিল?'

'হ্যাঁ। তার শুধু মনে আছে, ফানেলে বিরাট আকারের জোড়া এম লেখা একটা জাহাজে তোলা হয় তাকে। এই কথাটারই শুধু অর্থ করা গেছে, বাকি যা বলেছে প্রলাপ ছাড়া কিছু নয়।'

অফিসরুমের ভেতর নিস্তব্ধতা নেমে এল। অনেকক্ষণ পর মুখ খুলল রানা।

'তারমানে কিশোরী মেয়ে কেনাবেচার সাথেও জড়িত ছিল মুনমুন লাইন্স?'

'ইনডাইরেক্টলি ফন হামেলকে জড়ানো যায় এমন একশো ঘটনার মধ্যে মাত্র চারটের কথা বললাম আপনাকে। ইন্টারপোলের ফাইলে যা লেখা আছে সেগুলো যদি পড়ে শোনাতে চাই, মাসখানেকের আগে শেষ করতে পারব না।'

'এই সব ক্রাইমের হোতা ফন হামেল, বলতে চাইছেন?'

'না, তা নয়। পরিকল্পনার সাথে তার কোন সম্পর্কের কথা জানতে পারিনি আমরা। তার কাজ ক্রিমিন্যালদের ট্রান্সপোর্টেশন সাপ্লাই দেয়া। সে আসলে স্মাগলার। গ্র্যান্ড স্কেলে চালায় ব্যবসাটা।'

কিছুটা রাগ, কিছুটা বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠল রানার চেহারায়। 'শয়তানটাকে তাহলে থামানো হয়নি কেন?'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর বোথাস। 'দুনিয়ার প্রায় সমস্ত ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সী ফন হামেলকে ধরার চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রতিটি ফাঁদ কৌশলে এড়িয়ে গেছে সে। মুনমুন লাইন্সে যে ক'জন এজেন্টকে ঢোকানো হয়েছে তাদের সবাই হয় খুন, নয়তো গায়েব হয়ে গেছে। তার প্রতিটি জাহাজ হাজার বার করে সার্চ করা হয়েছে, বেআইনী কিছুই পাওয়া যায়নি।'

বোথাসের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে এঁকেবেঁকে, সেদিকে অলস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে রানা বলল, 'এতটা চালাক কেউ হতে পারে? মানুষ মাত্রেই ভুল করে, কাজেই তাকে ধরাও সম্ভব।'

'বিশ্বাস করুন, চেষ্টার ত্রুটি করিনি আমরা! ল' এনফোর্সমেন্ট এজেন্সীগুলো একজোট হয়ে মুনমুন লাইন্সের প্রতিটি জাহাজের প্রতিটি ইঞ্চি পরখ করেছে, রাতদিন চব্বিশ ঘণ্টা ধরে মাসের পর মাস অনুসরণ করেছে, ডক থেকে সারাক্ষণ চোখ রেখেছে, ইলেকট্রনিক ডিটেকশন গিয়্যারের সাহায্যে সার্চ করা হয়েছে প্রতিটি বাল্কহেড।' একটু থেমে আবার বলল ইন্সপেক্টর, 'কম করেও বিশজন ইনভেস্টিগেটরের নাম জানাতে পারি আপনাকে, সবাই প্রথম শ্রেণীর, যারা ফন হামেলকে গ্রেফতার করাটাকেই তাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে।'

'এসব কথা আমাকে জানাবার কারণ, মি. বোথাস?'

'কারণ, আমি মনে করি আপনি আমাদের সাহায্য করতে পারেন।'

'কিভাবে?'

বাঁকা একটু হাসি বোথাসের মুখে ফুটে উঠেই দ্রুত মিলিয়ে গেল। 'দেখেশুনে বুঝেছি, ফন হামেলের নাতনীর সাথে আপনার সুসম্পর্ক আছে। ঠিক?'

চুপ করে থাকল রানা।

'কদ্দিন থেকে জানেন ওকে?' জানতে চাইল ইন্সপেক্টর।

'কালই প্রথম সৈকতে দেখা হয়েছে ওর সাথে আমার।'

অবিশ্বাসের হাসি ফুটে উঠল ইন্সপেক্টরের মুখে। 'অসম্ভব!'

উঠে দাঁড়াল রানা। মাথার ওপর হাত তুলে আড়মোড়া ভাঙল। 'যা খুশি বলতে পারেন। কিন্তু যা ভাবছেন ভুলে যান।'

'আমার ভাবনাটা আপনি ধরে ফেলেছেন, মি. রানা?'

'আপনি চাইছেন, মোনার সাথে আমার সম্পর্কটাকে পুঁজি করে আমি যেন ফন হামেলের বিশ্বস্ত হয়ে ওঠার চেষ্টা করি, এই তো? তাতে ওদের পরিবারের একজন হয়ে উঠতে পারব, ওদের ভিলায় যাওয়া আসা করতেও আমার কোন বাধা থাকবে না, ঠিক?'

'ঠিক। এবং ফন হামেলের ভিলায় বন্ধুবেশে ঢুকতে পারলে তার গতিবিধির ওপর নজর রাখতে পারবেন আপনি।'

'ভুলে যান!'

'জানতে পারি, কেন? বাধাটা কোথায়?'

মুচকি হাসল রানা। 'কাল রাতে ফন হামেলের সাথে ডিনার খেয়েছি আমি। আমাদের মধ্যে যে বন্ধুত্ব হবার নয়, সেটা বেশ বোঝা গেছে। আমার পেছনে কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল।'

'নাতনীর সাথে প্রেম, নানার সাথে ডিনার—একই দিনে? অবাক করলেন আমাকে!'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা।

'ভিলার ওপর দূর থেকে নজর রেখেছি আমরা,' বলল ইন্সপেক্টর। 'কিন্তু অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়েনি। ফন হামেলের সন্দেহ না জাগিয়ে ভিলার দুশো গজ কাছাকাছি যেতে পেরেছি আমরা। কর্নেল রেনো আপনাদেরকে গ্রেফতার করেছে শুনে আমি ভেবেছিলাম ফন হামেলকে কোণঠাসা করার একটা সুযোগ বোধহয় পাওয়া গেল।'

'কর্নেল রেনো? কর্নেল?'

'হ্যাঁ, কর্নেল রেনো। সে আর ক্যাপ্টেন পেরিয়াস গ্রীক সিক্রেট পুলিসের লোক। গাইডের ছদ্মবেশে কাজ করছে কর্নেল, ভিলার ওপর নজর রাখার জন্যে।'

খানিক চুপ করে থেকে জানতে চাইল রানা, 'এদের সাথে আপনার উপস্থিতির কারণটা বলবেন কি?'

'একটু খুলে বলতে হয় তাহলে। মনে রাখতে হবে, ফন হামেল সাধারণ কোন কেস নয়। তাকে চোদ্দ শিকের ভেতর আটকে আমরা যদি তার স্মাগলিঙের ব্যবসা বন্ধ করতে পারি, সাথে সাথে ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম শতকরা বিশ ভাগ কমে যাবে। ইন্টারন্যাশনাল ক্রাইম যেখানে প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে, সেখানে বিশ পার্সেন্ট কমে যাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়।'

একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল ইন্সপেক্টর। 'অতীতে রাষ্ট্রগুলো আলাদা আলাদা ভাবে কাজ করত। ডাইটাল ইনফরমেশন আদান-প্রদানের জন্যে চ্যানেল

হিসেবে ব্যবহার করা হত ইন্টারপোলকে। একটা উদাহরণ দিই। ধরুন, নারকোটিকস ব্যুরোর গোপন সূত্র থেকে আমি জানলাম, বেআইনী একটা ড্রাগের চালান ইংল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। কি করব আমি? ইন্টারপোল লন্ডনকে জানিয়ে দেব তথ্যটা, তারাই সতর্ক করে দেবে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডকে। সময় থাকতে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড একটা ফাঁদ পাতবে, এবং কিছু স্মাগলারকে গ্রেফতার করবে।'

'চমৎকার অ্যারেঞ্জমেন্ট।'

'কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় ফন হামেলের বেলায় এই অ্যারেঞ্জমেন্ট কোন কাজে লাগেনি। অনেকবার ইন্টারপোলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, হাজার বার ফাঁদ পাতা হয়েছে, সার্চ করা হয়েছে মুনমুন লাইন্সের জাহাজ, কিন্তু প্রতিবারই ফাঁদ গলে বেরিয়ে গেছে ফন হামেল। এই সব দেখে আমাদের সরকার উদ্যোগী হয়ে একটা ইন্টারন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন টীম গঠনের প্রয়াস পান। প্রচুর ক্ষমতা দেয়া হয় টীমটাকে। যে-কোন বর্ডার টপকাতে পারব আমরা, যে-কোন দেশের পুলিস ফ্যাসিলিটি গ্রহণ করতে পারব, যে-কোন দেশের সামরিক বাহিনীর লোকজন, ইকুইপমেন্ট এবং প্রয়োজনে কমান্ডোর সাহায্য নিতে পারব।' আবার একটু বিরতি নিল ইন্সপেক্টর বোথাস, তারপর বলল, 'আশা করি আমার উপস্থিতিটা আমি ব্যাখ্যা করতে পেরেছি?'

'টীমের আর সব সদস্য? আপনাদের মাত্র তিনজনকে দেখছি আমি।'

'এই মুহূর্তে একজন ব্রিটিশ ইন্সপেক্টর একটা রয়্যাল নেভীর ডেস্ট্রয়ার নিয়ে অনুসরণ করছে মুনমুন লাইন্সের ডলফিনকে। সেই সাথে, আনমার্কড একটা ডিসি-থ্রী নিয়ে আকাশ থেকে ওটার ওপর নজর রাখছে টার্কিশ পুলিস ব্যুরোর একজন প্রতিনিধি। ফ্রেঞ্চ পুলিসের দু'জন ডিটেকটিভ মার্সেই ডক-ওয়ার্কারের ছদ্মবেশে অপেক্ষা করছে, রিফুয়েলিঙের জন্যে ডলফিন ওখানে পৌঁছুলে সেটার নজর রাখবে ওরা।'

গত দু'দিনে মাত্র দু'চার ঘণ্টা ঘুমিয়েছে রানা, জ্বালা করছে চোখ দুটো। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখের পাতা রগড়ে একটা হাই তুলল ও। তারপর বলল, 'মি. বোথাস, আমার একটা ব্যক্তিগত অনুরোধ আছে।'

'বলুন?' ভুরু কুঁচকে উঠল ইন্সপেক্টরের।

'আমি চাই মোনাকে, আপনি আমার হাতে তুলে দেন।'

'আপনার হাতে তুলে দেব?' বোথাসের ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটল। 'কেন, তাকে নিয়ে আপনার কোন প্ল্যান আছে নাকি?'

'আমার হাতে তুলে না দিলে, এমনিতেও ওকে আপনার ছেড়ে দিতে হবে। আর একবার ছাড়া পেলে, ভিলায় ফিরে যেতে বিশ মিনিটের বেশি লাগবে না তার। আরও কম সময় নেবে নানাকে উত্তেজিত করে তুলতে। ফন হামেল নিজের চামড়া বাঁচাবার জন্যেই কলকাঠি নাড়তে শুরু করবে, এবং ফলশ্রুতিতে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আপনাদের ছোট আন্ডারগ্রাউন্ড স্পাই নেটওয়র্ক থাসোস থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হতে বাধ্য হবে।'

'আপনি আমাদেরকে ছোট করে দেখছেন, মি. রানা,' গম্ভীর সুরে বলল বোথাস। 'আমরাও জানি এ-ধরনের ঝামেলায় পড়তে হতে পারে। সে-ধরনের

ইমার্জেন্সী দেখা দিলে কি করতে হবে তারও প্ল্যান তৈরি করা আছে। এই আস্তানা ছেড়ে সকালের মধ্যেই নতুন কাভার নিয়ে কাজ শুরু করতে পারব আমরা।'

'তাতে লাভটা কি?' বলল রানা। 'ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই যাবে। ফন হামেল জানতে পারবে, তার ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। আপনারা নতুন কাভার নিতে পারেন, এটুকু বোঝার ক্ষমতা তার আছে। কাজেই চারগুণ সতর্ক হয়ে যাবে সে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে রানার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বোথাস বলল. 'হুঁ। আপনার কথায় যুক্তি আছে।'

চুপ করে থাকল রানা।

অবশেষে জানতে চাইল বোথাস, 'মোনাকে আপনার হাতে ছেড়ে দিলাম, তারপর?'

'মোনার যখন খোঁজ পড়বে অথচ তাকে পাওয়া যাবে না, গোটা থাসোস ওলোটপালোট করে ছাড়বে ফন হামেল। ওকে লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা ব্লু লিডার। ওখানে খোঁজ করার কথা ফন হামেলের মাথায় খেলবে না, অন্তত যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে বুঝছে যে মোনা দ্বীপে নেই।'

রানার দিকে এমন ভাবে তাকিয়ে থাকল ইন্সপেক্টর যেন জীবনে এই প্রথম দেখছে ওকে। এই ধরনের জটিল এবং বিপজ্জনক একটা ঝুঁকি কেন নিতে চাইছে রানা সেটা তার ঠিক বোধগম্য হলো না। ফন হামেলের মত নিষ্ঠুর এবং ক্ষমতাশালী লোকের সাথে লাগলে পরিণামে যে অকাল মৃত্যু ঘটতে পারে তা কি ভদ্রলোক বুঝতে পারছেন না?

কিন্তু মনে মনে খুশিই হলো বোথাস। একজন সাহসী এবং বুদ্ধিমান লোকের সাহায্য দরকার তার। বলল, 'ঠিক আছে। কিন্তু মোনা রাজি হবে কেন?'

'রাজি হবে এই জন্যে যে ইন্টারন্যাশনাল ড্রাগস স্মাগলিং ছাড়াও তার মাথায় অন্যান্য চিন্তা-ভাবনা আছে,' মুচকি হেসে বলল রানা। 'বুড়ো নানার সাথে আরেকটা নীরস, একঘেয়ে বিকেল কাটাবার চেয়ে আমার ঘাড়ে চেপে সাগরে ডুবতেও আপত্তি করবে না ও। তাছাড়া, আমার ধারণা, একটু-আধটু অ্যাডভেঞ্চার দুনিয়ার সব মেয়েই পছন্দ করে।'

বেনকে অনুসরণ করে ঘরে ঢুকল রেনো। বেনের হাতে গ্রীক বিয়ারের কয়েকটা বোতল দেখে চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা। একগাল হাসল বেন। 'বুঝলে, রানা, লোক হিসেবে আফটার অল খারাপ নয় এরা। অতিথি-সেবার নিয়ম-টিয়ম মোটামুটি জানা আছে। অনেক খুঁজে পেতে কর্নেল রেনো এগুলো বের করলেন আমাদের জন্যে।'

ডেস্কের ওপর চারটি গ্লাস রাখল রেনো।

'পেরিয়াস কেমন আছে?' জানতে চাইল রানা।

'নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে বটে,' বলল রেনো, 'কিন্তু দিনকয়েক খোঁড়াতে হবে তাকে।'

'তাকে বলবেন, আমরা দুঃখিত।'

মুখের সামনে মাছি তাড়াবার ভঙ্গিতে হাত ঝাপটা দিয়ে ইন্সপেক্টর বোথাস

বলল, 'দুঃখ প্রকাশ করার কোন দরকার নেই। আমাদের লাইনে এরকম ঘটেই থাকে।' হঠাৎ লক্ষ্য করল রানার শার্টে রক্ত। 'পেরিয়াস নামের দৈত্য আপনার সামনে দাঁড়াতে পারেনি, তাহলে কে সে যে আপনাকে জখম করতে পারে?'

রেনোর হাত থেকে বিয়ারের গ্লাস নিয়ে মুচকি হাসল রানা। 'ফন হামেলের কুকুর।'

নিঃশব্দে, সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল ইন্সপেক্টর। ফন হামেলের ওপর রানার ঘৃণার কারণ কিছুটা বুঝতে পারল সে। সেই সাথে স্বস্তিবোধ করল। বুঝল, ওর মনে দাউ দাউ করে জ্বলছে সেক্স নয়, প্রতিশোধের আগুন। পাইপে টান দিয়ে বলল, 'জাহাজে বসেই যাতে ফন হামেলের গতিবিধি সম্পর্কে খবর পান তার ব্যবস্থা করা যাবে। আমাদের কাছে রেডিও আছে।'

'গুড,' বলল রানা। 'আরেকটা উপকার চাইব, মি. ইন্সপেক্টর। আপনার নিজের অফিশিয়াল স্ট্যাটাস ব্যবহার করে জার্মানীতে দুটো মেসেজ পাঠাতে হবে।'

'অফকোর্স। কি মেসেজ বলুন।'

এরই মধ্যে ডেস্কের একধার থেকে প্যাড আর পেন্সিল টেনে নিয়েছে রানা। 'নাম ঠিকানা সহ সব লিখে দিচ্ছি আমি,' বলল ও। 'কিন্তু আমার জার্মান শব্দের বানান দু'একটা ভুল হতে পারে। চোখে পড়লে শুধরে নেবেন।' মেসেজ লেখা শেষ করে প্যাডটা ইন্সপেক্টরের দিকে উল্টো করে ঠেলে দিল ও। 'বলবেন, উত্তর যেন ব্লু লিডারে পাঠায়। নুমার রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী টুকে দিয়েছি।'

প্যাডের ওপর চোখ বুলাল বোথাস। 'আপনার মোটিভটা কিন্তু বুঝতে পারলাম না।'

'বলতে পারেন, আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ছি,' গ্লাসে চুমুক দিল রানা। 'ভাল কথা, থাসোসকে ঘুরে যাবার জন্যে কখন পৌঁছুবে ডলফিন?'

'আ-আপনি কথাটা জানলেন কিভাবে?'

'আমি সাইকিক,' গম্ভীর সুরে বলল রানা। 'কখন?'

'কাল সকালে। ভোর চারটে থেকে পাঁচটার মধ্যে কোন এক সময়। কিন্তু এ-কথা জানতে চাইছেন কেন?'

'কোন কারণ নেই, স্রেফ কৌতূহল।'

কিন্তু রানার চোখের দৃষ্টি দেখে ইন্সপেক্টর বোথাস আন্দাজ করল শুধু কৌতূহল নয়, কারণও আছে। যদিও কারণটা অনুমান করতে পারল না সে।

তিন

ভোরের আলো ফুটতে দেরি আছে। ছোট ছোট ঢেউ আর মৃদুমন্দ বাতাস লেগে মাঝারি আকারের একটা কাঠের বাক্স দুলছে সাগরে।

ধীরে ধীরে থামতে শুরু করল ডলফিন। খাড়াভাবে ওপর-নিচে ওঠানামা করছে তার বো, অন্ধকারে ফসফরাসের মত জ্বলছে ফেনা। বাক্সটার কাছ থেকে একশো

ফুট দূরে নিশ্চল হয়ে গেল জাহাজ। ঝনঝন আওয়াজ তুলে দশ ফ্যাদম পানির নিচে নেমে গেল নোঙর। পরমুহূর্তে নিভে গেল নেভিগেশনের সবগুলো লাইট, রেখে গেল কালো রঙের জাহাজ-আকৃতির একটা ছায়া, আরও ঘন কালো সাগরের বুকে। হঠাৎ যেন ভোজবাজির মত অদৃশ্য হয়ে গেল ডলফিন। অন্তত তাই মনে হলো রানার।

সাধারণ একটা কাঠের বাক্স, দুনিয়ার সমস্ত সাগর আর জলপথে হাজারে হাজারে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। বাক্সটার গায়ে স্টেনসিল হরফ দিয়ে লেখা রয়েছে—'দিস এন্ড আপ'। সাথে একটা তীর চিহ্ন আঁকা। সেটা নিচের দিকে, সাগর-তলা নির্দেশ করছে। সাগরে ভেসে বেড়ানো এ-ধরনের সব বাক্সই খালি হয়, কিন্তু এটার ভেতর মানুষ আছে।

হঠাৎ একটা বড় ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে ঝাঁকি খেল বাক্সটা, বেশ খানিকটা লোনা পানি ঢুকল রানার নাকে। খক খক করে কেশে পানিটুকু বের করে দিল ও। ভাবল, এরচেয়ে ভাল উপায় আর হয় না। দিনের আলো ফুটলে ওর এই খোলসটাকে দেখতে পাওয়া যাবে, কিন্তু ওকে কেউ দেখতে পাবে না।

ফ্লোটেশন ভেস্টের মাউথপীসে ফুঁ দিয়ে আরও কিছু বাতাস ভরল ও। বাক্সের গায়ে ছোট একটা ফুটো তৈরি করা আছে, সেটায় চোখ রেখে জাহাজটার দিকে তাকাল।

স্থির হয়ে আছে কালো আকৃতি। জেনারেটরের মৃদু গুঞ্জন আর খোলে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ আওয়াজ শুনে ওটার অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। অনেক, অনেকক্ষণ ধরে শোনার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু আর কোন শব্দ ঢুকল না কানে। ডেকে পায়ের আওয়াজ নয়, ব্রিজ থেকে কোন পুরুষের গলা নয়, মেশিনারির কোন ধাতব ঘড়ঘড় নয়, কিচ্ছু না! অবাক কাণ্ড, এই ভৌতিক নিস্তব্ধতার মানেটা কি?

স্টারবোর্ডের দিকের নোঙরটা ফেলা হয়েছে পানিতে, বাক্সটাকে সেদিকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেল রানা। বাতাস আর স্রোত সাহায্য করল ওকে। কয়েক মুহূর্ত পরই নোঙরের চেইনের সাথে মৃদু ঘষা খেল বাক্স। ইউ.এস. এয়ারট্যাংক খুলে ফেলল ও, সেটার ব্যাকপ্যাক ওয়েবিং জোড়া লাগাল স্টীল চেইনের একটা লিঙ্কের সাথে। তারপর রেগুলেটর সিঙ্গেল হোসটাকে একটা লাইন হিসেবে ব্যবহার করে ফিন, মাস্ক এবং স্নরকেল আটকে নিল, গোটা প্যাকেজটা ঝুলতে থাকল সারফেসের ঠিক নিচে। চেইনটা ধরে ওপর দিকে তাকাল ও। অসংখ্য লিঙ্ক, ক্রমশ ওপর দিকে উঠে গিয়ে হারিয়ে গেছে অন্ধকারে। মোনার কথা মনে পড়ে গেল ওর। ব্লু লিডারের একটা বাঙ্কে ঘুমাচ্ছে সে। তার শরীরের কোমল স্পর্শ এখনও যেন লেগে রয়েছে ওর গায়ে। আনচান করে উঠল মনটা। নিজেকেই জিজ্ঞেস করল, মোনাকে ফেলে রেখে এখানে কি ছাই করছে ও?

জিজ্ঞেস করেছিল মোনাও, কিন্তু অন্য প্রসঙ্গে। 'আমাকে জাহাজে নিয়ে যাবে কেন?' রসুনের খোসার মত পাতলা নেগলিজির হেম তুলে দেখিয়েছিল রানাকে। 'আমাকে এটা পরে ঘুরে বেড়াতে দেখলে মেধাবী বিজ্ঞানীদের মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে, তখন?'

মোনার অনাবৃত উরুর দিকে চোখ রেখে বলেছিল রানা, 'একসাথে এতগুলো

লোকের মাথা খারাপ করে দেবার সুযোগ আর কখনও পাবে তুমি?'

'আমার প্রিয় নানাজী কি ভাববেন?'

'ফিরে গিয়ে বলবে, মার্কেটিং করার জন্যে মেইনল্যান্ডে গিয়েছিলে। যা খুশি বলতে পারো। তোমার বয়স একুশ পেরিয়ে গেছে।'

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠেছিল মোনা। 'তবে একটা কথা ঠিক—অবাধ্য হওয়ার মধ্যে দারুণ মজা! বিশ্বাস করো, নানা কি রকম রণমূর্তি ধরবে ভাবতে গিয়ে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে আমার। অথচ ভিলায় ফিরে যেতে একটুও ইচ্ছে করছে না!'

মোনার প্রতিক্রিয়া মোটামুটি এই রকম হবে তা রানাও আশা করেছিল। কোন ঝামেলা হলো না দেখে মনে মনে স্বস্তি বোধ করেছিল ও।

চেইন ধরে ওপরে উঠতে শুরু করল রানা, ঠিক যেন নারকেল পাড়ার জন্যে গাছ বেয়ে উঠছে। রেইলের নিচে পৌঁছে উঁকি দিল ও। ছায়ার ভেতর কিছু নড়ে কিনা, কোথাও কোন শব্দ হয় কিনা লক্ষ্য করল। অন্ধকার আগেই সয়ে গেছে চোখে, ফোরডেকটা নির্জন মনে হলো। কোন শব্দ পেল না।

রেইল টপকে ডেকে নামল ও। নিঃসাড় পড়ে থাকল ঝাড়া এক মিনিট। কোন চল্লাফেরা না, কোন হাঁকডাক না, ফিসফাস না, নড়াচড়া না—শান্ত, স্থির এবং নির্জন। উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে ফোরমাস্টের দিকে এগোতে শুরু করল ও। কোন আলো জ্বলছে না, সেটা ওর জন্যে আশীর্বাদ হয়ে দেখা দিল। কার্গো লোডিং ল্যাম্পটা অন করা থাকলে মিডশিপ আর ফোরডেক সাদা আলোয় দিনের মত উজ্জ্বল হয়ে থাকত। অন্ধকার বলেই পিছনে ফেলে আসা পানির ফোঁটাগুলো কারও নজরে পড়বে না। একবার থামল ও, কান পাতল। আপন মনে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল। নিশ্চয়ই কোথাও কোন ঘাপলা আছে। এই রকম হয় নাকি? একটা আওয়াজ নেই, একটু নড়াচড়া নেই। আরও কি যেন একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার আছে, কিন্তু সেটা যে কি ঠিক বলতে পারল না ও।

গোড়ালির কাছে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রয়েছে ডাইভার'স নাইফ, ঝুঁকে সেটা খুলে নিল রানা। স্টার্নের দিকে এগোল ও। ছুরির সাত ইঞ্চি লম্বা পাতটা ধরে রাখল নিজের সামনে।

ব্রিজটা পরিষ্কার দেখতে পেল ও। আশ্চর্য, কেউ নেই! মই বেয়ে ধীরে ধীরে উঠে এল। হুইলহাউসে কোন মানুষ বা আলো নেই। হুইলটাকে একা, নিঃসঙ্গ লাগল। লেখাগুলো পড়তে পারল না রানা, কিন্তু পয়েন্টারের অ্যাঙ্গেল দেখে বুঝতে পারল টেলিগ্রাম দাঁড়িয়ে আছে অল স্টপে। তারার ক্ষীণ আলোয় দেখল পোর্ট উইন্ডোর নিচে, লেজের সাথে একটা র‍্যাক জোড়া লাগানো রয়েছে। হাতড়াতে শুরু করল ও। অলডিস ল্যাম্প, ফ্লেয়ার গান আর ফ্লেয়ারের স্পর্শ পেল আঙুলে। তারপরই প্রসন্ন হলো ভাগ্য। সিলিন্ডার আকৃতির স্পর্শ পেয়ে বুঝল, এটা একটা ফ্ল্যাশলাইট। সুইমট্রাঙ্ক থেকে বেরিয়ে এল ও, সেটা দিয়ে লাইটের লেন্সটা জড়াল ভাল করে, তারপর অন করল সুইচ। আলোর ক্ষীণ একটু আভা বেরুল শুধু। এরপর হুইলহাউসের প্রতিটি ইঞ্চি চেক করল ও—ডেক বাল্কহেড, ইকুইপমেন্ট। কন্ট্রোল কনসোলের খুদে ইন্ডিকেটর লাইট ছাড়া আর কিছু জ্বলছে না।

হুইলহাউসের পিছনে চার্টরুম, পর্দাগুলো নামিয়ে রাখা হয়েছে। সবকিছু পরিষ্কার, ঝকঝকে। চার্টের স্তর আর স্তূপগুলো সুন্দর ভাবে গোছানো। চৌকো ঘর আর সংখ্যাগুলো পেন্সিল দিয়ে নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে চার্টে। ঝুঁকে পড়ল রানা, স্ট্র্যাপে রেখে দিল ছুরিটা। ব্রাউন'স নটিক্যাল অ্যালম্যানাকের ওপর ফ্ল্যাশলাইটের আলো ফেলে চার্ট মার্কিং পরীক্ষা করল। ম্যাকাও থেকে যে কোর্স ধরে আসার কথা ঠিক সেই কোর্স ধরেই এসেছে ডলফিন, অন্তত মার্কিঙের রিডিং দেখে তাই ধরে নিতে হয়। রানা লক্ষ করল, কমপাস কারেকশনের দায়িত্বটা যেই পালন করে থাকুক, কোথাও কোন ভুল বা কাটাকুটি হয়নি তার। বড় বেশি নিখুঁত, বড় বেশি নিপুণ।

লগ বুকটা খোলা রয়েছে। লাস্ট এন্ট্রির ওপর চোখ বুলাল রানা।—ও থ্রী পয়েন্ট ফিফটি টু আওয়ার্স—ব্র্যাডি ফিল্ড বীকন বিয়ারিং থ্রী হানড্রেড টুয়েলভ ডিগ্রী, অ্যাপ্রোক্সিমেটলি এইট মাইলস্। উইন্ড সাউথওয়েস্ট, টু নটস। দি গডস প্রটেক্ট মুন-মুন। উল্লেখ করা সময় থেকে জানা গেল, এই এন্ট্রি লিপিবদ্ধ করা হয়েছে তীর থেকে রানা সাঁতার শুরু করার এক ঘণ্টারও কম সময় আগে। তাহলে ক্রুরা সবাই গেল কোথায়? ডেক ওয়াচের কোন চিহ্ন পর্যন্ত নেই, অথচ ডেভিটে সবগুলো লাইফবোট বাঁধা রয়েছে। পরিত্যক্ত হুইলের কোন ব্যাখ্যাই মেলে না। কিছুরই কোন ব্যাখ্যা মেলে না!

শুকিয়ে খরখরে কাগজের মত হয়ে গেল রানার মুখের ভেতরটা। হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে মাথার ভেতর, চিন্তায় বাধা সৃষ্টি করছে। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এল ও, পিছনে হাত নিয়ে গিয়ে নিঃশব্দে বন্ধ করে দিল দরজা। সরু একটা প্যাসেজ, সেটা ধরে ক্যাপ্টেনের কেবিনে চলে এল। খোলাই ছিল দরজাটা। প্রথমে উঁকি দিয়ে দেখে নিল ভেতরটা। কেউ নেই দেখে ভেতরে ঢুকল।

সিনেমার সাজানো একটা সেটের মত লাগল ভেতরটা। অত্যন্ত যত্নের সাথে গুছিয়ে রাখা হয়েছে সব। দরজার উল্টো দিকের বাল্কহেডের মাথায় কাঁচা হাতে আঁকা একটা অয়েল পেইন্টিঙ ঝুলছে। ডলফিনের হুবহু প্রতিকৃতি। শিল্পীর রঙ নির্বাচন দেখে শিউরে উঠল রানা। রক্তলাল সাগরের বুকে ছুটে চলেছে জাহাজ। পেইন্টিঙের ডান কোণে একজন জ্যাকুলিন সুসান সই করেছে। ডেস্কের ওপর সস্তাদরের একটা ফ্রেম, ফটোর মেয়েটা গোলগাল চেহারার, দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না সাধারণ একজন গৃহিণী। ফটোর নিচের দিকে গোটা গোটা অক্ষরে ইংরেজীতে লেখা—টু দ্য ক্যাপ্টেন অভ মাই হার্ট ফ্রম হিজ লাভিং ওয়াইফ। কোন সই নেই, কিন্তু হাতের লেখা দেখে বোঝা যায় অয়েল পেইন্টিঙে এই মেয়েই সই করেছে। ফটোগ্রাফের পাশে একটা অ্যাশট্রে, পাশে একটা টোবাকো পাইপ। পাইপটা তুলে নাকের সামনে ধরল রানা। বুঝল, মাস কয়েক তামাক ভরা হয়নি। কেবিনের চারদিকে চোখ বুলাল ও। আরও অনেক কিছু রয়েছে, কিন্তু দেখে মনে হয় কোনটাই নাড়াচাড়া বা ব্যবহার করা হয়নি। এটা যেন একটা মিউজিয়াম, কিন্তু কোথাও এক কণা ধুলো জমেনি। অথবা, এটা যেন একটা ঘর, যার কোন গন্ধ নেই।

প্যাসেজে ফিরে এসে পিছনের দরজা বন্ধ করে দিল রানা। 'কে ওখানে?'

অথবা 'এখানে আপনি কি করছেন?' অপরিচিত, গম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর থেকে এই ধরনের কোন প্রশ্ন শুনতে পাবে বলে আশা করল ও, কিন্তু না! শব্দহীন, নির্জনতা ওর স্নায়ুর ওপর চেপে বসছে। ঠাণ্ডা ঘামের ধারা অনুভব করল পিঠে। ছায়া ঢাকা কোণে কারা দাঁড়িয়ে রয়েছে বলে সন্দেহ হতে শুরু করল। হার্টবিটের গতি বেড়ে গেছে। এক চুল নড়ল না ও, নিঃসাড় দাঁড়িয়ে থেকে শান্ত, স্বাভাবিক হয়ে ওঠার চেষ্টা করল।

আরেকটু পরই সকাল হয়ে যাবে, ভাবল ও। জলদি! জলদি! পোর্ট প্যাসেজ ধরে ছুটল ও। নিজেকে আর গোপন করার চেষ্টা করল না। এক দুই করে কয়েকটা কেবিনের দরজা খুলল। ছোট ছোট প্রতিটি কমপার্টমেন্টই যেন এক একটা লাশহীন কবর। ফ্ল্যাশলাইটের নিয়ন্ত্রিত ক্ষীণ আলোয় সবগুলো পরীক্ষা করল ও। ক্যাপ্টেনের কেবিনের সাথে কোন অমিল নেই। রেডিও কেবিনে চলে এল ও। ছুঁয়ে দেখল ট্রান্সমিটারটা এখনও গরম, ভি-এইচ-এফে সেট করা রয়েছে। কিন্তু রেডিও অপারেটর রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ। দরজা পেরিয়ে এসে স্টার্নের দিকে এগোল রানা।

কম্প্যানিয়নওয়ে, পোর্ট, স্টারবোর্ড অ্যালিওয়ে—সবই যেন একটা অন্ধকার টানেলের অংশ। কোত্থেকে কোথায় যাচ্ছে, খেয়াল করতে পারল না রানা। একটা বাল্কহেডের সাথে ধাক্কা লাগল। হাত ফস্কে পড়ে গেল ফ্ল্যাশলাইট। 'দুত্তোরী ছাই!'

শক্ত ডেকে পড়ে ভেঙে গেছে ফ্ল্যাশলাইটের লেন্স। নিভে গেছে ওটা। হামাগুড়ি দিয়ে এদিকওদিক হাতড়াতে শুরু করল ও। কয়েক সেকেন্ড পর অ্যালুমিনিয়াম-প্লেটের কেসটা হাতে ঠেকল। কাঁচের টুকরোগুলো কাপড়ের ভেতর কিচমিচ করে উঠল। সুইচটা সামনের দিকে ঠেলে দিল ও। ফোঁস করে বেরিয়ে এল স্বস্তির নিঃশ্বাস। বাল্বটা জ্বলল, কিন্তু আলো বড় ম্লান। প্যাসেজের সামনে তাক করল আলোটা। একটা দরজা দেখল ও। গায়ে লেখা রয়েছে—ফায়ার প্যাসেজ, নাম্বার থ্রী হোল্ড।

হোল্ডে নেমে চারদিকে তাকাল রানা। কাঠের ফ্রেমের ভেতর চটের বস্তা ছাড়া দেখার কিছু নেই। ডেক থেকে হ্যাচ কাভার পর্যন্ত উঁচু। মিষ্টি একটা গন্ধ পেল ও। বুঝল, সিলোন থেকে জাহাজে তোলা কোকো আছে বস্তাগুলোয়। ডাইভার'স নাইফের ডগা দিয়ে একটা বস্তা ফুটো করল ও। ঝুরঝুর করে ডেকে পড়তে শুরু করল শক্ত দানা। ফ্ল্যাশলাইটের ম্লান আলোয় দানাগুলো পরীক্ষা করল ও। অন্য কিছু নয়, কোকোই।

হঠাৎ একটা আওয়াজ পেল রানা। ক্ষীণ এবং অস্পষ্ট, কিন্তু শব্দ যে তাতে কোন সন্দেহ নেই। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ও। যেমন হঠাৎ শুরু হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই থেমে গেল। আরও অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল ও। যেন ওকে শায়েস্তা করার জন্যেই অটুট হয়ে থাকল নিস্তব্ধতা।

হোল্ডে আর কিছু দেখার নেই, বেরিয়ে এসে ইঞ্জিনরুমের দিকে এগোল রানা। ইঞ্জিনরুমে যাবার নির্দিষ্ট কম্প্যানিয়নওয়েটা খুঁজে পেতে মূল্যবান আটটা মিনিট ব্যয় হয়ে গেল। ইঞ্জিনের উত্তাপ আর গরম তেলের গন্ধে জ্যান্ত হয়ে আছে জাহাজের

হৃৎপিণ্ড। প্রকাণ্ড, প্রাণহীন মেশিনারির ওপর, ক্যাটওয়াকে দাঁড়িয়ে থাকল ও। মানুষের নড়াচড়া, কিংবা তার কোন রকম অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় কিনা লক্ষ করছে। ফ্ল্যাশলাইটের আলোয় অসংখ্য পাইপ দেখা গেল, বাল্কহেডের ওপর দিয়ে জ্যামিতিক সমান্তরাল রেখা তৈরি করে এগিয়েছে, শেষ হয়েছে এক দঙ্গল ভালভ আর গজের ভেতর। তেল চটচটে ভাঁজ করা একটা র‍্যাগের ওপর আলো ফেলল ও। সেটার ওপর একটা শেলফ, তাতে কফির দাগ লাগা কাপ দেখা গেল। বাঁ দিকে একটা ট্রে, তাতে ছড়ানো রয়েছে টুলস, সবগুলোয় কালি মাখা আঙুলের ছাপ লেগে রয়েছে। অন্তত জাহাজের এই অংশে কেউ ছিল! অদ্ভুত একটা স্বস্তি বোধ করল ও। জানে, ইঞ্জিনরুম সাধারণত হাসপাতালের বিছানার মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা হয়, কিন্তু এটা ঠিক তার উল্টো।

চীফ ইঞ্জিনিয়র আর তার অয়েলম্যান···কোথায় তারা? ঈজিয়ানের বাতাসে কর্পূরের মত তারা তো আর উবে যেতে পারে না! কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, উবেই গেছে।

বেরিয়ে আসবে রানা, এই সময় থমকে দাঁড়াল। আবার শোনা গেল সেটা। মনে হলো, খোল থেকে উঠে আসছে আওয়াজটা। দম বন্ধ করে রেখে শোনার চেষ্টা করল ও। বিদঘুটে একটা শব্দ। ডুবো পাহাড়ের চূড়ার সাথে জাহাজের খোল ঘষা খেলে এই রকম আওয়াজ হতে পারে। কোন কারণ নেই, নিজের অজান্তেই শিউরে উঠল রানা। সেকেন্ড দশেক থাকল আওয়াজটা। ধাতুর সাথে ধাতুর ঘষা লাগার শব্দ হলো, পরমুহূর্তে আবার সব নিস্তব্ধ।

ইচ্ছে হলো, ছুটে পালায়। কিন্তু পায়ে জোর পেল না ও। ধীরে ধীরে এগোল। ডেকে উঠে আসতে তিন মিনিট লেগে গেল ওর।

ভোর এখনও অন্ধকার। আকাশে মিটমিট করছে তারা। ইতিমধ্যে কখন যেন থেমে গেছে বাতাস। ব্রিজের ওপর রেডিও মাস্টটা ছায়াপথের দিকে বেঁকে আছে। রানার পায়ের নিচে, স্রোতের টানে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ করছে খোল। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল ও, তাকিয়ে থাকল থাসোস উপকূলের ঘন কালো রেখার দিকে। মাত্র মাইল খানেক দূরে ওটা। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে এসে রেলিঙের নিচে, কালো পানির দিকে তাকাল ও। সাগর যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

ফ্ল্যাশলাইটটা জ্বলছে দেখে নিজেকে তিরস্কার করল রানা। খোলা ডেকে বেরিয়ে আসার আগেই অফ করা উচিত ছিল ওটা। নিভিয়ে দিল আলো। তারপর সাবধানে, টুকরো কাঁচ লেগে যাতে হাত কেটে না যায়, ধীরে ধীরে ভাঁজ খুলল সুইম-ট্রাঙ্কের। লেন্সের টুকরোগুলো একটা একটা করে সরাল ও, ফেলে দিল সাগরে।

হাতঘড়ি দেখে আঁতকে উঠল রানা। চারটে বেজে তেরো মিনিট! প্রায় ছুটতে ছুটতে হুইলহাউসে ফিরে এল ও। ব্রিজে ঢুকে র‍্যাকের ওপর যেখান থেকে নিয়েছিল সেখানে রেখে দিল ফ্ল্যাশলাইটটা। তারপর বেরিয়ে এল ছুটে। দিনের আলো ফোটার আগেই জাহাজ থেকে নেমে ডাইভিং গিয়ার পরে নিয়ে অন্তত দু'শো গজ দূরে সরে যেতে হবে ওকে।

ফরওয়ার্ড ডেকটা আগের মত নির্জন, অন্তত কাউকে দেখতে পেল না রানা।

ঝাপটাঝাপটির একটা আওয়াজ শুনে ছ্যাঁৎ করে উঠল বুক। বিদ্যুৎ খেলে গেল শরীরে, এক ঝটকায় ছুরিটা হাতে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল ও। মনে হলো, বুকের ভেতর ড্রাম পেটাচ্ছে কেউ। এই শেষ মুহূর্তে কারও চোখে ধরা পড়লে তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু হতে পারে না।

কিছু না, একটা সী-গাল। অন্ধকার থেকে উড়ে এসে একটা ভেন্টিলেটরে বসেছে। ঘাড় বাঁকা করে রানার দিকে সপ্রশ্ন চোখে তাকিয়ে থাকল পাখিটা। কোন বিপদ নয় দেখে স্বস্তি বোধ করল রানা, সেই সাথে হাঁটুর কাছে দুর্বল লাগল। নিজের কাছে স্বীকার করল ও, খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম! রেলিঙের গায়ে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। একটু দম নিয়ে টপকাল সেটা, নোঙরের চেইন ধরে নামতে শুরু করল পানির দিকে। বাহু বাড়িয়ে দিয়ে সাগর ওকে টেনে নিল বুকে।

সুইমট্রাঙ্ক ডাইভিং গিয়্যার পরে নিতে এক মিনিটের বেশি লাগল না ওর। পিঠে অ্যাকুয়ালাঙ ফিট করার আগে সেটা একবার চেক করে নিতেও ভুল করল না। চারদিকে তাকিয়ে কাঠের বাক্সটা খুঁজল ও। স্রোতের টানে ভেসে গেছে সেটা। হয়তো খুব বেশি দূর যায়নি, কিন্তু অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না।

ডলফিনের খোলের নিচেটা পরীক্ষা করে দেখবে কিনা ভাবল রানা। ইঞ্জিনরুমে থাকতে ঘষা লাগার মত যে আওয়াজটা পেয়েছিল সেটা বোধহয় প্লেটিঙের বাইরে, কীলের নিচে কোথাও থেকেই এসেছিল। তারপরই মনে পড়ল, সাথে আন্ডারওয়াটার লাইটের ব্যবস্থা নেই, কিছুই দেখতে পাবে না। কীলের গায়ে ধারাল গুগ্‌লি-শামুক সেঁটে আছে, অন্ধকারে হাতড়াতে গিয়ে রক্তাক্ত হবার কোন মানে হয় না। তাছাড়া, রক্তের গন্ধ পেয়ে হাঙরও ছুটে আসতে পারে। না, ঝুঁকিটা নেয়া চলে না।

আচমকা সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল রানার। মৃদু একটা গুঞ্জন ঢুকল কানে। কিসের আওয়াজ বুঝতে না পেরে অস্থির হয়ে উঠল ও। তারপর বুঝল, কোত্থেকে আসছে ওটা।

আবার চালু করা হয়েছে জাহাজের জেনারেটর। রানাকে চমকে দিয়ে পরমুহূর্তে জ্বলে উঠল নেভিগেশন লাইট। এবং সেই সাথে শোনা গেল নানা ধরনের আওয়াজ, চোখের পলকে জ্যান্ত হয়ে উঠল জাহাজ। রেগুলেটরের মাউথপীস দাঁতের মাঝখানে আটকে নিয়ে জাহাজের কাছ থেকে সরে যেতে শুরু করল ও। পায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে ফিন চালাল। কালো পানি, সামনের কিছুই দেখতে পেল না। প্রায় পঞ্চাশ গজের মত সরে এসে পানির ওপর মাথা তুলল ও, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল পিছন দিকে।

ডলফিনের এখানে সেখানে সাদা আলো জ্বলে উঠেছে। কয়েক মুহূর্ত আর কিছু লক্ষ করল না রানা। তারপর, কোন রকম সিগন্যাল বা কমান্ড ছাড়াই, ঝন ঝন শব্দে তুলে নেয়া হলো নোঙর। জ্বলে উঠল হুইলহাউসের আলো। দূর থেকেও ভেতরটা পরিষ্কার দেখতে পেল ও। এখনও খালি। এ হতে পারে না। কথাটা মনে মনে বারবার আওড়াল ও। শান্ত সাগরের ওপর দিয়ে টেলিগ্রাফের ঝন ঝন আওয়াজ ভেসে এল। জ্যান্ত হয়ে উঠল ইঞ্জিন। ক্ষণস্থায়ী বিরতির পর আবার তার যাত্রা শুরু করল ডলফিন। তার স্টীল প্লেটের ভেতরে কোথাও এখনও লুকিয়ে রাখা আছে

বেআইনী কার্গো।

চলে যাচ্ছে ডলফিন। সেটার দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকল রানা। জানে, উত্তর গোলার্ধের অর্ধেক মানুষকে মাতাল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট হিরোইন আছে ওতে, অথচ তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার কোন হদিশ করতে পারেনি ও।

নিজের কথা ভাবতে শুরু করল রানা। গোলাপী অ্যালব্যাট্রস ধ্বংস করতে পেরেছে বলে বা কারও চোখে ধরা না পড়ে ডলফিনকে সার্চ করতে পেরেছে বলে গর্ব অনুভব করল, তা নয়। নিজের কথা ভাবতে গিয়ে ব্যর্থতার গ্লানি অনুভব করল ও। বুঝতে পারল, ডলফিনের লোকেরা বোকা বানিয়েছে ওকে। অপমানে জ্বালা করে উঠল শরীর। আবছা ভোরের আলোর সাথে পাল্লা দিয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে জাহাজটা, এরইমধ্যে একটা দুটো করে অদৃশ্য হতে শুরু করেছে তার আলো। তীরের দিকে এগোল ও। সৈকতে উঠছে, এই সময় দিগন্তরেখার ওপর উঁকি দিল সূর্য। থাসোসের পাথুরে পাহাড়চূড়াগুলো রোদ লেগে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

ট্যাঙ্ক খুলে ব্রিদিং রেগুলেটর, মাস্ক এবং স্নরকেলের পাশে নরম বালিতে রেখে দিল রানা। ধপ করে বসে পড়ল ও। সাংঘাতিক ক্লান্ত। কিন্তু মনের ভেতর ইঞ্জিন চালু, ভাবনা চিন্তা থেমে নেই।

ডলফিনের কোথাও হিরোইনের সন্ধান পায়নি ও। ও শুধু একা নয়, নারকোটিক ব্যুরো এবং কাস্টমস ইন্সপেক্টররাও কেউ কোনদিন পায়নি কিছু। ওয়াটারলাইনের নিচে? হ্যাঁ, একটা সম্ভাবনা বটে। কিন্তু জাহাজ ডকে ভেড়ার পর সন্দেহপ্রবণ ইনভেস্টিগেটররা নিশ্চয়ই ওটার প্রতিটি ইঞ্জিন খোল পরীক্ষা করে দেখেছে। তাছাড়া, অতবড় একটা কার্গো সরানোও সম্ভব নয়, পানিতে ফেলে দিয়ে পরে সেটা আবার উদ্ধার করার প্ল্যান থাকলে অবশ্য আলাদা কথা। না, তাও সম্ভব নয়। একশো ত্রিশ টন ওজনের নিরেট বস্তু ভরা ওয়াটার টাইট কন্টেইনার পানি থেকে তুলতে হলে ফুল স্কেল স্যালভেজ অপারেশনের দরকার হবে। গোপনে সে-ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। উঁহুঁ, আরও উন্নত মানের কোন কৌশলের সাহায্য নেয়া হচ্ছে। এমন একটা কৌশল, বছরের পর বছর সাফল্যের সাথে কাজে লাগানো হচ্ছে অথচ সেটা যে কি তা আজ পর্যন্ত কারও ধারণায় আসেনি।

ডাইভার'স নাইফটা হাতে নিয়ে অলস ভঙ্গিতে বালির ওপর ডলফিনের স্কেচ আঁকতে শুরু করল রানা। তারপর, হঠাৎ করেই, ডায়াগ্রামটা অস্থির, খুঁতখুঁতে করে তুলল ওকে। উঠে দাঁড়াল ও। বালির ওপর একটা খোল আঁকল, লম্বায় প্রায় ত্রিশ ফুট। ব্রিজ, হোল্ড, ইঞ্জিনরুম, খুঁটিনাটি যা কিছু মনে পড়ল সাদা বালির ওপর দাগ কেটে সব আঁকল ও। কয়েক মিনিট পেরিয়ে গেল। ধীরে ধীরে স্কেচটা জাহাজের আকৃতি নিতে শুরু করল। নিজের কাজে এতই মগ্ন হয়ে পড়ল রানা, যে গাধা নিয়ে সৈকতের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বুড়ো লোকটাকে দেখতেই পেল না।

অবশেষে শেষ হলো ডায়াগ্রাম আঁকা। শেষ কম্প্যানিয়ন ওয়েটাও বাদ পড়েনি। রোদ লেগে চিক চিক করে উঠল ছুরির ফলা, কৌতুক করার জন্যেই ছোট একটা ভেন্টিলেটরে খুদে একটা পাখি আঁকল রানা। তারপর পিছিয়ে এসে নিজের শিল্পকর্মের দিকে সমালোচনার দৃষ্টিতে তাকাল। কয়েক মুহূর্ত গম্ভীর মুখে তাকিয়ে থাকার পর আচমকা হা হা করে হেসে উঠল ও। জাহাজ নয়, ঠিক যেন

পোয়াতী তিমির মত লাগছে দেখতে। হাসির সেটাই কারণ।

অন্যমনস্কভাবে ড্রইঙের দিকে তাকিয়ে ঘাড় চুলকাল রানা। হঠাৎ ঘাড়ের ওপর স্থির হয়ে গেল হাতটা। চেহারা থেকে খসে পড়ল সমস্ত ভাব। কি যেন একটা বুঝতে পারবে বলে আশা হচ্ছে, কিন্তু শত চেষ্টা করেও বুঝতে পারছে না। তারপর দ্রুত হাতে বালির ওপর আরও কিছু অতিরিক্ত রেখা আঁকতে শুরু করল। আবার মগ্ন হয়ে পড়ল ও, মনের একটা কাল্পনিক ছবির সাথে মেলাতে চেষ্টা করল ডায়াগ্রামটাকে। কিছু রেখা নতুন করে আঁকল, কিছু রেখা বাতিল করল, কোনটা ছোট করল, কোনটা বড় করল। শেষ সংশোধনটা সেরে আবার পিছিয়ে এল ও। ধীরে ধীরে ভাব-গম্ভীর সন্তুষ্টির হাসি ছড়িয়ে পড়ল সারা মুখে। ফন হামেল, তোমার বুদ্ধির তুলনা মেলা ভার, বিড় বিড় করে বলল ও।—তুমি সত্যিই একটা প্রতিভা!

সমস্ত ক্লান্তি কোথায় যেন পালিয়ে গেল। মনটা এখন আর অস্থির নয়। ব্যর্থতার গ্লানিও অনুভব করল না। মনে মনে ভাবল মানতেই হবে এটা একটা নতুন ধরনের সমাধান। সম্পূর্ণ নতুন অ্যাপ্রোচ। তবে, কারও না কারও মাথায় ধারণাটা ধরা পড়া উচিত ছিল। তাড়াতাড়ি ডাইভিং ইকুইপমেন্ট তুলে নিয়ে হাঁটা ধরল ও। এখন আর থাসোস থেকে খালি হাতে ফিরে যাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না। রহস্যের কিনারা হাতের মুঠোয় চলে এসেছে। ফঁন হামেলকে এক হাত দেখিয়ে তবে বিদায় নেবে। খানিক দূর এগিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল ও।

বাতাস শুরু হয়েছে, সেই সাথে বড় হতে শুরু করেছে ঢেউগুলো। পালের গোদা, সবচেয়ে বড় ঢেউটা, সৈকতের ওপর অনেক দূর উঠে এল। ডায়াগ্রামের ওপর দিয়ে ছুটে এল সেটা। জোড়া এম লেখা ফানেলটা ঢাকা পড়ে গেল ফেনায়।

চার

নীল রঙা এয়ার ফোর্স পিকাপ ট্রাকের পাশে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে বেন, মাথাটা কাত হয়ে আছে বিনকিউলার কেসের ওপর, পা দুটো উঠে গেছে একটা বোল্ডারের গায়ে। অঘোরে ঘুমাচ্ছে সে। মাটিতে সরল রেখা তৈরি করে এগিয়ে আসছে পিঁপড়েদের মিছিল, বেনের পড়ে থাকা বাঁ হাতের ওপর দিয়ে ডিঙিয়ে পথ করে নিচ্ছে তারা। দৃশ্যটা দেখে মৃদু হাসল রানা। জানে, যে-কোন পরিস্থিতিতে, যে-কোন সময়ে, যে-কোন জায়গায় এই কাজটা করতে পারে বেন।

ফিন দুটো ঝাঁকাল রানা, লোনা পানির ছিটে পড়ল বেনের মুখে। কোনরকম আওয়াজ নয়, প্রতিবাদ নয়, নিঃশব্দে বিস্ফারিত হলো একটা বড় সড় চোখ। সোজা রানার চোখে তাকাল।

'চমৎকার!' খোঁচা দিয়ে বলল রানা। 'এই বুঝি আমার ওপর নজর রাখার নমুনা?'

আরেকটা চোখ মেলল বেন। 'তীরে ফিরে বালি নিয়ে খেলা শুরু করলে দেখে ঘুম পেয়ে গেল আমার। বিশ্বাস করো, তার আগে পর্যন্ত মুহূর্তের জন্যেও চোখ

থেকে নাইট গ্লাস নামাইনি।' উঠে বসল সে। কপালে হাত তুলে রোদ থেকে চোখ আড়াল করে জানতে চাইল, 'এত কষ্ট করে কি পেলে তাই বলো।'

'কিছু পাইনি, সেটাই হয়েছে বড় পাওয়া,' মুচকি হেসে বলল রানা।

'মানে?'

'পরে বলব।' ট্রাকের ওপর ডাইভিং গিয়্যার তুলে রাখল রানা। 'বোথাসের কাছ থেকে কোন খবর পেলে?'

'এখনও পাইনি।' বিনকিউলার তুলে ফন হামেলের ভিলার দিকে তাকাল বেন। 'এক প্ল্যাটুন স্থানীয় পুলিস নিয়ে সে আর রেনো ভিলার ওপর নজর রাখতে গেছে। ওয়্যারহাউসে রেডিও সামনে নিয়ে বসে আছে পেরিয়াস, তীর আর জাহাজের মধ্যে কোন বেতার-সংকেত বিনিময় হলে সেটা ধরার আশায় ওয়েভ লেংথের কাঁটা ঘোরাচ্ছে।'

'পাকাপোক্ত আয়োজন, কিন্তু সময়ের অপচয় মাত্র।' তোয়ালে দিয়ে মাথা মুছল রানা। তারপর চুলে চিরুণী চালাল।

'তোমাকে মারল কে?' হঠাৎ জানতে চাইল বেন।

বেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে নিজের পায়ে তাকাল রানা। ডান হাঁটুর নিচে ছোট কিন্তু গভীর একটা ক্ষত দেখল ও, মন্থর গতিতে রক্ত বেরিয়ে আসছে।

'বাঙ্কহেডের সাথে ধাক্কা খেয়েছি।'

উঠে দাঁড়াল বেন। ক্যাবের ভেতর হাত ভরে বলল, 'দাঁড়াও, ব্যান্ডেজ বেঁধে দিই।' গ্লাভ কমপার্টমেন্ট থেকে ফার্স্ট এইড বক্সটা বের করল সে।

বেনের হাতে ডান পা ছেড়ে দিল রানা। কয়েক মিনিট কেউ কোন কথা বলল না।

নিস্তব্ধতাটুকু উপভোগ্য লাগল রানার। আকাশের প্রতিবিম্ব পড়া নীল পানি, তীর-রেখা, নির্জন সৈকত অপূর্ব লাগল ওর কাছে। রাস্তার পাশে সৈকতটা তেমন চওড়া নয়। দক্ষিণ দিকে মাইল ছয়েক লম্বা হবে, ক্রমশ সরু একটা রেখায় পরিণত হয়ে দ্বীপের পশ্চিম-প্রান্তে মিলিয়ে গেছে। বিস্তৃত ফেনা-রেখার কোথাও জন-মনিষ্যির ছায়া পর্যন্ত নেই। এই নির্জনতার মধ্যে অদ্ভুত রোমান্টিক একটা আমেজ আছে।

লক্ষ্য করল, ফেনিল তরঙ্গ ফুট দুয়েক উঁচু হয়ে ছুটে আসছে, প্রতিটি তার শিখরে পৌঁছে মাথায় ঝুঁটি জড়াতে সময় নিচ্ছে আট সেকেন্ড করে। ঢেউগুলো নিচু হতে হতে ছুটে আসছে প্রায় একশো গজ। তারপর পালা করে বিস্ফোরিত হচ্ছে প্রত্যেকটা, ঝর্ণার মত চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছে ফেনা-মাখা পানি। বিস্ফোরণের পর আগের সেই তেজ আর থাকছে না, খুদে তরঙ্গে পরিণত হয়ে একের পর এক এগিয়ে এসে মিলিয়ে যাচ্ছে টাইডলাইনে। সাঁতারুদের জন্যে অবস্থাটা আদর্শ। কিন্তু ডাইভারদের জন্যে নয়। বালিময় অগভীর সাগর-তলে কিছু যে নেই তা আর বলে দিতে হয় না। আন্ডারওয়াটার অ্যাডভেঞ্চারের জন্যে ডাইভাররা সবুজ পানি, প্রবালের তৈরি মেঁঝে, রীফ ইত্যাদি পছন্দ করে। কারণ সাগরতলার সৌন্দর্য ওখানেই যা কিছু দেখতে পাওয়া যায়।

চোখের দৃষ্টি একশো আশি ডিগ্রী ঘুরিয়ে উত্তর দিকে তাকাল রানা। এদিকের ব্যাপার সম্পূর্ণ উল্টো। সাগর থেকে সোজা খাড়া ভাবে উঠে এসেছে

এবড়োখেবড়ো পাথুরে পাঁচিল, গায়ে সবুজের চিহ্নমাত্র নেই। ঢেউয়ের অনবরত হামলায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেছে পাঁচিলগুলো। উপকরণ পেলে প্রকৃতি কি যে করতে পারে তার রোমহর্ষক দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় এখানে। হঠাৎ ভুরু কুঁচকে উঠল রানার। ক্লিফলাইনের একটা নির্দিষ্ট বিস্তৃতি দৃষ্টি কেড়ে নিল ওর।

আর সব পাঁচিলের নিচে ঢেউয়ের নৃত্য, পানির আলোড়ন চলেছে তো চলেছেই, থামাথামির কোন লক্ষণ নেই। কিন্তু এই একটা জায়গার নিচে পানি একেবারে শান্ত এবং সমতল। প্রায় একশো বর্গ গজ এলাকা জুড়ে এখানের পানি চুপচাপ এবং নিস্তরঙ্গ। দৃশ্যটা অবিশ্বাস্য, অলৌকিক লাগল ওর।

ওই শান্ত পানির নিচে কি পেতে পারে ডাইভাররা? দ্বীপটা কিসের থেকে কিভাবে গড়ে উঠে এই আকার এবং আকৃতিতে পৌঁচেছে তা একমাত্র সৃষ্টিকর্তাই বলতে পারে। বরফ যুগ এসেছে এবং চলে গেছে, প্রাচীন সাগরের লেভেল বারবার বদলেছে। কে জানে, হয়তো দৈত্যাকার ঢেউয়ের ধাক্কা লেগে পানিতে ডুবে থাকা পাহাড়-পাঁচিলের গায়ে সারি সারি টানেল তৈরি হয়েছে। হয়তো সেই টানেল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পানি। কে জানে!

'ডাক্তার বেন নেলসনের কাজ শেষ,' কৌতুকের সুরে বলল বেন। 'ফি—ছয় বোতল বিয়ার আর এক প্যাকেট ক্যান্সার স্টিক।'

পায়ের ব্যান্ডেজটা পরীক্ষা করল রানা। 'ফি—দশ বোতল বিয়ার, ব্যস। সিগারেট আমি খাই না, কাউকে খাওয়াতেও রাজি নই।'

'ওই ইন্সপেক্টর আসছে!'

বেনের দৃষ্টি অনুসরণ করে রাস্তার দিকে তাকাল রানা। পাহাড়ী পথ ধরে দ্রুত নেমে আসছে কালো মার্সিডিজ, পিছনে রেখে আসছে ধুলোর মেঘ। সিকি মাইল দূরে থাকতে পাকা কোস্টাল রোডে উঠে এল গাড়ি। খানিক পর ডিজেল ইঞ্জিনের আওয়াজ পেল ওরা। ট্রাকের পাশে থামল মার্সিডিজ। ফ্রন্ট সীট থেকে নামল ইন্সপেক্টর বোথাস আর কর্নেল রেনো। পিছনের সীট থেকে নেমে ওদেরকে অনুসরণ করল ক্যাপ্টেন পেরিয়াস। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে সে, কিন্তু সেটা গোপন করার চেষ্টা নেই।

ভাঁজ নষ্ট হওয়া সামরিক পোশাক পরে আছে ইন্সপেক্টর, চোখ দুটো রক্তবর্ণ। দেখেই বোঝা যায়, রাতে তার ঘুমের সাথে সাক্ষাৎ হয়নি।

সহানুভূতিমাখা হাসি ফুটল রানার মুখে। জানতে চাইল, 'কেমন কাটল সময়টা, ইন্সপেক্টর? কিছু দেখতে পেলেন?'

ভাব দেখে মনে হলো রানার কথা শুনতেই পায়নি ইন্সপেক্টর। ক্লান্ত ভাবে পকেটে হাত ভরে টোবাকো পাইপ আর পাউচ বের করল। পাইপে তামাক ভরে ধরাল সেটা। ধীরে ধীরে বসে পড়ল মাটিতে, তারপর লম্বা হয়ে শুয়ে চোখ বুজল।

'শালা বেজন্মা!' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ইন্সপেক্টর। 'শালা ফন হামেল! শালা কোথাও কোন খুঁত রাখে না! সারারাত বনে-বাদাড়ে-গর্তে ওত পেতে বসে থেকে মশার কামড় খেলাম, অথচ পেলামটা কি?'

'কিছুই পাননি, কিছুই দেখেননি, কিছুই শোনেনি!' মুচকি হাসল রানা।

চোখ মেলল বোথাস। উঠে বসল ধীরে ধীরে। মুখে হাত বুলিয়ে একটু হাসল।

'এতই খারাপ দেখাচ্ছে চেহারা?'

মাথা ঝাঁকাল রানা।

দুম করে মাটিতে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল ইন্সপেক্টর। 'আমি ডেসপারেট হয়ে উঠেছি, মি. রানা। এভাবে চলতে দেয়া যায় না!'

মুচকে আবার একটু হাসল রানা। 'আমি আপনার সাথে একমত। এভাবে চলতে দেয়া যায় না।'

'আপনি হয়তো জানেন না, ফন হামেলকে শায়েস্তা করার জন্যে আমি আমার জীবন পণ করেছি,' থমথমে গলায় বলল বোথাস। 'এবং কোন কেস একবার হাতে নিলে সেটার সমাধান না করে থামিনি কখনও।' খানিক চুপ করে থাকার পর শান্ত সুরে বলল সে, 'জাহাজটাকে এখুনি থামানো দরকার, অথচ আইনের প্যাঁচে আমাদের হাত-পা বাঁধা, কোনভাবেই ওটাকে থামানো সম্ভব নয়! ভাবতে পারেন হিরোইনটা যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছুলে কি কাণ্ড ঘটবে?'

'গুলি মারুন আইনকে,' ঝাঁঝের সাথে বলল বেন। 'অনুমতি পেলে ডলফিনের খোলে লিমপেট মাইন ফিট করে দিতে পারি আমি। বিস্ফোরণের সাথে সব ঝামেলা চুকে যাক।'

'আমাদের বেন বড় সাদাসিধে মানুষ,' বলল রানা। 'ছেলেমানুষের মত যা মুখে আসে তাই বলে ফেলে!'

কটমট করে রানার দিকে তাকাল বেন।

অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকাল বোথাস। 'জাহাজটাকে উড়িয়ে দিলে শুধু এখানকার সমস্যা মিটবে, সেটা অনেকটা অক্টোপাসের মাত্র একটা শুঁড় কাটার মত হবে। ডলফিনকে ডুবিয়ে দিলেও ফন হামেল আর তার স্মাগলাররা বেঁচে থাকবে। ইনশিওরেন্সের টাকা আদায় করে নিয়ে আবার নতুন করে শুরু করবে অপারেশন।' এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'না। ধৈর্য ধরতে হবে। ডলফিন এখনও শিকাগোয় পৌঁছায়নি। ওটাকে সার্চ করার জন্যে আরেকটা সুযোগ মার্সেইতে পাব আমরা।'

'যদি ভেবে থাকেন মার্সেইতে আপনার ভাগ্য খুলে যাবে তাহলে ভুল করবেন, ইন্সপেক্টর,' বলল রানা। 'ফ্রেঞ্চ সিক্রেট পুলিস ডক-শ্রমিকের ছদ্মবেশ নিয়ে ডলফিনে হয়তো উঠতে পারবে, কিন্তু কিছু পাবে বলে মনে করি না।'

অবাক হয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ইন্সপেক্টর। 'তারমানে কি আপনি সার্চ করেছেন···?'

'রানার পক্ষে সবই সম্ভব,' বিড়বিড় করে বলল বেন। 'জাহাজের ওদিকে, মানে আমার চোখের আড়ালে বেশ কিছুক্ষণ ছিল ও। প্রায় আধ ঘণ্টার জন্যে আমি ওকে হারিয়ে ফেলি।'

এবার চারজনই চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানার দিকে।

'হ্যাঁ,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'এবার আমার মুখ খোলার সময় হয়েছে। কাছে সরে এসো তোমরা, আলখাল্লা পরা ছোরাধারী মাসুদ রানার অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী—মন দিয়ে শোনো সবাই।'

কিছুটা বলে থামল রানা, হেলান দিল ট্রাকের গায়ে। একে একে তাকাল ওর সামনের চিন্তিত মুখগুলোর দিকে।

'গোটা ব্যাপারটাই বানোয়াট, একটা ফলস্-ফ্রন্ট,' বলল ও। 'ডলফিন তার হোল্ডে কার্গো বহন করছে বটে, কিন্তু সেগুলো সবই লিগ্যাল কার্গো। হাজার বার সার্চ করেও তার হোল্ডে বেআইনী কিছু পাবে না কেউ। ডলফিন পুরানো আমলের জাহাজ, ঠিক কিন্তু তার ইস্পাতের চামড়ার নিচে রয়েছে একেবারে আধুনিক সেন্ট্রালাইজড কন্ট্রোল সিস্টেম। মাত্র গত বছর প্যাসিফিকের পুরানো একটা জাহাজে এই একই ইকুইপমেন্ট দেখেছি আমি। খুব বেশি ক্রু দরকার হয় না। ছয় কি সাতজনই ওটাকে চালাবার জন্যে যথেষ্ট।'

'আশ্চর্য!' ফিসফিস করে বলল বেন।

'এর মধ্যে আসলে আশ্চর্যের কিছুই নেই,' বলল রানা। 'প্রতিটি কমপার্টমেন্ট, প্রতিটি কেবিন এক একটা সাজানো মঞ্চ বিশেষ, জাহাজ বন্দরে পৌঁছুলেই উইং থেকে অভিনেতারা বেরিয়ে এসে ক্রু সাজে।'

'আমি কিন্তু এখনও পরিষ্কার বুঝছি না!'

ইন্সপেক্টরের দিকে তাকাল রানা। 'প্রাচীন, ঐতিহাসিক একটা দুর্গের কথা কল্পনা করুন। বিখ্যাত এই রকম দুর্গ দেখার জন্যে ট্যুরিস্টরা ভিড় করে, তাই না? ভেতরে ঢুকে কি দেখে তারা? ফায়ারপ্লেসে এখনও আগুন জ্বলছে, পানি নিষ্কাষণের ব্যবস্থা আজও চালু আছে, নির্দিষ্ট সময় ধরে আগের মতই ঘণ্টা বাজে, ঘাসগুলো নিয়মিত ছোট ছোট করা হয়। সব পরিষ্কার, ঝকঝক করছে। হপ্তার মধ্যে পাঁচদিন বন্ধ থাকে দুর্গ, দু'দিন খুলে দেয়া হয় ট্যুরিস্টদের জন্যে। এক্ষেত্রে অবশ্য কাস্টমস্ ইন্সপেক্টরদের জন্যে।'

'কিন্তু কেয়ারটেকার?' সকৌতুকে জানতে চাইল বোথাস।

'কেয়ারটেকার,' বিড়বিড় করে বলল রানা, 'বাস করে সেলারে।'

'কিন্তু সবাই জানে সেলারে শুধু ইঁদুর বাস করে,' তাচ্ছিল্যের সুরে বলল পেরিয়াস।

'ঠিক,' উৎসাহের সাথে বলল রানা। 'আমরাও ইঁদুরের কথাই আলোচনা করছি। পার্থক্য শুধু এইটুকু যে আমাদের ইঁদুর দু'পেয়ে।'

'সেলার, সাজানো মঞ্চ, দুর্গ। খোলের ভেতর কোথাও গা ঢাকা দিয়ে থাকে ক্রুরা। আসলে ঠিক কি বলতে চাইছেন আপনি, মি. রানা?' ব্যাখ্যা চাওয়ার সুরে বলল বোথাস।

'আসলে বলতে চাইছি,' মুচকি হাসি ফুটল রানার ঠোঁটে, 'খোলের ভেতর কোথাও নয়, খোলের নিচে থাকে ক্রুরা।'

চোখ জোড়া ছোট ছোট হয়ে গেল ইন্সপেক্টরের। কয়েক মুহূর্ত পর গলায় অবিশ্বাসের সুর টেনে বলল সে, 'তা কিভাবে সম্ভব!'

'সম্ভব,' বলল রানা, 'যদি ডলফিনের পেটে বাচ্চা থাকে, মানে সে যদি পোয়াতী হয়।'

এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারপর সবাই তাকাল রানার দিকে।

নিস্তব্ধতা ভাঙল বেন।

'তুমি কিছু বলতে চাইছ, কিন্তু আমরা কেউ সেটা বুঝতে পারছি না। দয়া করে তুমি যদি···'

'ইন্সপেক্টর বোথাস বলেছিলেন স্মাগলিঙের লাইনে ফন হামেল একটা প্রতিভা,' বলল রানা। 'কথাটা শতকরা একশো ভাগ সত্য। শুধু ডলফিন নয়, মুনমুন লাইন্সের সবগুলো জাহাজ নিজেদের শক্তিতে চলতে তো পারেই, সেই সাথে যার যার খোলের সাথে জোড়া লাগানো স্যাটেলাইট ভেসেলের সাহায্য নিয়েও চলাফেরা করতে পারে। স্যাটেলাইট ভেসেলের সাহায্য নেবার জন্যে প্রতিটি খোলে কিছু পরিবর্তন করা হয়ে থাকতে পারে।' একটা হাত তুলে কাউকে কিছু বলতে নিষেধ করল রানা। 'ব্যাপারটা নিয়ে খানিক চিন্তা করো সবাই। যতটা উদ্ভট শোনাচ্ছে আসলে ততটা উদ্ভট নয়। এই একই ব্যাপার আমি আগেও একবার দেখেছি।' একটু বিরতি নিয়ে আবার শুরু করল ও, 'নিজের কোর্স ছেড়ে এখানে এসে দুটো দিন নষ্ট করে মুনমুন লাইন্সের জাহাজ, কেন? নিশ্চয়ই ফন হামেলকে চুমো খেয়ে শুভেচ্ছা জানাবার জন্যে নয়? কোন না কোন ভাবে যোগাযোগ ঠিকই করা হয়।' বোথাস আর রেনোর দিকে ফিরল ও। 'আপনারা ভিলার ওপর নজর রেখেছেন, অথচ কোন সিগন্যাল দেখতে পাননি?'

'ভিলায় কাউকে ঢুকতে বা বেরুতেও দেখিনি আমরা।'

'একই কথা খাটে ডলফিন সম্পর্কে,' রানার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি রেখে বলল বেন। 'তুমি ছাড়া জাহাজটা থেকে আর কেউ সৈকতে আসেনি।'

'পেরিয়াস কোনরকম রেডিও ট্রান্সমিশনের আওয়াজ শোনেনি, আমিও ডলফিনের রেডিও কেবিনে কাউকে দেখতে পাইনি।'

'আপনার একটা পয়েন্ট আমি বোধহয় ধরতে পেরেছি,' বলল বোথাস। 'আপনি বলতে চাইছেন ফন হামেল এবং জাহাজের সাথে নিশ্চয়ই কোন যোগাযোগ রয়েছে, এবং পানির নিচে দিয়ে ছাড়া সেটা হবার অন্য কোন উপায় নেই, এই তো?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আপনার স্যাটেলাইট ভেসেল থিওরীটা এখনও আমার কাছে পরিষ্কার নয়।'

'আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দিন, তাহলে হয়তো পরিষ্কার হয়ে যাবে,' বলল রানা, 'এমন একটা জলযানের নাম করুন যেটা অনেক লম্বা পথ পাড়ি দিতে পারে, ক্রুদের জায়গা দিতে পারে, একশো ত্রিশ টন হিরোইন রাখার মত ক্যাপাসিটি আছে, এবং কাস্টমস্ বা নারকোটিক ব্যুরো যেটাকে কোনদিনই সার্চ করার সুযোগ পাবে না।'

আবার সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে শুরু করল। নিস্তব্ধতা ভাঙল এবার বোথাস।

'আপনি কি সাবমেরিনের কথা বলতে চাইছেন?'

'হ্যাঁ, আমি একটা ফুল স্কেল সাবমেরিনের কথাই বলতে চাইছি। এরকম

একটা স্পাই সাবমেরিন আমি একবার দেখেছি চট্টগ্রামে।'*

ইন্সপেক্টরের চেহারায় হতাশা ফুটে উঠল। এদিক ওদিক মাথা নাড়ল সে। 'ধারণাটা বাদ দিন, মি. রানা। মুনমুন লাইন্সের সব জাহাজের ওয়াটারলাইনের নিচেটা ডাইভার দিয়ে পরীক্ষা করিয়েছি আমরা। একবার নয়, একশো বার করে। সাবমেরিনের ছায়া পর্যন্ত দেখা যায়নি।'

'যায়নি, কারণ, আপনার ডাইভাররা যখন পরীক্ষা করেছে তখন ওটার সাথে সাবমেরিন ছিল না।'

'আপনি বলতে চাইছেন জাহাজ ডকে ভেড়ার আগে সাবমেরিন খোলের নিচ থেকে সরে যায়?'

মাথা ঝাঁকাল রানা। 'হ্যাঁ।'

'তারপর কি? ওখান থেকে কোথায় যায় সাবমেরিন?'

'উত্তর পাবার জন্যে চলুন,' বলল রানা, 'আমরা ম্যাকাও বন্দরে ফিরে যাই। আপনি যদি বন্দরের ডকে দাঁড়িয়ে থাকতেন, দেখতে পেতেন সাধারণ লোডিং অপারেশনের সাহায্যে ডলফিনে কার্গো তোলা হচ্ছে। ক্রেনের সাহায্যে হোল্ডে ভরা হচ্ছে বস্তা, বস্তায় কি আছে? হিরোইন। বলাই বাহুল্য, বন্দরের কাস্টমস্ অফিসাররা বস্তাগুলো পরীক্ষা না করেও জানে, ওগুলোয় বেআইনী কার্গো আছে। কিন্তু তারা চ্যালেঞ্জ বা আপত্তি করে না। কারণ, ফন হামেলের কাছ থেকে অফিসাররা মাসোহারা পেয়ে আসছে অনেক দিন থেকে।'

'ওখানের ডক এলাকায় নাকি কোসা-নোস্ত্রার ভয়ঙ্কর প্রভাব,' বলল বেন। 'ফন হামেল তাদের সাহায্য নিতে পারে।'

'নিশ্চয়ই নেয়,' বলল রানা। 'যা বলছিলাম। সবচেয়ে আগে জাহাজে তোলা হলো হিরোইন। কিন্তু হিরোইন ভরা বস্তাগুলো তার হোল্ডে থাকল না। হোল্ড থেকে পাচার করে দেয়া হলো সাবমেরিনে। সম্ভবত চোরা কোন হ্যাচ আছে, কাস্টমসের ডিটেকশন গিয়্যারে সেটা ধরা পড়ে না। এরপর হোল্ডে তোলা হলো সাধারণ কার্গো। ডলফিন এবার তার যাত্রা শুরু করল, এবং পৌঁছুল সিলোনে। এখানে সয়াবিন আর চায়ের সাথে বিনিময় করা হলো কোকো আর গ্রাফাইট—দুটোর কোনটাই বেআইনী কার্গো নয়। পরবর্তী যাত্রা বিরতি থাসোস। সম্ভবত, ফন হামেলের কাছ থেকে নির্দেশ পাবার জন্যেই থাসোসে আসতে হয় জাহাজগুলোকে। থাসোস থেকে ফুয়েলের জন্যে মার্সেইয়ের উদ্দেশে রওনা হয় জাহাজ, সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে শেষ গন্তব্য শিকাগোয় পৌঁছায়।'

'কিন্তু আমি আরেকটা কথা ভাবছি,' বলল বেন।

'বলে ফেলো।'

'সাবমেরিন সম্পর্কে আমি এক্সপার্ট নই, তাই বুঝতে পারছি না একটা সাবমেরিন কিভাবে নিজের ঘাড়ে তুলে নিতে পারে গোটা একটা জাহাজকে? অথবা তার পেটে কোথায় এত জায়গা যে একশো টন কার্গো রাখবে?'

'ভেঙে, জোড়া লাগিয়ে অবশ্যই বদলে নিতে হয়েছে সাবমেরিনের আকার

---

* 'সাগর-সঙ্গম' দ্রষ্টব্য।

আকৃতি। কোনিং টাওয়ার বা আর যে সব প্রজেকশন আছে সেগুলো সরানো জটিল কোন ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা নয়। ওগুলো সরিয়ে নিলেই মাদার শিপের কীল বরাবর সাবমেরিনের টপ ডেক খাপে খাপে ফিট হয়ে যেতে পারে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ফ্লিট-টাইপ সবগুলো অ্যাভারেজ ডিসপ্লেসমেন্ট ছিল পনেরোশো টন। লম্বায় হত তিনশো ফুট, খোলটা উঁচু হত দশ ফুট, বীম ছিল সাতাশ ফুট—আকারে মোটামুটি একটা শহুরে বাড়ির দ্বিগুণ। এখন ধরো, টর্পেডো রুমগুলো, আশি জন ক্রুর কোয়ার্টার এবং অপ্রয়োজনীয় আর সব জায়গা যদি পরিষ্কার করা যায়, তাহলে হিরোইন রাখার পরও কিছুটা স্পেস খালি পড়ে থাকবে।'

ভাবলেশহীন চেহারা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ইন্সপেক্টর। অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর ধীরে ধীরে আলোকিত হয়ে উঠল মুখ। 'আচ্ছা, মেজর রানা, বলুন তো, খোলে সাবমেরিন জোড়া লাগানো অবস্থায় ডলফিনের স্পীড কি হবে?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করল রানা। 'বারো নট। এমনিতে পনেরো কি ষোলো নট গতি হবে জাহাজের।'

রেনোর দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'মেজর রানা সম্ভবত ঠিক পথেই এগোচ্ছেন!'

'আপনি কি ভাবছেন বুঝতে পারছি, ইন্সপেক্টর,' বলল রেনো। 'হ্যাঁ, আমরাও লক্ষ্য করেছি মুনমুন লাইন্সের জাহাজগুলোর স্পীড বড় বেশি ওঠানামা করে।'

বোথাসের দৃষ্টি আবার রানার দিকে ফিরল। 'কিন্তু হিরোইন কোথায় কিভাবে খালাস করা হয়?'

'রাতে, যখন জোয়ার থাকে। দিনের বেলা ঝুঁকি খুব বেশি। আকাশ থেকে কারও চোখে ধরা পড়ে যাবার ভয় আছে।'

'ঠিক,' বলল ইন্সপেক্টর। 'ফন হামেলের ফ্রেটার সূর্য ডোবার আগে কোন বন্দরে ভেড়ে না!'

'হিরোইন কিভাবে খালাস করা হয়, তাই না?' প্রশ্নটা যেন নিজেকেই করল রানা। 'পোর্টে ঢোকার একটু আগেই জাহাজ থেকে সরে যায় সাবমেরিন। পেরিস্কোপ আর কোনিং টাওয়ার না থাকায় ওটাকে নিশ্চয়ই সারফেস থেকে কোন ছোট বোট গাইড করে। শুধু এখানে ব্যর্থ হবার একটা ঝুঁকি রয়েছে ওদের—রাতের অন্ধকারে অন্য কোন ভেসেলের সাথে সংঘর্ষ ঘটতে পারে।'

'ওদের সাথে নিশ্চয়ই এমন একজন পাইলট থাকে হারবারের প্রতিটি ইঞ্চি যার মুখস্থ,' চিন্তিত ভাবে বলল ইন্সপেক্টর।

'অবশ্যই।'

'এখন শুধু জানতে বাকি থাকল লোকেশানটা, যেখানে কার্গো খালাস করতে পারে সাবমেরিন। আচ্ছা, কারও চোখে পড়ার ঝুঁকি না নিয়ে কিভাবে বিলি করে হিরোইন?'

'পরিত্যক্ত কোন ওয়্যারহাউস হতে পারে না?' জানতে চাইল বেন।

'সব কিছুর আগে ওয়্যারহাউসের ওপরই চোখ পড়ে বন্দর পুলিসের, কাজেই আমরা ধরে নিতে পারি ফন হামেল ওটাকে এড়িয়ে গেছে।'

'মেজর রানা ঠিক বলেছেন,' মাথা ঝাঁকাল ইন্সপেক্টর। 'কাউন্টি হারবার পেট্রল, নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমস, এরা সবাই ওয়্যারহাউসের ওপর কড়া

নজর রাখে। কোথা থেকে বিলি করা হয় হিরোইন তা আজও কেউ ধরতে পারেনি, তারমানে বুদ্ধি খাটিয়ে নিশ্ছিদ্র একটা কৌশল ব্যবহার করছে ফন হামেল।'

আরও দু'একটা সাজেশন পাওয়া গেল, কিন্তু কোনটাই যুক্তিতে টিকল না।

খানিক পর চুপ করে গেল সবাই। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙল বোথাস।

'আমরা যে একটা সূত্র পেয়েছি তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু একটা সুতো বটে, কিন্তু এই সুতোটাকেই যদি একটা রশির সাথে জোড়া লাগাতে পারি, আর তারপর রশিটাকে যদি একটা চেইনের সাথে বেঁধে নিতে পারি তাহলেই আমরা বোধহয় চেইনের শেষ মাথায় দেখতে পাব ফন হামেলকে।'

'পেরিয়াস তাহলে রেডিওর সাহায্যে মার্সেইয়ের সাথে যোগাযোগ করুক,' বলল রেনো। 'আমাদের এজেন্টকে সতর্ক করে দেয়া দরকার।'

'না। যত কম লোকের মধ্যে ব্যাপারটা জানাজানি হয় ততই ভাল। আমি চাই না আগেভাগে কিছু টের পেয়ে যাক ফন হামেল।' রানার দিকে ফিরল ইন্সপেক্টর। 'হিরোইন নিয়ে নির্বিঘ্নে শিকাগোয় পৌঁছুতে দেয়া উচিত ডলফিনকে, কি বলেন, মেজর রানা?'

'হিরোইন ওখানে পৌঁছুলেই খদ্দেররা সবাই ভিড় করে আসবে, সেই সুযোগে আপনি তাদেরকে জালে আটকাতে চান, এই তো?'

গম্ভীর সুরে বোথাস বলল, 'হ্যাঁ। বেআইনী ড্রাগ ট্রাফিকের সাথে জড়িত সবগুলো অর্গানাইজেশন নিরাপদে পৌঁছানো উপলক্ষে সাবমেরিনটাকে শুভেচ্ছা জানাতে আসবে। শিকারের এমন সুযোগ আর পাবে না নারকোটিক ব্যুরো।'

'তার আগে কার্গো খালাস করার লোকেশানটা জানতে হবে আপনার,' বলল রানা।

'সেটা আমরা জানতে পারব,' দৃঢ় স্বরে বলল ইন্সপেক্টর। 'অন্তত তিন হপ্তার আগে গ্রেট লেকে ঢুকছে না ডলফিন। ইতিমধ্যে প্রত্যেকটা জেটি, বোট এবং ইয়ট ক্লাব সার্চ করব আমরা। অবশ্যই চুপিচুপি।'

'সেটা খুব সহজ কাজ হবে না।'

'আপনি নারকোটিক ব্যুরোকে ছোট করে দেখছেন, মেজর রানা। এ-ধরনের কাজে আমরা এক্সপার্ট।' ইন্সপেক্টরের চেহারায় গর্বের ভাব ফুটল। 'নির্দিষ্ট লোকেশানটা খুঁজব আমরা, তা নয়। মোটামুটি একটা ধারণা পেলেই চলবে। আমাদের রাডার আছে, সে-ই সাবমেরিনটাকে খুঁজে বের করবে। তারপর সুযোগ আর সময় মত হানা দেব আমরা।'

মৃদু গলায় বলল রানা, 'এসব কাজে বাধা আসবে, সেগুলোকে আপনি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছেন না।'

ইন্সপেক্টরের চেহারায় একটু কাঠিন্য ফুটল। 'আপনার হলো কি বলুন তো, মেজর রানা? আপনিই আমাদেরকে প্রথম একটা পথ দেখালেন। আজ বিশ বছর চেষ্টা করেও ইন্টারপোল বা নারকোটিক ব্যুরো যা পারেনি। অথচ সেই আপনিই···তবে কি নিজের সাজেশনটা এখন আর গ্রহণযোগ্য লাগছে না আপনার; ভাবছেন, ভুল হয়েছে?'

'না,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'সাবমেরিনের ব্যাপারে আমার কোন ভুল

হয়নি।'

'তাহলে? আপনার সমস্যাটা কি?'

'ডলফিন শিকাগোয় না পৌঁছুনো পর্যন্ত অপেক্ষা করতে চাইছেন আপনি, সেটাই আমি মেনে নিতে পারছি না,' বলল রানা।

'ফাঁদ পাতার জন্যে আরও ভাল কোন জায়গা আছে?'

ধীরে ধীরে বলল রানা, 'এখন থেকে ডলফিনে কাস্টমস অফিসাররা ওঠা পর্যন্ত অনেক কিছু ঘটে যেতে পারে, মি. বোথাস। আপনি নিজেই বলেছেন, শহরের ওয়াটার ফ্রন্ট সার্চ করার জন্যে তিন হপ্তা যথেষ্ট সময়। এত তাড়াহুড়ো করার দরকারটা কি? আমার পরামর্শ, আরও কিছু সময় অপেক্ষা করুন। হানা দেয়া মানে ফন হামেলকে চ্যালেঞ্জ করা—তা করার আগে আসুন, আরও কিছু তথ্য-প্রমাণ যোগাড় করি আমরা।'

থমথমে হয়ে উঠল ইন্সপেক্টরের চেহারা। 'আরও তথ্য-প্রমাণ? ঠিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারছি না।'

ট্রাকের গায়ে হেলান দিল রানা, রোদ লেগে এরই মধ্যে গরম হয়ে উঠেছে নীল রঙের বডি। সাগরের দিকে তাকাল ও। চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠল গভীর মনোনিবেশ। 'দশজন ভাল লোক চাই আমার, মি. ইন্সপেক্টর,' বলল ও। 'সাথে একজন স্থানীয় সী-ডগ, চারদিকের পানির সাথে ভাল পরিচয় আছে যার।'

'কেন?'

'যদি ধরে নিই ভিলা থেকেই অপারেশন চালায় ফন হামেল, যদি ধরে নিই পানির নিচে দিয়ে জাহাজের সাথে যোগাযোগ করে সে, তাহলে কোস্টলাইন বরাবর কোথাও তার একটা গোপন আস্তানা না থেকেই পারে না।'

'আপনি সেটা খুঁজে দেখতে চান?'

'হ্যাঁ।'

হাতের পাইপটা চিন্তিত ভাবে নাড়াচাড়া করতে শুরু করল বোথাস। অনেকক্ষণ পর মুখ তুলল সে। 'অসম্ভব।' চেহারায় দৃঢ়তা ফুটে উঠল। 'সে অনুমতি আপনাকে আমি দিতে পারি না। আপনি একজন ট্যালেন্টেড ম্যান, মেজর রানা। খানিক আগে পর্যন্ত আপনি যা বলেছেন তাতে যুক্তি, বুদ্ধির প্রখরতা সবই ছিল। আপনি আমাদের সাংঘাতিক উপকার করেছেন, সেটা সবার চেয়ে ভালভাবে উপলব্ধি করেছি আমি। কিন্তু আপনার এই অনুরোধ রক্ষা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কিছু আমি আপনাকে করতে দিতে পারি না, যাতে ফন হামেলের সাবধান হয়ে যাবার সুযোগ থাকতে পারে। আমি আবার বলছি, কোনরকম বাধা ছাড়া অবশ্যই ডলফিনকে শিকাগোয় পৌঁছুতে দিতে হবে।'

'ফন হামেল এরই মধ্যে সাবধান হয়ে গেছে,' শান্ত গলায় বলল রানা। 'আপনাদের সম্পর্কে জানে সে। সিলোন থেকে ঈজিয়ান পর্যন্ত ডলফিনকে অনুসরণ করে এসেছে ব্রিটিশ ডেস্ট্রয়ার আর টার্কিশ এয়ারক্রাফট, এরপরও কি ফন হামেলের জানতে বাকি থাকার কথা যে হিরোইনের গন্ধ পেয়ে গেছে ইন্টারপোল? আমার পরামর্শ, অন্য কোন জাহাজ বেআইনী কার্গো লোড বা আনলোড শুরু করার আগে ফন হামেলকে থামান। এখুনি!'

'দুঃখিত, মেজর রানা। আপনার পরামর্শের মধ্যে আমি কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। শিকাগোয় ডলফিন না পৌঁছানো পর্যন্ত ফন হামেলের ওপর থেকে হাত গুটিয়ে রাখার সিদ্ধান্তে আমি অবিচল থাকব। আপনি বুঝতে চেষ্টা করুন, মেজর—আমি, কর্নেল রেনো, ক্যাপ্টেন পেরিয়াস, আমরা তিনজনই নারকোটিক মেন। আমরা আমাদের কাজ বুঝি। এই কার্গো ইন্টারপোলের জুরিশডিকশনে থাকলে তারাও আমার নীতি ধরে এগোত। দুঃখিত, মেজর। বেআইনী ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটরদের প্রায় সবাইকে আটক করার এই সুযোগ আমি ছেড়ে দিতে পারি না। তাছাড়া, বাইরে থেকে উত্তর আমেরিকায় এই যে এতবড় একটা হিরোইনের চালান পৌঁছুতে যাচ্ছে সেটাও আমাকে যেভাবে হোক ঠেকাতে হবে।'

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল, তারপর বিস্ফোরিত হলো রানা।

'না হয় ঘেরাও করলেন সাবমেরিন, ক্রুদের গ্রেফতার করলেন, ড্রাগ ডিস্ট্রিবিউটরদেরও আটক করলেন, একশো ত্রিশ টন হিরোইনও চলে এল আপনাদের হাতের মুঠোয়, তাতে কি ফন হামেলকে থামাতে পারবেন? পারবেন না! নতুন খদ্দের পেতে যা দেরি, আবার সে জাহাজ ভর্তি হিরোইন নিয়ে হাজির হবে।'

প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখার জন্যে থামল রানা। কিন্তু ইন্সপেক্টর বোথাস আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকল। চেহারায় কোন ভাব নেই।

'আমার আর বেনের ওপর আপনার কোন অথরিটি নেই,' রাগের সাথে বলল রানা। 'এখন থেকে যা কিছু করার আপনাদের সহযোগিতা ছাড়াই করব আমরা।'

ইন্সপেক্টরের ঠোঁট জোড়া পরস্পরের সাথে শক্তভাবে সেঁটে গেল। চোখ নামিয়ে রানার চোখে তাকাল সে। কঠিন হয়ে উঠল চেহারা। কিছু না বলে হাতঘড়ি দেখল সে। তারপর মুখ খুলল, 'অযথা সময় নষ্ট করছি আমরা। কাভালা এয়ারপোর্ট থেকে সকালের এথেন্স ফ্লাইট ধরতে হবে আমাকে, হাতে মাত্র এক ঘন্টার মত সময় আছে।' হাতের পাইপটা পিস্তলের মত করে রানার দিকে তাক করল সে। 'তর্কে হেরে যাওয়াটা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু আপনি আমার জন্যে কোন বিকল্প রাখেননি, মেজর রানা। আমি আপনার প্রতি ঋণী, কিন্তু আপনাদের দু'জনকে আবার গ্রেফতার না করে পারলাম না।'

'হোয়াট?' বেনের চেহারা দেখে মনে হলো সে হাসবে নাকি কাঁদবে ঠিক যেন বুঝতে পারছে না।

'গ্রেফতার করার চেষ্টা করে দেখুন,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা, 'বাধা পাবেন।'

হোলস্টারে ঢোকানো ফরটি-ফাইভ অটোমেটিকের গায়ে হাত চাপড়াল ইন্সপেক্টর বোথাস। 'বাধা দিয়ে লাভ হবে না।'

অলসভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল বেন, রানার একটা হাত ধরে বলল, 'তুমি না, ওস্তাদ, আমি। বাধা যদি কেউ দেয় তো সে আমি। তুমি শুধু একটা অনুমতি দাও, দেখো কেমন মন্ত্রবলে কামান হাজির করি!'

টি শার্ট আর খাকী প্যান্ট পরে আছে বেন, কোন পকেট ফুলে নেই। অথচ রানা জানে, সিরিয়াস মুহূর্তে ঠাট্টা করার পাত্র নয় বেন। বলছে কামান হাজির করবে, তারমানে কি ওর কাছে পিস্তল-টিস্তল আছে? উঁহুঁ, তা কি করে হয়! পাবে

কোথায়? চোখে সন্দেহ আর প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে থাকল ও। বলল, 'বিপদের সময় আবার অনুমতি কিসের?'

হোলস্টারের ফ্ল্যাপে লাগানো বোতাম খুলে ফেলল ইন্সপেক্টর। 'আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি আপনাদের...'

'দাঁড়ান!' উত্তেজিত সুরে বলল পেরিয়াস। 'মি. ইন্সপেক্টর, স্যার, আমিও আপনার কাছে অনুমতি চাইছি!' কদাকার চেহারায় হিংস্র একটা ভাব ফুটে উঠল। 'ওদের সাথে আমার ছোট্ট একটা হিসেব আছে! দেনা-পাওনা মিটিয়ে ফেলার একটা সুযোগ দিন আমাকে।'

কোন রকম ব্যস্ত বা উত্তেজিত হতে দেখা গেল না বেনকে। পেরিয়াসের হুমকিটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করল সে। ইন্সপেক্টরের দিকেও তাকাল না। এমন শান্ত সুরে কথা বলতে শুরু করল যেন রানার কাছ থেকে সিগারেট চাইছে। 'আমার ক্রস ড্র স্রেফ একটা শিল্প, কিন্তু আসলে হিপ থেকে আরও তাড়াতাড়ি টানতে পারি আমি। প্রথমে কোনটা দেখতে চাও তুমি, ওস্তাদ?'

'বিপদেই ফেলে দিলে দেখছি,' মাথা চুলকে বলল রানা।

'থামুন আপনারা! যথেষ্ট হয়েছে!' বাঁ হাতে ধরা পাইপটা নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল ইন্সপেক্টর। 'আবার বলছি, বাধা দিয়ে কোন লাভ হবে না! সহযোগিতা করুন...'

'আমাদেরকে বোধহয় তিন হপ্তার জন্যে গ্রেফতার করবেন, তাই না, ইন্সপেক্টর?' জানতে চাইল রানা।

'হ্যাঁ।'

'কোথায় রাখা হবে আমাদের?'

'মেইনল্যান্ডের জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের জন্যে ভাল আরামের ব্যবস্থা আছে। কর্নেল রেনো তার প্রভাব খাটিয়ে আপনাদের জন্যে এমন একটা সেলের ব্যবস্থা করতে পারে যেখান থেকে সাগর দেখতে পাওয়া যাবে...' কথার মাঝখানে ইন্সপেক্টর বোথাসের মুখ ঝুলে পড়ল, কাঠের মত শক্ত আর পাথরের মত স্থির হয়ে গেল সে। চেহারায় ফুটে উঠল রাগ আর স্তম্ভিত বিস্ময়।

খুদে একটা পিস্তল দেখা গেল বেনের হাতে। প্রায় পেন্সিলের মত সরু মাজলটা নিখুঁতভাবে তাক করে ধরেছে সে ইন্সপেক্টরের দুই ভুরুর মাঝখানে। এমনকি রানাও হতভম্ব হয়ে পড়ল। নিখাদ যুক্তি থেকে বোঝা যাচ্ছিল বেন ঠাট্টা করছে, ওর কাছে যে সত্যিই আগ্নেয়াস্ত্র আছে তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

পাঁচ

যতই ছোট আর নিরীহ দর্শন হোক, লোকের মনোযোগ কাড়তে আগ্নেয়াস্ত্রের তুলনা মেলা ভার। খোলা আকাশের নিচে স্ট্যাচুর মত স্থির হয়ে থাকল ওরা। ডান হাত সবটা বাড়িয়ে দিয়েছে বেন, তালুর ভেতর প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে পিস্তলটা।

মাপা একটু হাসি স্থির হয়ে আছে তার মুখে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ কথা বলল না। তারপর এক হাতের তালুর ওপর আরেক হাতের মুঠো দিয়ে টাস্ করে ঘুসি বসাল রেনো। ঝট করে ইন্সপেক্টর বোথাসের দিকে ফিরে বলল, 'এরা যে সুবিধের লোক নয় সে তো আমি প্রথম থেকেই বলছি! আপনি আমার কথা কানেই তুললেন না!'

আরও কি বলতে যাচ্ছিল সে, কিন্তু রানা তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে আমরা দায়ী নই। ঠিক আছে, কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, আমরা আমাদের পথ ধরি, আপনারাও খানিক পর নিজেদের পথ ধরে ফিরে যান।'

'পিঠে গুলি খাবার কোন মানে হয় না,' বলল বেন। নারকোটিক ব্যুরোর লোক তিনজনের দিকে তাকাল সে। 'যাবার আগে ওদের গানগুলো ধার নিয়ে যাই, কি বলো, রানা?'

'না, তার কোন দরকার নেই। আমরা কেউ কাউকে গুলি করতে যাচ্ছি না।' বোথাসের চোখের দিকে তাকাল ও, তারপর রেনোর চোখের দিকে—চিন্তা আর গভীর মনোনিবেশের ভাব রয়েছে ওদের দৃষ্টিতে। 'গোটা ব্যাপারটাই ভুল বোঝাবুঝি, অথবা জেদের পরিণাম—একটা ঝোঁক আপনাদের চেপেছিল বটে, কিন্তু তাই বলে আপনারা আমাদের পিঠে গুলি করবেন এ আমি বিশ্বাস করি না। কারণ আপনারা সবাই মানুষ হিসেবে অনারেবল। তাছাড়া, সেটা প্র্যাকটিকালও হবে না। আমরা খুন হয়ে গেলে তার তদন্ত হবে, বেরিয়ে পড়বে আসল তথ্য। তাতে ফায়দা হবে শুধুমাত্র ফন হামেলের। সেই রকম, আপনারাও জানেন, আমরাও গুলি করব না। কারণ, আমাদের এমন কোন ক্ষতি হবার ভয় নেই যে আপনাদের কাউকে খুন করে সেটা ঠেকাতে হবে।'

'কি মিষ্টি ভাষণ!' বিদ্রূপের সুরে বলল রেনো। 'শুনলে কলজে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তারপর?'

'ধৈর্য,' বলল রানা, 'আগামী দশ ঘণ্টা আপনাদেরকে আমি শুধু ধৈর্য ধরতে বলি। কথা দিচ্ছি, ইন্সপেক্টর, সূর্য ডোবার আগে আবার আমাদের দেখা হবে। কথা দিচ্ছি, তখনকার পরিবেশটা আরও বন্ধুত্বপূর্ণ হবে।'

বোথাসের চেহারায় চিন্তার জায়গায় অবাক ভাব ফুটে উঠল। আরও কিছু বলার ছিল রানার, কিন্তু হঠাৎ উপলব্ধি করল, তার আর সময় নেই। বোথাস আর রেনোর পেশীতে ঢিল পড়ল, পরাজয় মেনে নিল তারা, কিন্তু পেরিয়াস ঘোঁৎ করে একটা আওয়াজ ছেড়ে মারমুখো ভঙ্গিতে দু'পা সামনে বাড়ল। মুখের শ্যামলা রঙ রাগে কালো হয়ে উঠেছে, হাত দুটো ঘন ঘন খুলছে আর মুঠো পাকাচ্ছে। রানা বুঝল, দুর্ঘটনা এড়াতে হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়া দরকার।

ট্রাকের সামনে দিয়ে ধীরে ধীরে পিছু হটল রানা, ওর আর পেরিয়াসের মাঝখানে হুড আর ফেন্ডারটাকে আড়াল হিসেবে ব্যবহার করল ও। উঠে বসল স্টিয়ারিঙ হুইলের পিছনে, রোদ লেগে সদ্য সেঁকা রুটির মত গরম হয়ে আছে সীট, উদোম পিঠ আর উরুতে ছ্যাঁকা খেয়ে কুঁচকে উঠল মুখ। স্টার্ট নিল ট্রাক। ওকে অনুসরণ করে ক্যাবে এসে উঠল বেন, মার্সিডিজের পাশে দাঁড়ানো লোকগুলোর ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যে চোখ সরাল না, খুদে পিস্তলটা তাদের দিকে তাক করে

ধরে আছে।

শান্তভাবে গিয়্যার বদল করল রানা। ব্র্যাডি ফিল্ড আর ব্লু লিডারের হোয়েলবোট ডকের দিকে ঘুরিয়ে নিল ট্রাকের মুখ। রিয়ার ভিউ মিররে তাকাল, তারপর রাস্তার দিকে, পরমুহূর্তে আবার রিয়ার ভিউ মিররে। ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে মার্সিডিজ আর তার পাশে দাঁড়ানো লোকগুলো। বাঁক নিল ট্রাক, জলপাই গাছের ঝোপের আড়ালে পড়ে গেল মার্সিডিজ আর নারকোটিক ব্যুরো।

সীটের গায়ে হেলান দিল বেন। চেহারায় রাজ্যের সন্তুষ্টি। 'দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, রাগে হাত কামড়াচ্ছে বোথাস।'

'তোমার পপগানটা দেখাও আমাকে,' বলল রানা।

মাজল ধরে রানার দিকে বাটের দিকটা বাড়িয়ে দিল বেন। 'যাদুর মত কাজ দিয়েছে, কি বলো?'

লিলিপুটিয়ান পিস্তলটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল রানা। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে রাস্তা দেখে নিল। হাতে নিয়েই পিস্তলটার পরিচয় জানতে পারল ও—ভেস্ট পকেট মাউজার, পয়েন্ট টু-ফাইভ ক্যালিবার। ইউরোপের মেয়েরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনে এই ধরনের পিস্তল পছন্দ করে। মোজা বা হাতব্যাগে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা চলে। তবে, গুলি খুব কাছ থেকে না করলে বিশেষ ক্ষতি হয় না। দূরত্ব দশ ফুটের বেশি হলে লক্ষ্যভেদ করা একজন এক্সপার্টের পক্ষেও কঠিন।

'বেন, আমরা দেখছি নিতান্তই ভাগ্যবান!'

'সে আর বলতে!' আনন্দে গদগদ হয়ে উঠল বেন।

'ওরা যদি ঠাণ্ডা না হত, তুমি কি গুলি করতে?' জানতে চাইল রানা।

'নির্দ্বিধায়,' দৃঢ় সুরে বলল বেন। 'শুধু পা অথবা হাতে গুলি করতাম। খাতির করে যারা বিয়ার খাওয়ায় তাদেরকে খুন করার কোন মানে হয় না।'

হাসি চেপে বলল রানা, 'জার্মান গান সম্পর্কে এখনও অনেক কিছু শিখতে বাকি আছে তোমার, বেন।'

চোখ জোড়া ছোট ছোট হয়ে উঠল বেনের। 'তোমার কথার মানে?'

গাধার পিঠে রাজ্যের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে তাকে টেনে নিয়ে চলেছে এক রাখাল বালক, ওদেরকে পাশ কাটাবার সময় ট্রাকের গতি একেবারে কমিয়ে আনল রানা। 'দুটো কথা বলার আছে আমার। এক, টু-ফাইভ ক্যালিবারের কোন গান একজন লোককে ঠেকাতে পারে না। পিস্তলের ক্লিপ খালি করতে পারতে তুমি, কিন্তু মাথা বা হৃৎপিণ্ডে গুলি লাগাতে না পারলে পেরিয়াসকে থামানো তো দূরের কথা ওর এগোবার গতিও কমাতে পারতে না। দুই, ট্রিগার টেপার পর কি ঘটত বলে মনে করো তুমি? বিশ্বাস করো, দেখার মত হত তোমার চেহারাখানা!'

'কেন?' বোকা বোকা দেখাল বেনকে।

বেনের কোলের ওপর পিস্তলটা ফেলল রানা। 'সেফটি ক্যাচ এখনও অন করা রয়েছে।'

বিহ্বল দৃষ্টিতে কোলের ওপর পড়ে থাকা পিস্তলটার দিকে তাকিয়ে থাকল বেন। সেটা হাত দিয়ে ধরার কোন লক্ষণই দেখা গেল না তার মধ্যে। তারপর রানার দিকে ফিরে অপ্রতিভভাবে হাসল একটু।

'ভুলে গিয়েছিলাম,' মিন মিন করে বলল সে।

'মাউজার তোমার কোন কালেই ছিল না, বাগালে কোত্থেকে?'

'তোমার এ-মাসের প্লে-মেটের কাছ থেকে। টানেলে তুমি যখন ওকে কাঁধে করে বয়ে আনছিলে, তখন। পায়ের সাথে টেপ দিয়ে আটকানো ছিল, পা ছোঁড়াছুঁড়ির সময় পড়ে যায়।'

'সেকি!' অবাক হলো রানা। 'তারমানে আমরা যখন পেরিয়াসের সাথে লড়ছিলাম তখনও ওটা তোমার কাছে ছিল?'

'ছিল।' মাথা ঝাঁকাল বেন। 'মোজার ভেতর লুকিয়ে রেখেছিলাম। ব্যবহার করব, তার সময় পেলাম কোথায়? আমি তৈরি হবার আগেই ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে তুমি। তারপর তো সব কিছু চোখের নিমেষে ঘটে গেল। মাথায় চাপ খেয়ে সব গোলমাল হয়ে গিয়েছিল আমার। হাত বাড়িয়ে মোজা থেকে বের করব সে শক্তি আমার ছিল না।'

বেনের শেষ কথাগুলো শুনতেই পেল না রানা। মাথার ভেতর একশো একটা সন্দেহ, একশো একটা প্রশ্ন। কোত্থেকে শুরু করবে, জানে না ও। কিন্তু বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাহাড়-পাঁচিলের নিচের দৃশ্যটা—তিন দিকে ফেনা আর ঢেউয়ের মাতামাতি, অথচ একদিকের পানি শান্ত এবং সমতল। ওখানে ডুব দিয়ে নিচেটা দেখার তাগিদ অদম্য হয়ে উঠল।

সামনে ব্র্যাডি ফিল্ডের মেইন গেট দেখে ট্রাকের স্পীড কমিয়ে আনল রানা।

চল্লিশ মিনিট পর বোর্ডিং ল্যাডার বেয়ে ব্লু লিডায়ে উঠল ওরা। ডেকটা খালি, কিন্তু মেস-রুম থেকে পুরুষদের হাসির কোরাস ভেসে এল, সেই কোরাসের ভারী আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল নারী-কণ্ঠের তীক্ষ্ণ খিলখিল হাসি। ভেতরে ঢুকে ওরা দেখল, জাহাজের সমস্ত বিজ্ঞানী আর ক্রু ঘিরে রেখেছে মোনাকে। মোনার পরনে কিছু নেই, অবশ্য বুকে আর নাভির নিচে গিঠ দিয়ে বেঁধে রাখা কাপড়ের খুদে টুকরো দুটোকে যদি কিছু বলে ধরে নেয়া হয় তাহলে আলাদা কথা। ভাগ্যিস চার দেয়ালের ভেতর রয়েছে সে, সৈকতে থাকলে বাতাসে উড়ে যেত কাপড়ের টুকরো দুটো। মেস-রুমের মাঝখানে একটা টেবিল, তার ওপর মধ্যমণি হয়ে বসে আছে সে। ঘরের প্রতিটি প্রাণীর দৃষ্টি তার ওপর। এভাবে সবার মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরে আনন্দ আর বাঁধ মানছে না তার।

মোনাকে ঘিরে থাকা লোকগুলোর চেহারা এবং আচরণ লক্ষ্য করল রানা। ক্রু আর বিজ্ঞানীদেরকে আলাদা করা কঠিন মনে হলো। মোনাকে খেয়ে ফেলার কাজে কেউ কারও চেয়ে পিছিয়ে নেই, অবশ্য মুখ দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে। মোনার অনাবৃত শরীরের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও চোখ সরাচ্ছে না কেউ। তবে ক্রু আর বিজ্ঞানীদের আলাদা ভাবে ঠিকই চিনতে পারল সে। ক্রুরা কথা বলছে কম, তারা মোনাকে গিলে খেতেই ব্যস্ত। তাদের খুলির ভেতর দিকের একটা দেয়াল সিনেমার পর্দার মত কাজ করছে, একের পর এক ফুটে উঠেছে সেখানে অশ্লীল সব দৃশ্য। আর প্রায় একচেটিয়া ভাবে কণ্ঠনালী ব্যবহার করছে বিজ্ঞানীরা। মেরিন বায়োলজিস্ট, মিটিয়রোলজিস্ট, জিওলজিস্ট সবাই নিজের দিকে মোনার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে স্কুল ছাত্রদের মত হৈ-চৈ জুড়ে দিয়েছে।

এই সময় মেস-রুমে এসে ঢুকল কমান্ডার হ্যানিবল। মোনা, তাকে ঘিরে থাকা লোকজন, শোরগোল ইত্যাদি লক্ষ্য করে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। কিন্তু কোন মন্তব্য না করে রানার সামনে এসে দাঁড়াল সে।

'তুমি ফিরে এসেছ দেখে আমি খুশি,' বলল সে। 'আমাদের রেডিও অপারেটরের পাগল হতে যা বাকি আছে।'

'কেন?'

'আজ সেই ভোর থেকে একের পর এক সিগন্যাল আসছে, বেচারা লিখে কুলাতে পারছে না। বেশির ভাগই তোমার কাছে পাঠানো।'

বেনের দিকে ফিরল রানা। 'চেষ্টা করে দেখো মক্ষীরাণীকে ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতে পারো কিনা। কমান্ডারের কেবিনে নিয়ে যেতে হবে ওকে, ব্যক্তিগত দুটো প্রশ্ন আছে আমার।' হ্যানিবলের দিকে ফিরল ও। 'চলো, রেডিও রুমে যাই।'

'এক মিনিট,' বাধা দিল বেন। 'মোনাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে বলছ, কিন্তু ওরা যদি বাধা দেয়? ওদের সাথে আমি একা পারব? মেরে তক্তা বানিয়ে দেবে না?'

'তেমন বিপদ দেখলে তোমার সাথে তো পিস্তল আছেই, ওটা দেখিয়ে কাজ উদ্ধার করবে,' ঠাট্টা করে বলল রানা। 'দেখো, সেফটি ক্যাচ অফ করতে ভুলো না যেন আবার!'

সদ্য ডাঙায় তোলা মাছের মত মুখটা হাঁ হয়ে গেল বেনের। কিন্তু সে কিছু বলার আগে কমান্ডারকে নিয়ে মেস-রুম থেকে বেরিয়ে গেল রানা।

বিজ্ঞানী ড. খালেদ ইব্রাহিমের মত রেডিও অপারেটরও একজন নিগ্রো, কিন্তু মুসলমান নয়। ওদেরকে ঢুকতে দেখে মুখ তুলে তাকাল সে। 'এটা আপনার, স্যার। এই মাত্র এল।' মেসেজটা কমান্ডারের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

নিঃশব্দে পড়ল হ্যানিবল, গম্ভীর হয়ে উঠল চেহারা। রানার দিকে তাকাল একবার। বলল, 'পড়ছি শোনো। টু কমান্ডার হ্যানিবল, অফিসার কমান্ডিং নুমা শিপ ব্লু লিডার। কি ছাই করছ তুমি ওখানে? তোমাকে আমি ঈজিয়ানে পাঠিয়েছি সী-লাইফ স্টাডি করার জন্যে, পুলিস-পুলিস ডাকাত-ডাকাত খেলার জন্যে নয়। তোমাকে নির্দেশ দেয়া হলো, মাসুদ রানাকে এবং প্রয়োজনে স্থানীয় ইন্টারপোলকে সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতা করবে তুমি, কিন্তু সরাসরি পুলিসী ভূমিকা নেবে না। আর ওই ছাই একটা টীজার না নিয়ে ফিরো না! অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন, নুমা, ওয়াশিংটন।'

'অ্যাডমিরালের মেজাজ ভালই আছে বলতে হবে,' মন্তব্য করল রানা। 'মাত্র দু'বার "ছাই" ব্যবহার করেছেন তিনি।'

'আচ্ছা, বলো তো,' অসহায় ভাবে কাঁধ ঝাঁকিয়ে, অভিযোগের সুরে বলল হ্যানিবল, 'তোমাকে বা ইন্টারপোলকে কিভাবে আমি সাহায্য করতে পারি?'

'ইন্টারপোলের কথা বলতে পারি না, তবে আমাকে তুমি সাহায্য করতে পারো। কিভাবে বলছি। তার আগে ছোট্ট একটা ভূমিকা। তা না হলে সমস্যাটার গুরুত্ব তুমি বুঝতে পারবে না।' একমুহূর্ত চিন্তা করে কথাগুলো গুছিয়ে নিল রানা,

তারপর বলল, 'ফন হামেলকে আটক করার একটা সুযোগ বোধহয় পেয়েছি আমি। কিন্তু চালে যদি একটু ভুল করে ফেলি, ফাঁদ কেটে পালাবে সে। যাতে পালাতে না পারে, তার বিরুদ্ধে কিছু প্রমাণ যোগাড় করা দরকার। আর তা যোগাড় করতে হলে তোমাকে খানিকটা ঝুঁকি নিতে হতে পারে।' কমান্ডারের সহযোগিতা দরকার রানার, কিন্তু জানে সহজে সেটা আদায় করা যাবে না। সেজন্যেই ভেবেচিন্তে কথা বলছে ও। 'ক্ষতির তুলনায় ঝুঁকিটা কিছুই নয়···'

'ক্ষতি?'

'ফন হামেলের জাহাজে একশো ত্রিশ টন হিরোইন রয়েছে, শিকাগোর পথে রয়েছে সেটা,' বলল রানা। 'ওই পরিমাণ হিরোইন যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডার গোটা পপুলেশনকে মাতাল করে দেবার জন্যে যথেষ্ট।'

'বলো কি!' উদ্বেগ ফুটে উঠল হ্যানিবলের চোখে। কিন্তু তা মাত্র মুহূর্তের জন্যে, তারপরই নির্লিপ্ত দেখাল তাকে। চোখ থেকে চশমা নামিয়ে দাগ আছে কিনা পরীক্ষা করতে শুরু করল। নেই দেখে আবার পরল সেটা। বলল, 'হ্যাঁ, অনেক হিরোইন। কিন্তু কথাটা কাল রাতে আমাকে বলোনি কেন, মেয়েটাকে যখন নিয়ে এলে?'

'কাউকে কিছু বলার আগে আরও প্রশ্নের উত্তর দরকার ছিল আমার। সব প্রশ্নের উত্তর এখনও আমি পাইনি। কিন্তু হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক ব্যাপার লক্ষ করে আমার ধারণা হয়েছে গোটা সমস্যার সমাধান পেতে খুব বেশি সময় লাগবে না যদি একটা ঝুঁকি নিই আমরা।'

'কি যে তুমি আশা করছ আমার কাছ থেকে তা কিন্তু এখনও আমি···'

হ্যানিবলকে থামিয়ে দিয়ে বলল রানা, 'এটা একটা আন্ডারওয়াটার শো। স্কুবা গিয়ার এবং পানিতে ব্যবহার করা যায় এমন কিছু অস্ত্রসহ তোমার জাহাজের সব ক'টা সমর্থ লোককে দরকার হবে আমার। ডাইভিং নাইফ, স্পীয়ার গান, এই ধরনের যা কিছু আছে···'

'কেউ আহত হবে না, গ্যারান্টি দিতে পারো?' গম্ভীর সুরে জানতে চাইল হ্যানিবল।

'না, পারি না।'

ঝাড়া দশ সেকেন্ড রানার দিকে তাকিয়ে থাকল কমান্ডার, চেহারায় কোনরকম ভাব নেই। তারপর বলল, 'এই রকম একটা সিরিয়াস ঝুঁকি কিভাবে তুমি নিতে বলো আমাকে? আমার জাহাজে যারা রয়েছে বেশিরভাগই বিজ্ঞানী, কমান্ডো নয়। সালিনোমিটার, মাইক্রোস্কোপ দাও, যাদুর মত কাজ দেখাতে পারবে ওরা, কিন্তু মানুষের বুকে ছুরি মারতে বললে কেঁপেই অস্থির হবে।'

'ক্রুরা?'

'নীতিগতভাবে সবাই তোমার দলে থাকতে চাইবে, কিন্তু আর সব প্রফেশনাল সী-মেনদের মত এরাও সারফেসের নিচে লুকোচুরি খেলতে পছন্দ করে না।' একটু বিরতি নিয়ে এদিক ওদিক মাথা নাড়ল হ্যানিবল। 'দুঃখিত, রানা। বড় বেশি আশা করে ফেলেছ তুমি।'

'ঠাণ্ডা মাথায় আরেকবার ভেবে দেখো ব্যাপারটা,' বলল রানা। 'পানির নিচে

ওদেরকে যুদ্ধ করতে হবে, তা আমি বলিনি। বিপদ ঘটতে পারে, তা ঠিক, আবার নাও ঘটতে পারে। ঘটতে পারে মনে করে আমরা তৈরি হয়ে নামতে চাই।'

'জানতে পারি, প্রফেশনালদের সাহায্য নিচ্ছ না কেন?'

'ডুব দিতে পারে এমন প্রফেশনাল এখানে পাব কোথায়? তাছাড়া, আর যাদের সাহায্য পেতে পারতাম তারা কোন কোন ব্যাপারে আমার সাথে একমত হতে পারেনি, কাজেই তাদের কাছ থেকে সাহায্য পাবার প্রশ্নই ওঠে না।'

চুপ করে থাকল কমান্ডার, কিন্তু মাঝে মধ্যে আপনমনে মাথা নাড়াটা থামাল না।

আবার বলল রানা, 'এখনও পঞ্চাশ মাইলের মধ্যে রয়েছে জাহাজটা। এমন একটা কার্গো বইছে, যেটা আণবিক বোমার চেয়ে কম মারাত্মক নয়। তোমার দেশেই যাচ্ছে ওটা। যদি পৌঁছুতে পারে, তোমার নাতি-নাতনীরাও কালচারাল শকওয়েভের ধাক্কায় খাবি খাবে। ভেবে দেখেছ?'

'কিছু যদি মনে না করো, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব?' থমথমে গলায় জানতে চাইল হ্যানিবল।

'নির্দ্বিধায়।'

'তোমার এত মাথাব্যথার কারণ কি?'

উত্তরটা যেন মুখে যোগানই ছিল রানার, বলল, 'কারণ, ব্লু লিডারে স্যাবোটাজের যে ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলো বন্ধ করার জন্য পাঠানো হয়েছে আমাকে, ছয় সংখ্যার ফি দিয়ে। তদন্ত করতে এসে দেখি, এর সাথে ফন হামেল জড়িত। তারপর দেখি, দুনিয়ার সেরা স্মাগলারদের একজন সে। আগে থেকেই জানা আছে, শুধু যুক্তরাষ্ট্রেই নয় চোরা পথে এশিয়াতেও পাচার হয় হিরোইন। কে জানে, ফন হামেলের এই চালানের একটা অংশ হয়তো বাংলাদেশে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। যদি তাই হয়, সেটা ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে আমাদের যুবসম্প্রদায়কে। আশা করি আমার মাথাব্যথার কারণটা বুঝতে পেরেছ এবার?'

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরেকটা প্রশ্ন করল কমান্ডার হ্যানিবল, 'আমাদের নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্ট কি করছে?'

'ওরা শিকাগোয় ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করবে,' বলল রানা। 'সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, হিরোইন এবং স্মাগলারের দলকে আটক করবে ওরা। সেই সাথে ধরা পড়বে বেআইনী ড্রাগের মোট বিক্রেতাদের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু আগেই বলেছি, সব যদি ভালয় ভালয় ঘটে, তবেই।'

'তাহলে সমস্যা কোথায়? থাসোসে বসে তোমার তো কিছুই করার নেই। পানিতে ডুব দিতে চাইছ কেন?'

'কারণ জানি, গত কয়েক যুগ ধরে নারকোটিক ব্যুরো আর কাস্টমসকে যেভাবে ফাঁকি দিয়ে আসছে ফন হামেল, এবারও সেভাবেই ফাঁকি দেবে সে। তার জাহাজ ডলফিনে এক কণা হিরোইনও পাবে না ওরা। আইন বলে, যুক্তরাষ্ট্রের কন্টিনেন্টাল শেলফে ডলফিন না পৌঁছুনো পর্যন্ত মাঝপথে কোথাও তাকে থামানো যাবে না। তারমানে তিন হপ্তা পরে পৌঁছুবে জাহাজ। ইতিমধ্যে ফন হামেল টের পেয়ে যাবে ইন্টারপোল তার পিছনে লেগেছে। তার জাহাজের হোল্ডে হিরোইন

নেই, তবে জাহাজের সাথে আছে। ইন্টারপোল পিছু লেগেছে জানার পর সে কি করবে বলে মনে করো তুমি?'

চুপ করে থাকল হ্যানিবল।

'দুটো রাস্তা খোলা থাকবে তার সামনে,' বলল রানা। 'হয় শেষ মুহূর্তে জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে নেবে, নাহয় সমস্ত হিরোইন ফেলে দেবে আটলান্টিকে। নিজেদের গায়ে থুথু ছিটানো ছাড়া আর কিছু করার থাকবে না নারকোটিক্স ব্যুরো আর কাস্টমস ডিপার্টমেন্টের। বুঝতে পেরেছ?' একটু বিরতি নিল রানা, তারপর বলল, 'এখন একমাত্র নিরাপদ উপায় হলো, জাহাজটাকে এখুনি থামানো। মেডিটেরেনিয়ান ছেড়ে যাবার আগেই।'

'কিন্তু তুমিই তো বললে, আইনের বাধা আছে, থামানো সম্ভব নয়!'

'একভাবে সম্ভব,' শান্ত ভাবে বলল রানা। 'সকালের মধ্যে ফন হামেল আর মুনমুন লাইঙ্গের বিরুদ্ধে যদি নিরেট কোন প্রমাণ যোগাড় করা যায়।'

মাথা নাড়ল কমান্ডার। 'সেক্ষেত্রেও, আন্তর্জাতিক জলসীমায় একটা জাহাজের ওপর চড়াও হওয়া, বিশেষ করে একটা বন্ধুদেশে রেজিস্টার করা জাহাজে চড়াও হওয়া অত্যন্ত ঝুঁকির ব্যাপার—রাজনৈতিক ঝুট-ঝামেলায় পড়তে হবে। সাহায্য করার জন্যে কোন দেশ এগোবে বলে আমি মনে করি না।'

'মাঝসাগরে থামাবার দরকার নেই,' বলল রানা। 'ফুয়েলের জন্যে মার্সেইতে থামছে ডলফিন। দ্রুত কাজ সারতে হবে ইন্টারপোলকে। প্রয়োজনীয় প্রমাণ হাতে পেয়ে তারা যদি তাড়াতাড়ি পেপার-ওয়র্ক সেরে ফেলতে পারে, বন্দরে থাকতেই জাহাজটাকে আটক করা সম্ভব।'

দরজার গায়ে হেলান দিল কমান্ডার। 'মোটকথা প্রমাণ যোগাড় করার আশায় আমার লোকগুলোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চাও তুমি, এই তো?'

'বিকল্প কোন উপায় থাকলে তোমার কাছ থেকে এই সাহায্য আমি চাইতাম না, হ্যানিবল।'

'কে বলল, বিকল্প উপায় নেই? মেইনল্যান্ড থেকে ডাইভার যোগাড় করা এমন কোন কঠিন ব্যাপার নয়। এটা একটা সার্চ অপারেশন, ইন্টারপোল অথবা স্থানীয় পুলিসের সাহায্যও নিতে পারো তুমি।'

চিন্তায় পড়ে গেল রানা। বুঝল, হ্যানিবলকে সহজে রাজি করানো যাবে না। তাকে রাজি করাতে হলে সব কথা খুলে বলতে হবে, বলতে হবে নাটকীয় আবেদনের সাহায্যে।

চট করে রেডিও অপারেটরের দিকে একবার তাকাল ও, তারপর নিচু গলায় বলল, 'তোমার কোন ধারণা আছে, ব্যাডি ফিল্ডে কেন হামলা চালানো হয়েছিল?'

'তুমিই একটা ধারণা দিয়েছিলে—ব্লু লিডারকে থাসোস থেকে সরাবার জন্যে।'

'হ্যাঁ। কিন্তু থাসোস থেকে ব্লু লিডারকে সরিয়ে কি লাভ ফন হামেলের?'

'তুমিই জানো!'

'জানি,' দৃঢ় সুরে বলল রানা। 'শোনো তাহলে।'

একটু দম নিয়ে শুরু করল ও, 'ফন হামেলের গোটা স্মাগলিং অপারেশন টিকে

আছে একটা সাবমেরিন ঘাঁটির ওপর। তার সাবমেরিনের সংখ্যা একটা নাকি দশটা তা এখনও আমরা জানি না। এবারের এই হিরোইনের চালানটাই তার সবচেয়ে বড় চালান, এ-থেকে প্রায় তিনশো মিলিয়ন ডলার রোজগার করবে সে। তার প্ল্যানটা চমৎকার, সামনে কোন বাধাই নেই। একদিন জানালার সামনে দাঁড়িয়ে সে দেখতে পেল, মাত্র দু'মাইল দূরে একটা ওশেনোগ্রাফিক রিসার্চ শিপ নোঙর ফেলেছে। খোঁজ নিয়ে যখন জানল তোমরা আদি যুগের একটা মাছ ধরার জন্যে পানি তোলপাড় করছ, ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেল তার। কারণ, তোমাদের যে-কোন একজন ডাইভার পানির নিচে ডুব দিয়ে মাছের খোঁজ করার সময় তার গোপন ঘাঁটির দেখা পেয়ে যেতে পারে। সাবমেরিন ঘাঁটি আবিষ্কার হওয়া মানে সেই সাথে তার স্মাগলিঙের পদ্ধতিও জানাজানি হয়ে যাওয়া। কাজেই, মরিয়া হয়ে উঠল ফন হামেল।'

পকেট হাতড়ে ধূমপানের উপকরণ খুঁজল কমান্ডার, না পেয়ে বেজার হয়ে উঠল চেহারা।

'ব্লু লিডারকে পানি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে, সে উপায় তার ছিল না,' বলে চলল রানা। 'কারণ তাহলে পানির নিচে ফুল স্কেল ইনভেস্টিগেশন চালানো হবে। কাজেই ব্ল্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাতে হলো তাকে, এই আশায় যে বিপদ হতে পারে ভেবে কর্নেল কোসকি তোমাকে থাসোস ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেবে। কিন্তু ব্ল্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়েও যখন কোন কাজ হলো না, অগত্যা সরাসরি ব্লু লিডারের ওপর আঘাত করার জন্যে আবার অ্যালব্যাট্রসকে পাঠাল সে।'

'ঠিক বুঝছি না,' বলল হ্যানিবল। 'তবে তোমার কথায় যুক্তি আছে, খাপে খাপে মিলেও যাচ্ছে। শুধু সাবমেরিনের ব্যাপারটা ছাড়া। একজন সিভিলিয়ান সাবমেরিন পাবে কোত্থেকে? ওটা তো আর খোলা বাজারে বিক্রি হয় না।'

'হয় না,' সায় দিয়ে বলল রানা। 'কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় শ্যালো ওয়াটারে যেগুলো ডুবে গেছে সেগুলো উদ্ধার করা যায়।'

'ইন্টারেস্টিং!'

উৎসাহের সাথে আবার বলল রানা, 'কাজটা প্রফেশনাল ডাইভারদের। কিন্তু একটা টীম তৈরি করতে যথেষ্ট সময় দরকার ইন্টারপোলের, অতটা সময় পাওয়া যাবে না।' কথাটা পুরো নয়, অর্ধেক সত্যি। 'যা করার এখুনি করতে হবে। এই মুহূর্তে মেডিটেরেনিয়ানে শুধু তোমার হাতেই রয়েছে দক্ষ ডাইভার আর উপযুক্ত ইকুইপমেন্ট।'

'হুঁ,' গম্ভীর সুরে বলল হ্যানিবল।

'ফন হামেলের ভিলার নিচে, সাগরের খানিকটা খুঁজে দেখতে চাই আমি। হয়তো মিছে আশা করছি, কিছুই পাব না। আবার জাহাজটাকে মার্সেইতে থামাবার জন্যে ফন হামেলের বিরুদ্ধে যথেষ্ট এভিডেন্স পেয়েও যেতে পারি। পাই বা না পাই, চেষ্টা করে দেখতে হবে আমাদের।'

কিছু বলল না হ্যানিবল। চেহারায় গভীর চিন্তা আর মনোনিবেশের ছাপ ফুটে উঠল।

'গোলাপী অ্যালব্যাট্রসের কথা নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি?' জানতে চাইল রানা।

'পানিতে ডুব দিতে পারলে আমরা হয়তো সেটাকেও পেয়ে যেতে পারি।'

রানার দিকে তাকাল হ্যানিবল। মনে মনে ভাবল, এমন মানুষ দেখিনি আর, কোনমতে আশা ছাড়ে না! 'ঠিক আছে, সাহায্য করব। জানি, আমার কোর্ট-মার্শালের সময় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ব আর অভিশাপ দেব তোমাকে, কিন্তু এই মুহূর্তে তোমার মত একজন নাছোড়বান্দাকে এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে, কোর্ট-মার্শাল হলে একটা হৈ-চৈ পড়ে যাবে, খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হবে, এইটুকুই সান্ত্বনা!'

'সে ভাগ্য করে আসোনি তুমি,' হেসে উঠে বলল রানা। 'কিভাবে কি করলে তোমার কোর্ট-মার্শাল হবে না, বলে দিচ্ছি। যাই ঘটুক না কেন, তুমি বলবে—ক্লিফের নিচে একটা শেলফ থেকে মেরিন স্পেসিমেন যোগাড় করার জন্যে ডাইভার নামিয়েছিলে তুমি। যদি কোন অস্বস্তিকর অঘটন ঘটেই, বলবে, ওটা একটা দুর্ঘটনা মাত্র।'

'ওয়াশিংটন বিশ্বাস করলেই হয়।'

'মেসেজে অ্যাডমিরাল কি বলেছেন, এরই মধ্যে ভুলে গেছ?'

'না, ভুলিনি। মাসুদ রানাকে সাহায্য করতে হবে।'

'ঠিক তাই করতে যাচ্ছ তুমি, কাজেই দুশ্চিন্তার কিছু নেই তোমার।'

পকেট থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছল কমান্ডার। 'এখান থেকে কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'কোথাও যাবার দরকার নেই তোমার। টীমটা তৈরি করে ফেলো। বিকেলের মধ্যে সব ইকুইপমেন্ট ফ্যানটেইলে জড়ো করো। টীমের সাথে সময় মত কথা বলব আমি।'

হাতঘড়ি দেখল কমান্ডার। 'ন'টা। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ডাইভ দেবার জন্যে তৈরি করতে পারি ওদেরকে। তিন ঘণ্টা অপেক্ষা করতে বলছ কেন?'

'ঘুম বাকি পড়েছে, এই তিন ঘণ্টায় সেটা আদায় করে নিতে চাই,' মৃদু হেসে বলল রানা। 'সারফেসের ষাট ফুট নিচে নেমে ঢুলতে চাই না।'

'ভাল কথা, আমার একটা উপকার করো দেখি।'

'বলো?' চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল রানা।

'যত তাড়াতাড়ি পারো মেয়েটাকে তীরে পাঠিয়ে দাও। তা না হলে আমার ক্রু আর বিজ্ঞানীদের চরিত্র ঠিক রাখা যাবে না।' কৃত্রিম গাম্ভীর্য ফুটে উঠল হ্যানিবলের চেহারায়। 'আমার নিজের কথাটা না হয় নাই বললাম!'

'ডাইভ থেকে ফিরে আসার আগে নয়,' বলল রানা। 'যতক্ষণ জাহাজে আছে, ওর ওপর নজর রাখার লোক পাব আমরা।'

'ওর ওপর নজর···মেয়েটা কে, রানা?'

'যদি বলি ফন হামেলের নাতনী, বিশ্বাস করবে?'

'হোয়াট!' থ হয়ে গেল হ্যানিবল।

'তোমার ভয় পাবার কোন কারণ নেই,' আশ্বাস দিয়ে বলল রানা। 'ও যে এখানে আছে ফন হামেল এখনও তা জানে না।'

আকাশের দিকে চোখ তুলে বিড়বিড় করে বলল হ্যানিবল, 'কৃপা করো, যীশু!'

বলে রেডিও রূম থেকে বেরিয়ে গেল সে।

ফাঁকা দরজা-পথ দিয়ে দূরে, সাগরের বুকে তাকাল রানা। নীল পানিতে তুমুল ঢেউ উঠেছে। না তাকিয়েও বুঝতে পারল ও, পিছনে নিজের সেটের ওপর ঝুঁকে ট্র্যান্সমিট করছে রেডিও অপারেটর। ক্লান্ত লাগল ওর। ইচ্ছে হলো এখানেই কোথাও শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

'মাফ করবেন, স্যার,' পিছন থেকে বলল রেডিও অপারেটর। 'এগুলো আপনার কমিউনিকেশন।'

একটু ঘুরে নিঃশব্দে হাত বাড়াল রানা।

'এটা ছ'টার সময় এসেছে, মিউনিখ থেকে,' বলল অপারেটর। 'বাকি দুটো এসেছে সাতটায়, বার্লিন থেকে।'

'ধন্যবাদ। আর কিছু?'

'আর এই শেষটা, স্যার···এর ব্যাপারটা ঠিক বুঝলাম না। কলসাইন নেই, রিপিট নেই, সাইন অফ নেই—শুধু মেসেজ।'

মেসেজগুলো নিল রানা। সবচেয়ে ওপরের কাগজে চোখ বুলাল। ধীরে ধীরে গম্ভীর একটু হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। মেসেজটা হুবহু এই রকম—'মেজর মাসুদ রানা, নুমা শিপ বু লিডার। ওয়ান আওয়ার ডাউন, নাইন টু গো। এইচ. জেড'।

'এনি···এনি রিপ্লাই, মেজর?' বলেই আঁতকে ওঠার মত ক্ষীণ শব্দ করল রেডিও অপারেটর।

'কি ব্যাপার?' দ্রুত জানতে চাইল রানা। 'তুমি অসুস্থ নাকি?'

'হ্যাঁ···মানে, সকাল থেকে শরীরটা ভাল নেই, স্যার। বোধহয় ফ্লু।' পেটটা খামচে ধরে মুখ বিকৃত করল সে, 'সেই সাথে পেট ব্যথা।'

'ডাক্তারকে দেখিয়ে ঠিক করে নাও,' বলল রানা। 'আগামী চব্বিশ ঘণ্টা রেডিওতে ভাল একজন লোক দরকার আমার।'

জোর করে একটু হাসল অপারেটর। 'হঠাৎ যদি মারা না যাই, আমার ওপর ভরসা রাখতে পারেন, মেজর।'

রেডিও রূম থেকে বেরিয়ে জাহাজের ডাক্তারকে খুঁজে বের করল রানা, তাকে অপারেটরের কথা জানিয়ে ঢুকল কমান্ডারের কেবিনে।

সব পর্দা ফেলা, ভেতরটা অন্ধকার মত। ভেন্টিলেটর দিয়ে ঢুকে কেবিনটাকে ঠাণ্ডা করে রেখেছে বাতাস। ডেস্কের ওপর আবছা একটা মূর্তিকে বসে থাকতে দেখল ও। মোনা। ভাঁজ করা একটা হাঁটুর ওপর থুতনি রেখেছে সে। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল।

'এত দেরি করলে যে?' জানতে চাইল সে।

'কাজ ছিল,' ঠাণ্ডা সুরে বলল রানা।

'কিন্তু কথা তো এই রকম ছিল না!' তীক্ষ্ণ শোনাল মোনার গলা। 'অ্যাডভেঞ্চারের কথা বলেছিলে, কোথায় সেই অ্যাডভেঞ্চার? তোমাকে কাছে পাওয়াই মুশকিল, ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শুধু উড়ে বেড়াচ্ছ।'

একটা চেয়ার টেনে বসল রানা। 'কর্তব্যের ডাক পড়লে সাড়া দিতে হয়।' সাথে সাথে প্রসঙ্গ বদল করল ও। 'শরীরে কিছুটা কাপড়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছে,

পেলে কোথায়?'

'লজ্জা নিবারণের ব্যবস্থা আমার নতুন বয়-ফ্রেন্ড মেজর মাসুদ রানারই করা উচিত ছিল,' বিদ্রূপের সুরে বলল মোনা। 'কিন্তু সে যখন ব্যর্থ হলো, তখন বাধ্য হয়েই মাথার বালিশের সাহায্য নিতে হলো আমাকে।'

'মানে?'

'বালিশের কাভারটা পছন্দ হয়ে গেল আমার,' হাসতে হাসতে বলল মোনা। 'চমৎকার ছিট। সুঁই-সুতো নেই, কাজেই গিঠ বেঁধে বুকে আর হিপে জড়িয়ে নিলাম।'

আবছা অন্ধকার সয়ে এল চোখে, মোনার অনাবৃত শরীর থেকে চোখ সরিয়ে রাখা সমস্যা হয়ে দেখা দিল রানার জন্যে। চেহারায় একটু কাঠিন্য ফুটিয়ে তুলে বলল ও, 'তোমার সাথে সিরিয়াস একটা আলাপ আছে আমার।'

কয়েক সেকেন্ড অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল মোনা। কিছু বলতে গেল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সামলে নিল নিজেকে। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'কেমন যেন রহস্য আছে তোমার আচরণে।'

'আমার কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর দাও।'

'বলো।'

'তোমার নানার স্মাগলিং অপারেশন সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

বিস্ফারিত হলো মোনার চোখ। 'তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না!'

রানার চেহারা আরও কঠিন হলো। 'আমার ধারণা পারছ।'

'তুমি পাগল হলে নাকি?' বিস্মিত কণ্ঠে বলল মোনা। 'আমার নানা একটা শিপিং লাইন্সের মালিক। তার মত একজন ধনী, মর্যাদাবান মানুষ চোরাচালানের মত নোংরা কাজে জড়াবে কেন?'

'আর সবার কাছে যা নোংরা তোমার নানার কাছে তা নোংরা নয়। একটা জিনিসই চায় সে, তা হলো—আরও টাকা। এই টাকার জন্যে করতে পারে না এমন কোন কাজ নেই।'

হতভম্ব চেহারা নিয়ে তাকিয়ে থাকল মোনা।

'তুমি থাসোসে আসার আগে শেষ বার কবে ফন হামেলকে দেখেছ?'

'থাসোসে আসার আগে শেষবার···সে একেবারে ছোট বেলায়,' বলল মোনা। 'হঠাৎ ঝড়ের মধ্যে পড়ে সেইলবোট উল্টে যাওয়ায় আইল অভ ম্যানে আমার মা-বাবা ডুবে মারা যায়। নানা তখন ওদের সাথেই থাকত। আমিও। নানাই আমাকে বাঁচায়। সেই দুর্ঘটনার পর থেকে নানা আমার সাংঘাতিক কেয়ার নিতে শুরু করে। সবচেয়ে ভাল বোর্ডিং স্কুলে পাঠায়। যখন যত টাকা দরকার চেয়েছি, দিয়েছে। আমার বার্থ-ডের কথা কখনও ভোলেনি।'

'ও কি তোমার মায়ের বাবা? মানে···তোমার আপন নানা?'

'না, তা কেন হবে! আমার মায়ের মামা, সেই সূত্রে আমার নানা।'

'তাই?'

'কিন্তু তোমার এসব কথার মানে···'

'আমার আরও প্রশ্ন আছে,' মোনাকে বাধা দিয়ে বলল রানা। 'সেই

ছোটবেলায় দেখেছ, তারপর এই দেখা হলো, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? মাঝখানের লম্বা সময়টা দেখা হয়নি কেন?'

'লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম আমি,' বলল মোনা। 'তাছাড়া, যত বারই থাসোসে আসতে চেয়েছি, ততবারই চিঠি লিখে নানা জানিয়েছে, সে এখন সাংঘাতিক ব্যস্ত, ব্যবসা নিয়ে মহা ঝামেলায় আছে, পরে এক সময় নিজেই ডেকে পাঠাবে। কিন্তু পড়াশোনা শেষ করে আমি ধৈর্য ধরতে পারিনি।' ক্ষীণ একটু হাসি দেখা গেল মোনার ঠোঁটে। 'কিছু না জানিয়ে, কোন খবর না দিয়ে, সোজা চলে এসেছি থাসোসে।'

'ওর অতীত সম্পর্কে কি জানো তুমি?'

'কি করে জানব!' অবাক দেখাল মোনাকে। 'নিজের ব্যাপারে আলাপ করলে তো! কিন্তু আমি জানি, নানা স্মাগলার নয়।'

মোনা যে মিথ্যে কথা বলছে সে-ব্যাপারে রানার মনে কোন সন্দেহ নেই। মেয়েটাকে ব্যথা দিতে খারাপ লাগল ওর, কিন্তু রূঢ় সত্যি কথাগুলো না বলেও পারল না। 'তোমার নানা একটা শয়তান। এই যে আজ দেখছ মাল্টি-মিলিওনিয়ার হয়ে বসে আছে, এর জন্যে ক'হাজার লোককে খুন করেছে সে তা একমাত্র খোদাই জানে। তার সাথে গলা পর্যন্ত তুমিও ডুবে আছ, মোনা। গত বিশ বছরে যে ক'টা ডলার খরচ করেছ, সবগুলো রক্ত-মাখা। তার মধ্যে কিছু ডলার শুধু রক্ত নয়, অবোধ শিশু আর অবলা মেয়েদের চোখের পানিতেও ভেজা।'

লাফ দিয়ে ডেস্ক থেকে নেমে দু'কোমরে হাত রাখল মোনা। 'এই গাঁজাখুরি গল্প তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে বলো? বিংশ শতাব্দীতে এ-ধরনের ঘটনা ঘটে না! তুমি মিথ্যে কথা বলছ। সব বানানো।' এতক্ষণে সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে গেছে সে। রানার বিশ্বাস, চমৎকার অভিনয় করছে মোনা! 'মিথ্যে কথা বলা স্বভাব নয় আমার। বলেছি আমি কিছু জানি না, সেটাই সত্যি।'

'কিছুই জানো না? ভিলায় আমাকে খুন করার মতলব করেছিল ফন হামেল, তুমি জানতে না? টেরেসে বসে চমৎকার অভিনয় করলে চোখে টলমল করে উঠল পানি—স্বীকার করছি, বোকা বানাতে পেরেছিলে! কিন্তু খুব বেশি সময়ের জন্যে নয়। জানতে পারি, কোত্থেকে শিখেছ অভিনয়টা?'

'রানা, শুধু শুধু প্রলাপ বকছ তুমি। বিশ্বাস করো…'

মাথা নাড়ল রানা। 'কিন্তু তোমার আচরণ ঠিক উল্টো কথা বলে। টানেল থেকে বেরুবার সময় ট্যুরিস্ট গাইড আমাদেরকে যখন গ্রেফতার করল তখনই তুমি ধরা পড়ে গেছ। আমাকে দেখে তুমি যে শুধু অবাক হয়েছিলে তাই নয়, প্রায় অক্ষত দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিলে।'

ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল মোনা। রানার একটা হাত ধরল সে। 'প্লীজ, প্লীজ…ওহ্ গড! রানা, বলো, কি করলে আমার কথা বিশ্বাস করবে তুমি…?'

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল রানা। চোখ নামিয়ে দেখল, মুখ তুলে ওর দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মোনা।

'সত্যি কথা বলো, তাহলেই হবে,' বলল রানা। ঢিলে হয়ে থাকা বুকের ব্যান্ডেজটা এক টানে খুলে ফেলল ও, মোনার কোলের ওপর ফেলল সেটা। 'দেখেছ? তোমার ডিনারের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে কতটা লাভ হয়েছে আমার! তোমার প্রিয় নানা তার কুকুরের খাবার হিসেবে টানেলে পাঠিয়েছিল আমাকে।'

চোখ দুটো ঢুলু ঢুলু হয়ে উঠল মোনার। 'রানা···মাথা ঘুরছে···শরীর খারাপ লাগছে আমার···'

রানার ইচ্ছে হলো ঝুঁকে পড়ে বুকে তুলে নেয় ওকে, চোখ মুছিয়ে দিয়ে চুমো খায়, নরম গলায় বলে দুঃখিত—কিন্তু সেসব কিছু না করে চেহারাটা আরও কঠোর করে তোলার চেষ্টা করল ও। 'ন্যাকামি রাখো!' রূঢ় কণ্ঠে বলল ও। 'ভেবেছ চোখে পানি দেখলেই গলে যাব আমি?'

মোনার ঢুলু ঢুলু চোখ জোড়া হঠাৎ দপ করে জ্বলে উঠল। রানার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকার পর ফিসফিস করে বলল, 'ফন নানার কথা বলছ, কিন্তু তুমি কি? শয়তান! পাষাণ! তুমি খুন হয়ে গেলে খুশিই হতাম আমি!'

মোনার দু'চোখে ঘৃণা ফুটে উঠতে দেখল রানা, কিন্তু সেই সাথে মনে হলো, দৃষ্টিতে বিষাদের ছায়াও ডানা মেলেছে। 'আমি না বলা পর্যন্ত এই জাহাজেই থাকছ তুমি।'

'আমাকে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই তোমার।'

'নেই, কিন্তু পারি। জাহাজের লোকেরা সবাই পাকা সাঁতারু, পালাবার চেষ্টা করলে ধরা পড়ে যাবে—কথাটা ভুলো না।'

'কি মনে করো নিজেকে—কদ্দিন আটকে রাখতে পারবে তুমি আমাকে?'

'আমার প্ল্যানটা যদি কাজে লেগে যায়, আজ বিকেলের মধ্যেই ঘাড় থেকে নামিয়ে পুলিসের হাতে তুলে দেব তোমাকে।'

তীক্ষ্ণ হলো মোনার দৃষ্টি। 'কিসের প্ল্যান?'

মোনার পটলচেরা চোখজোড়া অদ্ভুত এক মোহ বিস্তার করল রানার মনে। দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল ও। 'আজ ভোরের একটু আগে তোমার নানার একটা জাহাজে চড়েছিলাম আমি। কি পেয়েছি কল্পনাও করতে পারবে না তুমি!' বলেই মোনার দিকে তাকাল ও। কিন্তু মুখের ভাব দেখে বুঝল না কিছুই।

'জাহাজ বলতে ফেরীতে চড়েছি বার কয়েক,' বোকা বোকা দেখাল মোনাকে। 'কি পেতে পারো আমার পক্ষে তা আন্দাজ করা সম্ভব নয়।'

পিছিয়ে এসে বাঙ্কের ওপর বসল রানা। হেলান দিল। মুখের সামনে হাত তুলে অলসভঙ্গিতে একটা হাই তুলল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যখন দেখল রানা কথা বলতে চাইছে না, জিজ্ঞেস করল মোনা, 'কি পেয়েছ?'

'মানে?'

'নানার জাহাজ থেকে কি পেয়েছ তুমি?'

মাথা নেড়ে নিঃশব্দে হাসল রানা। 'মেয়েলী কৌতূহল, একবার জাগলে দমিয়ে রাখা কঠিন, তাই না? এতই যখন জানতে চাইছ···একটা আন্ডারওয়াটার কেভের ম্যাপ পেয়েছি আমি।'

'কেভ?'

'হ্যাঁ, কেভ। তোমার সাধু নানা ওই গুহা থেকেই তো ব্যবসা চালায়।'

'এসব কথা আমাকে শোনাবার মানে কি?' মোনার চেহারায় আবার আহত ভাবটা ফিরে এল। 'এর আমি কিছুই বিশ্বাস করি না।'

সিলিঙের দিকে তাকাল রানা। 'ওহ্ গড, ওর মাথায় অন্তত এইটুকু বুদ্ধি দাও যাতে বুঝতে পারে যে সব ফেঁসে গেছে!' মোনার চোখে চোখ রাখল ও। 'আমার ধারণা, এসব তোমার কাছে নতুন কোন তথ্য নয়। ইন্টারপোল, পুলিস, নারকোটিক ব্যুরো এদের সবার চোখে ধুলো দিতে পারে ফন হামেল, কিন্তু তুমি তার সাথে এক বাড়িতে থেকে কিছুই জানো না এ হতে পারে না।'

'প্রলাপ বকছ...'

'তাই কি? আজ ভোর সাড়ে চারটের সময় তোমার নানার জাহাজ ডলফিন ভিলার নিচে সাগরে নোঙর ফেলে। ওই জাহাজের সাথে হিরোইন ছিল, সেটা তোমার অজানা থাকার কথা নয়। সবাই জানে!'

'জানতে পারে,' মুখ কালো করে বলল মোনা। 'আমি জানি না।'

'বুঝলাম, তোমাকে স্বীকার করানো আমার কম্মো নয়। কিন্তু জেনে রাখো, কিছু না জানার ভান করে তোমার নানার কোন উপকারে লাগতে পারবে না তুমি। অ্যাদ্দিন যাদু দেখিয়েছে সে, কিন্তু তাকে বেকুব বানাবার মত দু'একটা যাদু আমরাও এখন দেখাব।'

কিছুক্ষণ রানার মুখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইল মোনা, 'কি করতে চাও তুমি?'

'লোকজন নিয়ে পানিতে ডুব দেব, যতক্ষণ না কেভটা খুঁজে পাই। ভিলার ঠিক নিচে, ক্লিফ বেসের গোড়ায় থাকার কথা ওটার। ভেতরে ঢুকে ইকুইপমেন্ট আর এভিডেন্স যা কিছু পাই সীজ করব, আটক করব তোমার প্রিয় নানাকে, তারপর পুলিস ডাকব।'

'তুমি পাগল হয়ে গেছ,' অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল মোনা। 'মরীচিকার পেছনে ছুটছ! কি করে বোঝাব, এসব কিছুই সত্যি নয়! প্লীজ, প্লীজ, পাগলামি বাদ দিয়ে মাথা ঠাণ্ডা করো...'

'কেঁদে-ককিয়ে আমাকে বোকা বানাতে পারবে না, মোনা। তোমার নানা আর তার টাকা, ধরে নাও সব হারিয়েছ তুমি। বেলা একটায় ডুব দিতে যাচ্ছি আমরা।' আবার একটা হাই তুলল রানা। 'এখন যদি কিছুটা দয়া করো, একটু চোখ বুজতে পারি আমি।'

নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল মোনা। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াল সে। বেরিয়ে গেল কমান্ডারের কেবিন থেকে। দরজা বন্ধ হবার আওয়াজ পেল রানা।

মেয়েটা কি সত্যি কিছু জানে না? উঁহুঁ, তা কি করে হয়! হয়তো সবটা নয়, কিন্তু জানে।—ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়ল রানা।

ছয়

প্রতিমুহূর্তে আকারে বড় হচ্ছে ঢেউগুলো। উঁচু হতে হতে সুন্দর ছোটখাট পাহাড় হয়ে উঠছে এক একটা। মাথায় গজাচ্ছে সাদা ফেনার ঝুঁটি। তারপর ঝুঁটিসহ মাথার দিকটা সাপের ফণার মত বেঁকে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ড পরপর এই আকৃতির বিশাল ঢেউ একের পর এক গুঁতো মারছে খাড়া নেমে আসা পাহাড়-প্রাচীরের গায়ে, জোর আওয়াজ তুলে বিস্ফোরিত হচ্ছে। রোদে তাতানো বাতাস, দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে ঝিরঝির করে বইছে। ঠিক এই দুপুর বেলা উন্মাদ সাগরে মহা-আলোড়নের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে এল ব্লু লিডার।

শেষ মুহূর্তে হেলম ঘুরিয়ে পাথুরে ক্লিফ বেসের সমান্তরাল রেখায় কোর্স স্থির করল কমান্ডার হ্যানিবল। ফ্যাদোমিটারের গ্রাফ পেপারের ওপর আসা-যাওয়া করছে কাঁটা, ঘন ঘন সেটার দিকে তাকাল সে। তার বাকি অর্ধেক মনোযোগ কেড়ে নিল ফেনা-রেখা, খুব বেশি হলে পঞ্চাশ গজ দূরে।

'কীল থেকে দশ ফ্যাদম নিচে বটম,' বলল সে। শান্ত, সংযত কণ্ঠস্বর। চেহারায় উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই।

'ষাট ফুট?' অবাক দেখাল রানাকে। ফ্যাদোমিটার বা ফেনা-রেখার দিকে নয়, সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ক্লিফ বেস থেকে একশো গজ দূরেও নেই আমরা, অথচ এত গভীরতা?'

হেলম থেকে একটা হাত তুলে মাথার নেভী ক্যাপটা নামাল হ্যানিবল, কপাল জুড়ে ফুটে থাকা মুক্তোর মত বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা গেল। 'আউটার রীফ ফ্রী এরিয়ায় এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

মাথা ঝাঁকিয়ে বলল রানা, 'লক্ষণটা ভাল।'

'মানে?'

'সারফেস ডিটেকশন ছাড়াই নড়াচড়ার প্রচুর জায়গা পেতে পারে এখানে একটা সাবমেরিন।'

খানিক পর মন্তব্য করল কমান্ডার। 'হয়তো, শুধু রাতে। দিনের বেলা চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। ওয়াটার ভিজিবিলিটি একশো ফুটের মত। যে-কোন দিকে একমাইলের মধ্যে কেউ যদি উঁচু পাড়ে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তাকায়, দেখতে পাবে তিনশো ফুট লম্বা একটা খোল হামাগুড়ি দিচ্ছে।'

'একই কথা একজন ডাইভার সম্পর্কেও,' চিন্তিতভাবে বলল রানা। ঘাড় ফিরিয়ে ডিলার দিকে তাকাল ও। পাহাড়ের ওপর প্রকাণ্ড একটা দুর্গের মত লাগল দেখতে। 'না দেখতে পাবার কোন কারণ নেই।'

'জেনেশুনে ভয়ঙ্কর একটা ঝুঁকি নিয়েছ তুমি, রানা,' ধীরে ধীরে বলল হ্যানিবল। 'তোমার এই তৎপরতা ফন হামেলের কাছে গোপন থাকবে না। আমার বিশ্বাস, ব্লু লিডার নোঙর তুলছে দেখে সেই যে চোখে বিনকিউলার তুলেছে সে, এখনও

নামায়নি।'

'জানি,' বিড়বিড় করে বলল রানা। দৃশ্যটা এত সুন্দর, কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার ভেতর নিজেকে হারিয়ে ফেলল ও। প্রাচীন দ্বীপটাকে আদর-সোহাগ দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে নীলচে-রূপালী ঈজিয়ান। মাঝ সাগরে নিঃসঙ্গ একটা দ্বীপ, তাকে ঘিরে ঢেউ, ফেনা আর স্রোতের মাতামাতি। ফেনার পাহাড় আছাড় খেয়ে ছড়িয়ে পড়ার আওয়াজকে ছাপিয়ে শোনা গেল রু লিডার ইঞ্জিনের একটানা, একঘেয়ে শব্দ। কদাচ মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল দু'একটা সী গাল, সমস্ত আওয়াজকে ম্লান করে দিল তাদের তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর। পাথুরে পাহাড়-প্রাচীরের মাথার কাছে, সবুজ ঢালে চরে বেড়াচ্ছে একদল গরু-ছাগল, খুদে সচল বিন্দুর মত দেখাচ্ছে ওগুলোকে। খাটো ক্লিফগুলোর মাঝখানে কিছু গুহা রয়েছে, ঝিনুক ছড়ানো মেঝেতে পড়ে আছে ভেসে আসা গাছের ডাল-পালা, শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হঠাৎ খেয়াল হলো রানার, শান্ত-সমতল পানির সীমানা কাছে চলে আসছে, খুব বেশি হলে পোর্ট বো-র দিকে আর পৌনে এক মাইল দূরে। হ্যানিবলের একটা কাঁধে হাত রাখল ও, অপর হাত তুলে দেখাল সেদিকটা।

'ওই যে, শান্ত পুকুর।'

মাথা ঝাঁকাল কমান্ডার। 'হুঁ।' কিছুক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকার পর আবার বলল সে, 'এই স্পীডে ওখানে পৌঁছুতে দশ মিনিট লাগবে। তোমার টীম রেডি তো?'

'রেডি। কি আশা করার আছে জানে ওরা। স্টারবোর্ড কেবিন ডেক বরাবর লাইনবন্দী দাঁড় করিয়ে রেখে এসেছি সবাইকে। ভিলা থেকে কেউ যদি তাকিয়েও থাকে, ওদেরকে দেখতে পাবে না।'

মাথায় আবার ক্যাপ পরল কমান্ডার। 'খোলের কাছ থেকে যত বেশি দূরে সম্ভব পড়তে হবে ওদেরকে। লাফ দেবার আগে সবাইকে আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিয়ো। প্রপেলারের সাথে একবার জড়িয়ে পড়লে হাড়-মাংসের টুকরো ছাড়া আর কিছু খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

'সবাই জানে, বলে দিতে হবে না। তুমিই বলেছ, ওরা সবাই দক্ষ ডাইভার।'

'তা ঠিক।' রানার দিকে ফিরল কমান্ডার। 'আরও তিন মাইল শোর-লাইনের গা ঘেঁষে এগোব আমি, তাতে ফন হামেলকে একটা ভুল ধারণা পাইয়ে দেয়া যেতে পারে। অতদূর এগোতে দেখে সে হয়তো ভাববে সাগরের নিচেটা চার্ট করার জন্যে এটা আমাদের রুটিন সাউন্ডিং কোর্স।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'হয়তো মিছেই আশা করছি। হয়তো ফন হামেল এরই মধ্যে আমাদের উদ্দেশ্য টের পেয়ে গেছে।'

প্রসঙ্গটা এড়িয়ে গেল রানা। ঝুঁকিটা নিয়ে নিজেই কেমন একটু দ্বিধায় পড়ে গেছে ও। কি ভাবছে সে-কথা বলে হ্যানিবলের উদ্বেগ বাড়াতে চায় না। জানতে চাইল, 'কখন ফিরে আসছ তুমি?'

'ফেরার পথে এখানে সেখানে থামব, তারপর এখানে পৌঁছুব দুটো দশে। তারমানে সাবমেরিনটাকে খুঁজে বের করে বেরিয়ে আসতে পঞ্চাশ মিনিট সময় পাবে তোমরা।' ব্রেস্ট পকেট থেকে একটা সিগার বের করে ধরাল কমান্ডার।

'তুমি আর সবাইকে নিয়ে জাহাজের অপেক্ষায় থাকবে, মনে আছে তো?'

সাথে সাথে উত্তর দিল না রানা। তারপর ধীরে ধীরে হাসি ছড়িয়ে পড়ল ওর সারা মুখে।

অবাক দেখাল হ্যানিবলকে। 'হাসির কিছু বলেছি কি?'

'তুমি আমাকে এক বুড়োর কথা মনে করিয়ে দিলে,' বলল রানা। মেজর জেনারেল রাহাত খানের চেহারাটা ভেসে উঠল ওর চোখের সামনে। 'আমাকে কোথাও পাঠাতে হলে দুশ্চিন্তায় কাহিল হয়ে পড়ে। যদিও চেহারায় বা কথায় সেটার কোন প্রকাশ থাকে না।'

'হেঁয়ালির সময় নয় এটা,' গম্ভীর সুরে বলল হ্যানিবল। কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর আবার বলল সে, 'তোমরা যদি ফিরে না আসো, অন্তত জানি কোথায় খোঁজ করতে হবে।' রানার দিকে ফিরল সে। 'নাও, তৈরি হও। ডাইভিং গিয়্যারের ভেতর ঢোকো।'

হুইলহাউস থেকে স্টারবোর্ড কেবিন ডেকে নেমে এল রানা। ওর নির্দেশের জন্যে পাঁচজন লোক অপেক্ষা করছে এখানে। বুদ্ধিমান, উৎসাহী লোক এরা। রানার মতই, শুধু কালো বিকিনি সুইম ট্রাঙ্ক পরে আছে সবাই। এয়ারট্যাংকের স্ট্র্যাপ বাঁধতে আর ব্রিদিং রেগুলেটর অ্যাডজাস্ট করতে ব্যস্ত সবাই। তারপর প্রত্যেকে যার যার ইকুইপমেন্ট রি চেক করে নিল।

পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে ওরা। সবচেয়ে কাছের ডাইভার ড. ইব্রাহিম খালেদ, পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলে তাকাল রানার দিকে। 'আপনার ডাইভিং গিয়্যার রেডি করে রেখেছি, মেজর। আশা করি সিঙ্গেল হোস রেগুলেটরই যথেষ্ট হবে। এই ট্রিপে নুমা আমাদেরকে জোড়া হোস ইস্যু করেনি।'

'সিঙ্গেলেই হবে,' বলল রানা। পায়ে একজোড়া ফিন পরে নিল ও, গোড়ালির ওপর স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিল একটা ছুরি। মাস্কটা মাথায় আটকে রেখে স্নরকেল অ্যাডজাস্ট করল। ওয়াইড-অ্যাঙ্গেল টাইপ মাস্ক, দৃষ্টিসীমার রেঞ্জ একশো আশি ডিগ্রী। এরপর এয়ারট্যাংক আর রেগুলেটর। চল্লিশ পাউন্ড ওজনের ট্যাংক হারনেস নিয়ে ধস্তাধস্তি করতে যাবে ও, এই সময় লোমশ দুটো হাত এক ঝটকায় সেটাকে ওর পিঠের উপর তুলে ধরল।

'আমি থাকতে তুমি কেন এত কষ্ট করতে যাবে?' এক গাল হেসে বলল বেন।

'ভাবছিলাম কোথাও পড়ে নাক ডেকে ঘুমাচ্ছ বোধহয়!'

'কি যে বলো! তোমাকে যুদ্ধে পাঠাচ্ছি, ঘুম কি আসে!' নিচের পানির দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকল বেন। 'আরে, একেবারে কাঁচের মত!'

'হ্যাঁ।' ছয় ফুটি পোল স্পীয়ারের কাঁটা লাগানো প্রান্তটা খাপ-মুক্ত করে বাঁটের দিকে ফিট করা রাবার স্লিঙের ইলাস্টিসিটি পরীক্ষা করল রানা। 'পড়া যা দিয়েছি, সব মুখস্থ করেছ তো?'

'সন্দেহ থাকলে ধরো, দেখো পারি কিনা!'

'তোমার আত্মবিশ্বাস দেখে আমি সন্তুষ্ট।'

'কিন্তু তোমার সাথে আমি যেতে পারছি না বলে···'

'সেজন্যে মন খারাপ করো না বৎস!' বলল রানা। 'এখানেও তোমাকে ব্যস্ত

রাখার জন্যে অনেক কাজ পড়ে আছে।'

'ওসব ব্যাপারে মোটেও দুশ্চিন্তা করো না ওস্তাদ। সব দেখব আমি। এনজয় ইওর সুইম অ্যান্ড ফান।'

দু'বার বাজল জাহাজের বেল। তার মানে, কমান্ডার রানাকে জানাল, আর এক মিনিট বাকি আছে। ফিন পরা পা নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে ছোট একটা প্ল্যাটফর্মে চলে এল রানা, খোলের কিনারা ছাড়িয়ে পানির ওপর খানিকটা ঝুলে আছে সেটা।

'আবার বেল বাজলেই আমরা ঝাঁপ দেব।' আর কিছু বলল না রানা, কারণ কি করতে হবে সবার তা জানা আছে।

আরও একটু জোরে চেপে ধরল ডাইভাররা তাদের স্পীয়ারগান, তাকাল পরস্পরের দিকে। সবার মনেই এক চিন্তা—যথেষ্ট দূরে পড়তে না পারলে চিরকালের জন্যে প্রপেলারের কাছে একটা হাত বা পা জমা রাখতে হবে। রানার কাছ থেকে ইঙ্গিত পেয়ে প্ল্যাটফর্মের পিছনে সার বেঁধে দাঁড়াল সবাই।

মাস্ক নামিয়ে চোখ ঢাকার আগে আরেকবার ওর সামনে দাঁড়ানো লোকগুলোকে ভাল করে দেখে নিল রানা। পানির নিচে প্রত্যেককে যাতে আলাদা ভাবে চেনা যায় সেজন্যে ওদের শারীরিক কাঠামো, আকৃতি ইত্যাদি গভীর মনোযোগের সাথে মনের পর্দায় টুকে রেখেছে সে। ওর সবচেয়ে কাছে রয়েছে ইব্রাহিম খালেদ, জিওফিজিসিস্ট, দলের একমাত্র নিগ্রো। জন নিমো, ছোটখাট পেটা শরীর, জাহাজের ইঞ্জিনিয়র, তার ফিনের রঙ নীল। রানার বিশ্বাস, ঘুসোঘুসি মারামারি ভালই পারে সে। এরপর লাল দাড়ি জোসেফ সিকো, মেরিন বায়োলজিস্ট। রবার্ট লিন ওদের মধ্যে সবচেয়ে লম্বা, ছয় ফুট ছয় ইঞ্চি, মেরিন বোটানিস্ট। এরপর উইলিয়াম ডিক, দলের ক্যামেরাম্যান। স্পীয়ারগানের বদলে ফ্ল্যাশসহ থারটি ফাইভ এমএম ক্যামেরা নিয়েছে সে।

মাস্ক নামিয়ে চোখ ঢেকে নিল রানা। পানির ওপর চোখ বুলাল আরেকবার। প্ল্যাটফর্মের নিচে দিয়ে আগের চেয়ে মন্থর গতিতে ছুটছে পানি—ব্লু লিডারের স্পীড কমিয়ে তিন নটে নামিয়ে এনেছে কমান্ডার। বো ছাড়িয়ে জাহাজের সামনে চলে গেল রানার দৃষ্টিতে। পানির গায়ে কোথাও কোন চিহ্ন নেই, তবু চোখের দৃষ্টি স্থির রেখে বিশেষ একটা স্পট বেছে নিতে চেষ্টা করল ও, এখন থেকে যে-কোন মুহূর্তে লাফ দিয়ে পড়বে সেখানে।

ঠিক এই সময় হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে শেষবারের মত ফ্যাদোমিটারের কাঁটা আর এবড়োখেবড়ো পাহাড়-প্রাচীরের দিকে তাকাল কমান্ডার হ্যানিবল। ধীরে ধীরে উঁচু হয়ে উঠল তার একটা হাত, রেল লাইনটা হাতড়াল, স্পর্শ পেয়ে মুঠোর ভেতর নিল সেটা, অপেক্ষা করল এক সেকেন্ড, তারপর খুব দ্রুত টান দিল একবার। দুপুরের গরম বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল ধাতব আওয়াজটা, ফেনার ওপর দিয়ে ছুটে গিয়ে বাড়ি খেল পাহাড়-প্রাচীরে, নিস্তেজ প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসতে শুরু করল আবার জাহাজের দিকে।

রানা কিন্তু প্রতিধ্বনি ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করল না। মাস্কটা এক হাত দিয়ে জায়গামত ধরে রেখে, অপর হাতে পোল স্পীয়ার নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে

সাগরে লাফ দিল ও। মাথার ওপর সারফেস আবার জোড়া নাগার আগেই ফিন ছুঁড়তে শুরু করল। পাঁচ সেকেন্ডে পনেরো ফুট এগোল। কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাতে জাহাজের খোলটাকে গাঢ় একটা ছায়ার মত দেখতে পেল, মাথার ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। যতটা কাছে, তার চেয়ে অনেক বেশি কাছে বলে মনে হলো ভয়ালদর্শন জোড়া-প্রপেলারকে।

বাকি সবাইও নিরাপদ দূরত্বে সরে এসেছে, খালেদ, নিমো, সিকো, লিন আর ডিক। চারজন একসাথে রয়েছে, একা পিছিয়ে পড়েছে শুধু ডিক।

স্বচ্ছ পানি, অনেক দূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল। একজোড়া কদাকার ড্র্যাগোনেট মাছ সাগর তলার কাছে অলস ভঙ্গিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের উজ্জ্বল নীল আর গাঢ় হলুদ গায়ের রঙ অবাক হয়ে দেখার মত। আশি ফুট দূরে পরিষ্কার দেখা গেল একটা পর্তুগীজ ম্যান ও'ওয়র।। সাগরতলা ভারি রহস্যময় জগৎ। এখানে কোন শব্দ নেই। কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বিপদের ভয় আছে। নিরীহ দর্শন জেব্রা মাছের মারাত্মক বিষ অথবা ভয়ালদর্শন হাঙরের তীক্ষ্ণ দাঁত মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। নিচের দিকে ডাইভ দিয়ে নামতে শুরু করল রানা। ত্রিশ ফুট নিচে পানির রঙ নীলচে সবুজ। আরও বিশ ফুট নামল ও। এদিকের তলায় কোন পাথর নেই, দেখতে অনেকটা মরুভূমির মত। ঢেউ খেলানো খুদে বালিয়াড়ি আছে, গায়ে লম্বা লম্বা দাগ কাটা, দেখতে সাপের মত। স্টার গেজার মাছ দেখা গেল, একজোড়া পাথুরে চোখ আর ঠোঁট ছাড়া শরীরের বাকি অংশ বালির নিচে সেঁধিয়ে আছে। ওগুলো ছাড়া আর কিছু নেই।

ব্লু লিডার ছেড়ে আসার ঠিক আট মিনিট পর সাগরের মেঝে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করল। এদিকে পানি তত স্বচ্ছ নয়। সামনে একটা অন্ধকার অন্ধকার ভাব। তার ভেতর সীউইড ঢাকা রক ফরমেশনের আভাস টের পাওয়া গেল। এর একটু পরই হঠাৎ করে একটা পাহাড়-প্রাচীরের সামনে এসে পড়ল ওরা। পাঁচিলের গা মসৃণ, কোথাও কোন ভাঙচুর নেই, সোজাভাবে খাড়া উঠে গেছে সারফেসের দিকে। দলের লোকদের পাঁচিলের দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিল রানা। নিশ্চয়ই এই পাঁচিলের গায়ে কোথাও গুহা আছে। সেটাকে সাবমেরিনের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করে ফন হামেল। অন্তত রানার তাই ধারণা।

খুঁজে পেতে পাঁচ মিনিটের বেশি লাগল না। ক্যামেরাম্যান ডিক ডান দিকে একশো ফুটের মত এগিয়ে গিয়েছিল, সেই প্রথম দেখতে পেল। এয়ারট্যাংকের গায়ে ছুরির ডগা ঘষে সিগন্যাল দিল সে, বাকি সবাইকে সাথে নিয়ে পাঁচিলের উত্তর মুখ বরাবর এগোল রানা। আগাছা ভর্তি একটা ফাটল পড়ল সামনে, সেটাকে পেরিয়ে এসে হঠাৎ করেই থামল রানা, একটা হাত তুলে বাকি সবাইকে থামার নির্দেশ দিল। দেখতে পেয়েছে ও। সারফেস থেকে মাত্র বারো ফুট নিচে কালো রঙের একটা ফাঁক। ঠিক এই আকারের একটা ফাঁকই আশা করেছিল ও—অনায়াসে একটা সাবমেরিন ঢুকে যেতে পারে। গুহার মুখের কাছে ভাসতে থাকল ওরা, সবাই তাকিয়ে আছে গুহার ভেতর, কিন্তু ভেতরটা অন্ধকার বলে দেখতে পেল না কিছু। সবার মধ্যেই একটা ইতস্তত ভাব লক্ষ করল রানা, পরস্পরের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছে।

কাউকে কিছু না বলে গুহা-মুখের দিকে এগোল রানা। পিছন থেকে ওরা দেখল টানেলে ঢুকল রানা, ধীরে ধীরে অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

ফিন লাগানো পা জোড়া ধীরেসুস্থে, মাঝে মধ্যে ছুঁড়ল রানা, পানির স্রোতই ওকে টানেলের ভেতর দিয়ে সামনের দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। উজ্জ্বল নীলচে-সবুজ পানি পিছনে ফেলে এসেছে ও, এদিকের পানি গাঢ় টোয়াইলাইট ব্লু-র মত। প্রথম দিকে কিছুই দেখতে পেল না রানা, তারপর অন্ধকার ভাবটা চোখে সয়ে এল, নিজের চারদিকের খুঁটিনাটি অনেক কিছু ধরা পড়তে শুরু করল চোখে।

তাজ্জব বনে গেল রানা। টানেলের দেয়ালে গিজ গিজ করার কথা কাঁকড়া, শামুক, গুগলি, চিংড়ি—অথচ সেসব কিছুই দেখতে পেল না ও। শেলফিশ, তাও নেই। জলজ প্রাণীদের চিহ্ন মাত্র নেই কোথাও। তা কি করে হয়? দেয়ালের গায়ে লালচে একটা পদার্থ রয়েছে, হাত দিতেই আশপাশের পানি ঘোলা হয়ে গেল। চিৎ হলো রানা, ওপর দিকে তাকাল। ছাদটা খিলান আকৃতির, দু'দিকের দেয়াল ক্রমশ বেঁকে পরস্পরের সাথে মিলেছে। ওর বুদ্বুদগুলো এগজস্ট থেকে বেরিয়ে রূপালী বলের মত এঁকেবেঁকে ছুটল গুহাপথ ধরে উপর দিকে। অন্ধকারে হারিয়ে গেল সেগুলো।

ভয় ভয় করল রানার, কিন্তু সেটাকে গ্রাহ্য না করে ওপর দিকে উঠতে শুরু করল ও। খানিকটা ওঠার পর ভাবল, টানেল থেকে বেরিয়ে গিয়ে কাউকে ডেকে নিয়ে আসবে কিনা। কিন্তু তাতে সময়ের অপচয় হবে ভেবে চিন্তাটা বাতিল করে দিল ও। হঠাৎ কিছুদূর খাড়াভাবে ওঠার পর বাতাসে বেরিয়ে এল মাথা। চারদিকে তাকিয়ে কিছুই দেখতে পেল না ও। ধূসর রঙের কুয়াশা সবকিছু ঢেকে রেখেছে। হতভম্ব হয়ে পড়ল ও। তাড়াতাড়ি ডুব দিল আবার। নেমে এল দশ ফুট পানির নিচে। নিচের দিকে চেয়ে বুঝল, আসল টানেল ছেড়ে একটা শাখা পথ ধরে উঠে এসেছে সে ওপরে। টানেলের প্রবেশ-পথ দিয়ে আসা আলোয় এ গুহার সবটুকু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। একটা অ্যাকোয়ারিয়াম। এর শুধু এই একটাই বর্ণনা দিতে পারে রানা। কিংবা বিশাল একটা ট্যাংক বলেও চালানো যায় এটাকে। নিচের টানেলের সাথে এই গুহার কোন মিল নেই। চারদিকে জলজ প্রাণীর ভিড় দেখতে পেল রানা। কাঁকড়া, শামুক, গুগলি, এমনকি একদিকে সামুদ্রিক আগাছা আর গুল্মের বিস্তারও দেখা গেল। উজ্জ্বল রঙের অনেক মাছের ঝাঁকও দেখল রানা, ওকে নড়াচড়া করতে দেখে ছুটে পালাচ্ছে চারদিকে।

পানির ওপর আরেকবার মাথা তুলে দেখবে বলে উঠতে শুরু করল রানা, এই সময় কে যেন ওর একটা পা ধরে ফেলল। ঝট করে তাকাতেই খালেদকে দেখতে পেল ও। ইঙ্গিতে সারফেসের দিকটা দেখাল ওকে। মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল রানা। পিছনে খালেদকে নিয়ে আবার পানির ওপর মাথা তুলল ও। কিন্তু এবারও সেই ঘন কুয়াশা ছাড়া কিছু দেখতে পেল না।

মাউথপীস খুলে খালেদের দিকে ফিরল রানা। 'কি বুঝছ বলো দেখি?' পাথুরে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে চারগুণ শব্দ করল ওর গলার আওয়াজ।

'এর মধ্যে অবাক হবার মত কিছু নেই,' বলল খালেদ। 'প্রতিটি ঢেউ বা স্রোত গুহা মুখে আছড়ে পড়লে টানেলের ভেতর দিয়ে তীব্রগতিতে ছুটতে শুরু করে

পানি। গুহার ভেতর আগেই বন্দী হয়ে থাকে বাতাস, পানির চাপে সংকুচিত হয়ে পড়ে সেটা। এরপর কমতে শুরু করে পানির চাপ, সেইসাথে আলগা হয়ে ছড়িয়ে পড়ে ভিজে বাতাস, ঠাণ্ডা হয়ে যায়, এবং মিহি কুয়াশায় পরিণত হয়।' নাক থেকে পিচ্ছিল কিছু সরাবার জন্যে এক সেকেন্ড বিরতি নিল সে, তারপর আবার বলল, 'ঢেউগুলো বারো সেকেন্ড পর পর ঢুকছে টানেলে, কাজেই যে-কোন মুহূর্তে কুয়াশা কেটে···'

খালেদের কথা শেষ হলো না, হালকা হতে শুরু করল কুয়াশা। দেখতে দেখতে স্বচ্ছ হয়ে গেল বাতাস। প্রায় ষাট ফুট উঁচু হবে সিলিংটা। আবছাভাবে হলেও, প্রায় সমস্ত খুঁটিনাটি দেখতে পাওয়া গেল। গুহার আকৃতি গম্বুজের মত। শ্যাওলা, পাথরের শেলফ ইত্যাদি সবই আছে, নেই শুধু মানুষের তৈরি কোন ইকুইপমেন্ট। দেয়ালগুলো এবড়োখেবড়ো, অসমতল। গোড়ার কাছে খসে পড়া পাথর স্তূপ হয়ে আছে। দেয়ালের গা ঘেঁষে কিছু ঝুল-পাথরও দেখা গেল, যে-কোন মুহূর্তে খসে পড়তে পারে। একটু পরই আবার ফিরে এল কুয়াশা। আবার সব ঢাকা পড়ে গেল।

নিরাশায় ছেয়ে গেল রানার মন। গুহাটা পরীক্ষা করে পরিষ্কার বুঝেছে ও, এটা সাবমেরিনের ঘাঁটি হতে পারে না। তবে কি ওর ধারণা ঠিক নয়? 'চলো, ফেরা যাক,' মৃদু গলায় বলল ও। 'আমার বোধহয় ভুলই হয়েছে।'

'আমি তা মনে করি না, মেজর,' রানার কাঁধে হাত রাখল খালেদ। 'জিওলজি বলছে, আপনার সন্দেহের ভিত্তি আছে। যুক্তি দিয়ে বোঝাতে পারি, এটাই সবচেয়ে লজিকাল স্পট।'

মাথা নাড়ল রানা। 'জানি না কেন বলছ এ-কথা। আমি তো দেখছি, এই গুহা থেকে টানেল ছাড়া বেরুবার আর কোন পথ নেই।'

'গুহার শেষ মাথায়, ওদিকে একটা কার্নিস দেখেছি আমি, হয়তো···'

'একটা কার্নিস কিছু প্রমাণ করে না,' বলল রানা। 'এখুনি বেরিয়ে টানেল ধরে আরও এগিয়ে দেখা দরকার।'

এই সময় রানার সামনে ভুস করে ভেসে উঠল মেরিন বোটানিস্ট রবার্ট লিন। 'মাফ করবেন, মেজর রানা। আমি একটা জিনিস পেয়েছি, আপনি হয়তো দেখতে চাইবেন!'

কুয়াশা সরে গেল আবার।

ভুরু কুঁচকে মেরিন বোটানিস্টের দিকে তাকাল রানা। 'যা বলার তাড়াতাড়ি বলো, লিন। আমাদের হাতে সময় কম।'

'বলুন তো, টানেলের উল্টোদিকের দেয়ালে MACRO CYSTIS PYRIFERA-র গ্রোথ আছে, আপনার চোখে পড়েছে কি?'

'হয়তো পড়েছে,' বলল রানা। 'কিন্তু জিনিসটা কি তা যদি বোঝাতে পারো, তাহলে হয়তো মনে পড়বে।'

'সবাই ওটাকে কেল্প বলে।'

মাথা ঝাঁকাল রানা। কৌতূহল ফুটে উঠল চেহারায়।

আবার বলল লিন, 'এটা একটা বিশেষ জাতের কেল্প, শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

প্যাসিফিক কোস্টে দেখতে পাওয়া যায়। মেডিটেরেনিয়ানের এই অংশের ওয়াটার টেমপারেচার এই জাতের কেল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে উপযোগী নয়। তাছাড়া, কেল্প সূর্যের মুখ বা আলো দেখতে চায়। পানির তলায় একটা গুহার ভেতর কেল্প থাকবে, এ বিশ্বাস্য নয়। অথচ ঠিক তাই দেখছি আমরা। তারমানে এর মধ্যে কোথাও কোন কিন্তু আছে।'

'সেই কিন্তুটা কি হতে পারে, কোন ধারণা আছে?'

কুয়াশা ফিরে এল আবার, লিনের মুখ পরিষ্কার দেখতে পেল না রানা। কিন্তু তার দৃঢ় কণ্ঠস্বর শুনতে কোন অসুবিধে হলো না। 'কেল্প নয়, মেজর, আমরা ওটা শিল্প দেখেছি—চমৎকার আর্ট! প্লাস্টিকের তৈরি, নকল কেল্প।'

'প্লাস্টিক?' আঁতকে উঠল খালেদ। তার গলার আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে এল। 'তুমি ঠিক জানো?'

'দেখো, ডক্টর, আমি কখনও তোমার কোর স্যাম্পল অ্যানালিসিস সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করি না, সেইরকম আমিও আশা করব···'

'টানেল ওয়ালে লাল জিনিসটা, নিশ্চয়ই লক্ষ করেছ?' ওদেরকে থামিয়ে দিয়ে দ্রুত জানতে চাইল রানা, 'বলতে পারো কি ওটা?'

'সঠিক বলতে পারব না, মেজর,' লিন বলল। 'কোন ধরনের পেইন্ট বা কোটিং হবে।'

'আমি বলতে পারব বলে মনে হয়, মেজর,' কুয়াশা সরে যেতে নিজেদের মধ্যে জন নিমোকে দেখতে পেল ওরা। 'জিনিসটা পেইন্টই, রেড অ্যান্টি-ফাউলিং পেইন্ট, জাহাজের খোল রঙ করার জন্যে ব্যবহার করা হয়। এতে আর্সেনিক থাকে, সেজন্যেই টানেলে কিছু গজায়নি।'

হাতঘড়ির ডায়ালে চোখ বুলাল রানা। 'সময় শেষ হয়ে আসছে। সম্ভবত এটাই সেই জায়গা!'

'কেল্পের পিছনে আরেকটা টানেল, মেজর?' উত্তেজিত গলায় জানতে চাইল খালেদ।

'তাই তো মনে হচ্ছে,' বলল রানা। 'আরেকটা ক্যামোফ্লেজড টানেল, আরেকটা গুহা।' সবজান্তার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল রানা। 'এখন আমি বুঝতে পারছি থাসোসের স্থানীয় লোকদের চোখে ফন হামেলের অপারেশন কেন ধরা পড়েনি।'

'এখন তাহলে কি করব আমরা?'

'তার আগে সবাই যে যার ইকুইপমেন্ট চেক করে নাও,' বলল রানা। 'আমাদের মধ্যে নেই কে?'

'ইকুইপমেন্ট ও. কে.।' একই কথা বলল ওরা ক'জন। সবশেষে খালেদ জানাল, 'শুধু ডিক নেই এখানে।' আচমকা গুহাটা উজ্জ্বল নীলচে আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

'হাসল না কেউ।' তিক্ত কণ্ঠে দুঃখ প্রকাশ করল ক্যামেরাম্যান ডিক। সম্ভাব্য প্রশস্ত লেন্স অ্যাঙ্গেল পাবার জন্যে গুহার শেষপ্রান্তে চলে গিয়েছিল সে, এখন ফিরে আসতে শুরু করল।

'এরপর যখন শাটার টিপবে, তার আগে সেক্স শব্দটা উচ্চারণ করতে বলো।' পরামর্শটা এল সিক্কোর কাছ থেকে।

'সেক্স শব্দটার অর্থ তোমরা জানো?' কৌতুক করে বলল ডিক। 'জানলে জানে আমাদের রেডিও অপারেটর! মেজর রানার গার্ল ফ্রেন্ড এত থাকতে সেবা-যত্ন করার জন্যে বেছে নিয়েছে ওই ব্যাটা নীরস…'

'ঠিক,' সমর্থন করল সিকো। 'আমিও লক্ষ করেছি। রেডিও অপারেটরকে পাঁচ মিনিট পর পর কফি তৈরি করে খাওয়াচ্ছিল…'

রানার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ একটুকরো হাসি ফুটে উঠেই মিলিয়ে গেল। কাউকে কিছু না বলে নিচের দিকে ডাইভ দিল ও। বাকি সবাই অনুসরণ করল ওকে, পরস্পরের মাঝখানে দশ ফুট করে ব্যবধান।

নকল কেল্পের জঙ্গল এতই ঘন যে একরকম দুর্ভেদ্যই বলা যায়। মোটা মোটা শাখা নিচে থেকে সারফেসের দিকে উঠে গেছে, পথে ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। ঠিকই বলেছে লিন, শিল্পকর্মই বটে। একহাত দূর থেকেও আসল নাকি প্লাস্টিক বোঝা অসম্ভব। স্ট্র্যাপ থেকে ছুরি খুলে জঙ্গল কেটে ভেতরে ঢুকতে শুরু করল রানা। কঠোর পরিশ্রম করে দ্বিতীয় আরেকটা টানেলে ঢুকল ও, ডায়ামিটারে প্রথমটার চেয়ে এটা বড়, কিন্তু লম্বায় ছোট। চারবার জোরে পা ছুঁড়ে পানি থেকে নতুন একটা গুহায় মাথা তুলল ও। এখানেও সেই কুয়াশা, প্রথমে কিছুই দেখতে পেল না। একমুহূর্ত পর ভুস করে আওয়াজ তুলে রানার পাশে আরেকজন মাথা তুলল। 'মেজর, সব ঠিক আছে?' খালেদের গলা।

এরপর একে একে সিকো, নিমো, ডিক আর লিন পানির ওপর মাথা তুলল।

'কিছু দেখতে পেলেন, মেজর?' জানতে চাইল সিকো।

'এখনও পাইনি,' মৃদু কণ্ঠে বলল রানা। চোখে পলক নেই ওর, ভিজে স্যাঁতস্যাঁতে গম্বুজ আকৃতির গুহার চারদিকে দৃষ্টি বুলাল। কুয়াশা সরে যেতে শুরু করেছে, কিন্তু আবছা অন্ধকার ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি। মনে হলো, অস্পষ্ট কি যেন দেখতে পেল ও। সত্যি, নাকি কাল্পনিক ঠিক ঠাহর করতে পারল না। আকৃতিটা ক্রমশ, একটু একটু করে গাঢ় হয়ে উঠল। তারপর হঠাৎ করেই পরিষ্কার চেনা গেল জিনিসটাকে। নিরেট একটা গড়ন, চিনতে অসুবিধে হলো না—মসৃণ, কালো ধাতব খোল, নিঃসন্দেহে একটা সাবমেরিনের। মাউথপীস খুলে সাঁতরাতে শুরু করল রানা, কাছে পৌঁছে সাবমেরিনের বো প্লেন আঁকড়ে ধরল, ছোট্ট একটা লাফ দিয়ে উঠে বসল ডেকে।

সাবমেরিনটা পাওয়া গেলে ওর প্রতিক্রিয়া কি হবে তা নিয়ে কম করেও বার দশেক চিন্তা-ভাবনা করেছে রানা। এখন সেটার ওপর উঠে বসে অনুভব করল, রাগ এবং ঘৃণায় সারা শরীর রী রী করছে ওর। এই সাবমেরিন কত শত টন বেআইনী ড্রাগস বহন করেছে তার হিসেব করা অসম্ভব ব্যাপার। পানির তলার এই ডুবোজাহাজ যদি কথা বলতে পারত! তাহলে হয়তো ফন হামেলের অনেক গোপন দুষ্কর্মের কথা জানা যেত এখন।

'নড়বেন না!' শিরদাঁড়ার ওপর ধাতব স্পর্শ পেল রানা। 'স্পীয়ারটা ডেকে

নামিয়ে রাখুন।' ভারী, গম্ভীর কণ্ঠস্বর। চেনা চেনা লাগল।

এক চুল নড়ল না রানা। দু'সেকেন্ড পর ধীরে ধীরে ডেকের ওপর নামিয়ে রাখল স্পীয়ার গান।

'গুড। এবার, আপনার লোকদের বলুন, তারা যেন যে যার অস্ত্র হাত থেকে ছেড়ে দেয়। কোনরকম চালাকি করতে নিষেধ করে দিন। পানিতে কংকাশন গ্রেনেড ফাটলে কাছেপিঠে যারা থাকে তাদের মাংস কাদার মত হয়ে যায়।'

ভাসমান পাঁচটা মাথার দিকে এক এক করে তাকাল রানা। 'সবাই শুনেছ। স্পীয়ার গান ছেড়ে দাও···ছুরিও। এরা লোক ভাল নয়, কাজেই এদের সাথে লাগতে যাওয়া ঠিক হবে না। দুঃখিত, খালেদ! আমার জন্যেই তোমাদের আজ এই বিপদ।'

মাথার ভেতর ঝড় বয়ে যাচ্ছে রানার। মুহূর্তের জন্যেও নিজের বিপদের কথা ভাবল না ও। ওর চিন্তা ব্লু লিডারের পাঁচজন বিজ্ঞানীকে নিয়ে। ফন হামেলের সাথে ওর ব্যক্তিগত শত্রুতা আছে, কিন্তু এই পাঁচজনের সাথে তার কোন সম্পর্কই নেই। অথচ ওর সাথে তারা এই ঘাঁটিতে এসেছে, সেটাকেই মস্ত অপরাধ বলে মনে করবে ফন হামেল, এবং শাস্তি হিসেবে এদেরকে অবশ্যই খুন করার চেষ্টা করবে সে। পাঁচজন নিরীহ লোক আর হয়তো বেরুতেই পারবে না এই গুহা থেকে। এর জন্যে সম্পূর্ণ দায়ী সে নিজে। কিন্তু তাই বলে দিশেহারা হয়ে পড়ল না ও। বরং সমস্ত ভাবাবেগ দূর হয়ে গেল ওর মন থেকে। সব কথা ভুলে গিয়ে শুধু সময়ের ব্যাপারে সচেতন থাকার চেষ্টা করল।

'মেজর রানা,' পিছন থেকে এবার অন্য একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেল। 'তোমার মত ত্যাঁদোড় লোক আমি আর দেখিনি! ইচ্ছে করলে ঘাড় ফেরাতে পারো তুমি। তবে মাথার ওপর হাত তুলে।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা।

ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ফন হামেল। মুখ টিপে হাসছে সে। তার পাশে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল রানা। ফন হামেলের হাতে কিছু আছে কিনা বোঝা গেল না, দুটো হাতই জ্যাকেটের পকেটে ঢোকানো। পিস্তল রয়েছে তার পাশে দাঁড়ানো লোকটার হাতে। বিশাল শরীর লোকটার।

'তোমার সাথে এর আর পরিচয় করিয়ে দিলাম না,' পাশের লোকটাকে দেখিয়ে বলল ফন হামেল। 'ক্যাপ্টেন পেরিয়াসকে তুমি তো চেনোই।'

সাত

খিক খিক করে হেসে উঠল দৈত্য। 'আমাকে দেখে অবাক হলেন নাকি, মেজর রানা?' হঠাৎ হাতটা বাড়িয়ে রানার গলার ওপর চেপে ধরল পিস্তলের মাজল। ফন হামেলের দিকে তাকাল না, কিন্তু জিজ্ঞেস করল তাকেই, 'দেব নাকি ট্রিগার টিপে, স্যার? ফুটো গলা থেকে হড় হড় করে রক্ত বেরিয়ে আসুক, দেখতে ভারি মজা

হবে!'

'ধীরে, বৎস, ধীরে!' একগাল হাসল ফন হামেল, অসংখ্য ভাঁজ ফুটে উঠল তার মুখে। 'ধরলাম আর মারলাম, এতে আনন্দ কোথায়? একটু রয়ে-সয়ে, নাচিয়ে-খেলিয়ে যদি মারতে না পারলাম, তাহলে যে লোকে স্রেফ খুনী বলবে আমাকে। আমি কি তাই? না, পেরিয়াস, না! আমি শুধু খুনী নই। আমার ভেতর কিছুটা শিল্পবোধ আছে, সবকিছু আর্টিস্টিক ওয়েতে করতে ভালবাসি। তা, মি. রানা, ধরা পড়ে গিয়ে কেমন লাগছে তোমার।'

জোর করে একটু হাসল রানা। মাথার ওপর হাত তুলে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল ও। 'ভয়ে কলজে শুকিয়ে গেছে। ভাবছি, আপনার কাছে প্রাণভিক্ষা চাইব কিনা!'

'নাহ্! তোমার গাটসের প্রশংসা না করে উপায় নেই,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ফন হামেল। 'মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে এমন রসিকতা ক'জন করতে পারে?' হঠাৎ বিষণ্ন হয়ে উঠল তার চেহারা। 'আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি কি জানো, মেজর রানা? অনেক অসমসাহসী যুবকের দেখা পেয়েছি আমি, তাদের যোগ্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তাদের সংকল্প ছিল আমার বিরোধিতা করা। কাজেই সরিয়ে দিতে হয়েছে তাদেরকে। বিশ্বাস করো, সেজন্যে দুঃখের সীমা নেই আমার। তোমার কথাই ধরো। তোমাকে আমি শাস্তি না দিতে পারলেই খুশি হতাম।' অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তোমার মত বুদ্ধিমান যুবক আমার দরকার। কিন্তু তোমাদের মত জেদী, একগুঁয়েদের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই। কাজেই শাস্তি না দিয়েও কোন উপায় থাকে না। জানি, জড় সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে না পারলে আমার সর্বনাশ করবে তোমরা।'

'আপনার সর্বনাশ শুধু সময়ের ব্যাপার, ফন হামেল,' বলল রানা। 'সেই সময়ও ঘনিয়ে এসেছে।' রানার নিজের কানেই কথাগুলো অর্থহীন শোনাল।

'শুভ কাজে দেরি করতে নেই,' অধৈর্যের সাথে বলল পেরিয়াস। 'একে আমার হাতে ছেড়ে দিন, স্যার। একে মজা বুঝিয়ে তারপর এর বন্ধুটাকে ধরব।'

'তুমি বোধহয় বেনের কথা বলছ?' ঠোঁট বাঁকা করে হাসল রানা। 'তোমার কপাল খারাপ, এবার তাকে নিয়ে বেরুইনি আমি।'

'তাহলে তার পাওনাটুকুও আপনাকে ভোগ করতে হবে।' শান্তভাবে হাসতে হাসতে রানাকে লক্ষ্য করে গুলি করল পেরিয়াস। পাথুরে দেয়াল ঘেরা গুহার ভেতর গুলির আওয়াজটা বজ্রপাতের মত শোনাল।

রানা অনুভব করল, গরম একটা লোহার রড ঢুকে গেল ওর গায়ের ভেতর। তাল সামলাবার চেষ্টা করল ও। টলমল করতে করতে পিছিয়ে গেল দু'পা। কিভাবে যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারল ও। নাইন মিলিমিটারের বুলেট উরুর মাংস ফুটো করে বেরিয়ে গেছে। আধ ইঞ্চির জন্যে ছুঁতে পারেনি হাড়। অনুভব করল, পায়ে যেন আগুন ধরে গেছে। কিন্তু অনুভূতিটা দ্রুত মিলিয়ে গেল, অসাড় লাগল গোটা পা। সত্যিকার যন্ত্রণা শুরু হবে একটু পর, জানে ও।

'আহ্, পেরিয়াস!' হালকা তিরস্কারের সুরে বলল ফন হামেল। 'তোমাকে নিয়ে আর পারা গেল না! চোখের বদলে চোখ, এই তোমার নীতি, তাই না?

অনেক সময় পাবে। একটু সবুর করো। তার আগে আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সারতে হবে আমাদের।' রানার দিকে ফিরে আবার একগাল হাসল সে। 'দুঃখিত, মেজর রানা। কিন্তু এসবের জন্যে যে তুমিই দায়ী, সেটা নিশ্চয়ই স্বীকার করবে? পেরিয়াস যে রেগে আছে, সেজন্যে ওকে তুমি দোষ দিতে পারো না। ওর এমন এক জায়গায় লাথি ঝেড়েছ তুমি, আরও হপ্তা দুয়েক ল্যাংচাতে হবে বেচারীকে।'

দাঁতে দাঁত চাপল রানা। হিস হিস শব্দ বেরুল ওর গলা থেকে। 'আরও জোরে মারিনি, সেজন্যে নিজের ওপর রাগ হচ্ছে আমার।'

পানিতে ভেসে থাকা লোকগুলোর দিকে তাকাল ফন হামেল। 'যে যার ডাইভিং ইকুইপমেন্ট খুলে ফেলে দাও। তারপর ডেকে উঠে এসো সবাই। জলদি, আমাদের হাতে সময় নেই।'

নিমোর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র নেই, কটমট করে ফন হামেলের দিকে তাকাল সে। 'মরার সময় হয়ে এসেছে, বয়েসের তো গাছ-পাথর নেই, স্মাগলিং করতে লজ্জা করে না আপনার?'

নিমো থামতেই সিকো বলল, 'এখানে আমরা ভালই আছি।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফন হামেল। 'হ্যানস, লাইট!'

হঠাৎ এক সারে জোড়া ওভারহেড ফ্লাড লাইট জ্বলে উঠল। উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেল সবার। গুহার ভেতরটা সিলিং থেকে পানির সারফেস পর্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠল। আলোটা চোখে সয়ে এল ধীরে ধীরে, রানা দেখল, একটা ভাসমান ডকে নোঙর করা রয়েছে সাবমেরিনটা। একটা টানেলের মুখ থেকে শুরু হয়েছে কাঠের ডক, প্রায় চৌকো আকৃতি, লম্বায় দুশো ফুট, চওড়ায় কিছু কম। ছোটখাট একটা ফুটবল খেলার মাঠ। ডকের ওপর, ডান দিকে দেয়ালে ঝুলে আছে একটা কার্নিস, তার ওপর স্টেনগান হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন সবুজ ইউনিফর্ম পরা লোক—মূর্তির মত স্থির, স্টেনগান তাক করে আছে নিচে, ওদের দিকে।

'যা বলছে শোনো,' মৃদু গলায় বলল রানা।

আবার ফিরে এল কুয়াশা। কিন্তু ফ্লাডলাইটের আলোয় দেখা গেল সব। বুঝতে অসুবিধে হলো না, এতগুলো চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালাবার কোন উপায় নেই। সবার আগে সিকো আর লিন উঠে এল ডেকে। তারপর খালেদ আর ডিক, সবশেষে নিমো। ডিকের হাতে এখনও ঝুলছে ক্যামেরাটা।

রানার এয়ারট্যাংক খুলতে সাহায্য করল খালেদ। 'পাটা দেখতে দিন আমাকে, মেজর।' রানাকে ধরে ধীরে ধীরে ডেকের ওপর বসাল সে। ওয়েট বেল্ট থেকে লেডওয়েট সরিয়ে নাইলন ওয়েবিং দিয়ে ক্ষতটা জড়াল, সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল রক্ত পড়া। নিঃশব্দে হাসল সে। 'ব্যাপারটা কি বলুন তো? আপনার দিকে ফিরলেই দেখি, রক্ত ঝরছে।'

'মার খাওয়া কুত্তার মত স্বভাব হয়ে গেছে...'

কথার মাঝখানে থেমে গেল রানা। আবার সরে যাচ্ছে কুয়াশা। ডকের অপর প্রান্তটা দেখা গেল। ওদিকে আরেকটা সাবমেরিন রয়েছে, এতক্ষণ চোখে পড়েনি। দুটো সাবমেরিন, একটার সাথে আরেকটাকে মিলিয়ে দেখল ও। ওরা যেটায়

রয়েছে সেটার গায়ে কোথাও কোন প্রজেকশন নেই। দ্বিতীয় সাবটা অন্য রকম। প্রথমটার মত ওটার কোনিং টাওয়ার সরিয়ে ফেলা হয়নি। ওদের দিকে পিছন ফিরে নিজেদের কাজে ব্যস্ত দেখা গেল তিনজন লোককে। ডেকের ওপর বিধ্বস্ত একটা প্লেন রয়েছে, সেটা থেকে মেশিনগান বের করছে তারা।

'কোত্থেকে উদয় হয়েছিল গোলাপি অ্যালব্যাট্রস, বোঝা গেল,' বলল রানা। 'পুরানো জাপানী আই-বোট, ছোট স্কাউট প্লেন অনায়াসে ওঠানামা করতে পারে ডেক থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ওগুলো ব্যবহার করা হয়নি বলেই আমার ধারণা।'

'হয়নি।' মুচকি হেসে বলল ফন হামেল। 'তুমি ওটাকে আইডেনটিফাই করতে পেরেছ দেখে গর্ব অনুভব করছি আমি। ওটার ব্যক্তিগত ইতিহাস জানতে চাও?'

'আপত্তি নেই।'

'উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালে আইয়ো জিমার কাছে একটা মার্কিন ডেস্ট্রয়ার ডুবিয়ে দিয়েছিল ওটাকে। উনিশশো একান্ন সালে মুনমুন লাইন্স ওটাকে উদ্ধার করে। দুর্গম, অথবা প্রবেশাধিকার নেই এমন সব এলাকায় ছোটখাট কার্গো পৌঁছে দেবার জন্যে এই সাবমেরিন আর খুদে এয়ারক্রাফটের তুলনা হয় না!'

'আপনি আমার অনেক প্রশংসা করেছেন,' বিদ্রূপের সুরে বলল রানা। 'এবার আমি আপনার কিছু প্রশংসা করতে চাই। এই রকম একটা অ্যান্টিক এয়ারক্রাফট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের বিমান ঘাঁটি আক্রমণ করা, সাংঘাতিক নার্ভ দরকার। আপনি একটা প্রতিভা, তা না হলে এই রকম একটা আশ্চর্য বুদ্ধি আপনার মাথায় এল কিভাবে?'

'ধন্যবাদ,' মুখ টিপে হাসল ফন হামেল। 'সেদিন আমার সাথে ডিনারে বসে তুমি আন্দাজ করেছিলে, প্লেনটা সাগরের কোথাও থেকে উদয় হয়েছিল—সত্যের প্রায় কাছাকাছি ধারণা করতে পেরেছিলে তুমি।'

টানেলের মুখের পাশে ছোট একটা কার্নিস, সেখানেও দু'জন সশস্ত্র লোককে দেখা গেল। তাদের দিকে চোখ রেখে শুরু করল রানা, 'অ্যান্টিক অ্যালব্যাট্রস...'

'উঁহুঁ, ওটাকে তুমি ঠিক আসল অ্যালব্যাট্রস বলতে পারো না,' ভুল ধরিয়ে দেবার সুরে বলল বুড়ো ফন হামেল। 'বলতে পারো অ্যালব্যাট্রসের নকল এয়ারক্রাফট। ছোট একটা জায়গা থেকে ওঠা-নামা করতে পারে এমন একটা প্লেন দরকার ছিল আমার। অ্যালব্যাট্রস ডি-থ্রির ডিজাইনটা ব্যবহার করেছি আমি, কিন্তু ইঞ্জিন লাগিয়েছি আরও আধুনিক। ডিজাইনটা ব্যবহার করার উদ্দেশ্য, ওই রকম পুরানো একটা খোলস দেখে কারও মনে অহেতুক কোন সন্দেহের উদ্রেক করবে না। দুঃখ এই যে ওটা আর আকাশের মুখ দেখবে না।'

মাথাটা একটু কাত করে ফন হামেলের দিকে তাকাল রানা। 'একটা প্লেনের জন্যে এত দুঃখ, নিজের সর্বনাশ দেখে যে দুঃখটা পাবেন সেটা রাখবেন কোথায়?'

খোঁচাটা গ্রাহ্য করল না ফন হামেল। বলল, 'ওটা আমার ডেলিভারি প্লেন ছিল। অস্ত্র দিয়ে সাজাব, বা যুদ্ধে পাঠাব, এই রকম কোন প্ল্যান আমার ছিল না।'

'প্ল্যানটা তাহলে মাথায় গজাল কেন?'

'ব্যাডি ফিল্ড আর রিসার্চ শিপে হামলা চালাবার জন্যে বাধ্য হয়ে মেশিনগান ফিট করতে হলো,' বলে চলল ফন হামেল। 'স্যাবোটাজের সাহায্য নিলাম, কিন্তু বোকা কমান্ডার হ্যানিবল বিপদটা টের পেল না। থাসোস ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না তার মধ্যে। পানির নিচে আমার কর্মকাণ্ড ট্যুরিস্ট ডাইভার বা স্থানীয় সাঁতারুদের চোখে ধরা পড়ার কোন ভয় ছিল না। কিন্তু ট্রেনিং পাওয়া এক একজন ওশেন সায়েন্টিস্টের কথা আলাদা। বুঝতেই পারছ, আমার পক্ষে ঝুঁকিটা নেয়া সম্ভব ছিল না। হামলার প্ল্যানটা, আমি এখনও মনে করি, চমৎকার ছিল। ব্লু লিডারকে থাসোস ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দেয়া ছাড়া আর কিছু করার ছিল না কর্নেল লী কোসকির। ব্যাডি ফিল্ডে হামলা চালিয়ে ফেরার পথে ব্লু লিডারেও কিছু বুলেট ছোঁড়ার প্ল্যান ছিল আমাদের। কিন্তু তুমি হঠাৎ কোথেকে যে উড়ে এলে! সব ভণ্ডুল হয়ে গেল!'

জিভ আর টাকরা দিয়ে চুক চুক আওয়াজ করল রানা। 'এটা যদি উনিশশো উনিশ-বিশ সাল হত, অ্যালব্যাট্রসটাকে ঘায়েল করার জন্যে বীরশ্রেষ্ঠ পদক পেয়ে যেতাম আমি, কি বলেন?'

'বেচারা কার্ল!' ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ফন হামেল।

'তাই তো! সেই পিপিং-টমকে দেখছি না কেন?'

মাথাটা এক সেকেন্ডের জন্যে নিচু করে রাখল ফন হামেল, ভাব দেখে মনে হলো শোকে কাতর হয়ে পড়েছে। তারপর মাথা তুলে বিড় বিড় করে বলল, 'সে-ই তো পাইলট ছিল। সাগরে যখন পড়ল অ্যালব্যাট্রস, বেচারা কার্ল ওটার ভেতর আটকা পড়ে গেছিল। আমরা পৌঁছুবার আগেই মারা যায় সে।' আচমকা কঠোর, বীভৎস হয়ে উঠল বুড়ো জার্মানের চেহারা। 'তুমি আমার প্রিয় শোফার-কাম-পাইলট এবং একটা কুকুরকে খুন করেছ, মেজর রানা। জানো, এর জন্যে তোমাকে আমি কি শাস্তি দিতে পারি?'

'আগুনে পোড়াতে পারেন, পানিতে চোবাতে পারেন, কেটে টুকরো টুকরো করতে পারেন,' ঠোঁটের কোণে ব্যঙ্গের হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল রানা। 'কিন্তু তবু, কার্ল বা আপনার কুকুর ফিরে আসবে না। এইটুকুই আমার সান্ত্বনা।' একটু থেমে জানতে চাইল, 'কার্লকে কিভাবে ফাঁদে ফেললাম জানেন কি?'

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকাল ফন হামেল।

'ব্রিটিশরা যে কৌশল খাটিয়ে ফাঁদে ফেলেছিল লেফটেন্যান্ট আলবার্ট কেসারলিঙকে, আমিও সেই একই কৌশল, অর্থাৎ ওয়েদার বেলুন দেখিয়ে ফাঁদে ফেলেছি কার্লকে। এরপর নিশ্চয়ই জানতে চাইবেন, কুকুরটাকে কিভাবে মারলাম?'

'কিভাবে?' চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল ফন হামেলের।

হাসল রানা। এক সেকেন্ড চুপ করে থাকার পর বলল, 'এরপর কারও পেছনে কুকুর লেলিয়ে দেয়ার আগে তাকে নিয়ে যদি ডিনারে বসেন, টেবিল ইউটেনসিলগুলো গুণে ঠিক আছে কিনা দেখে নিতে ভুল করবেন না।'

কৌতূহল এবং বিস্ময় নিয়ে রানাকে কয়েক সেকেন্ড লক্ষ্য করল ফন হামেল, তারপর ধীরে ধীরে ওপর-নিচে মাথা দোলাল কয়েক বার। 'চমৎকার, ভারি

চমৎকার! আমার কুকুরকে আমারই টেবিলের ছুরি দিয়ে খুন করেছ তুমি!' আবার মাথা ঝাঁকাল সে। 'তোমার সত্যি তুলনা হয় না। কিন্তু বিপদে পড়তে যাচ্ছ সেটা তুমি আগে থেকে কি দেখে টের পেলে?'

'প্রিমনিশন,' বলল রানা। 'নো মোর, নো লেস। আমাকে খুন করতে চাওয়াই উচিত হয়নি আপনার। ওটাই আপনার প্রথম ভুল হয়েছে।'

'ভুল বলছ কেন? টানেল থেকে পালিয়ে গিয়ে কি লাভ হলো তোমার? না হয় আরও কয়েক ঘণ্টা বেশি বাঁচলে, সেটাকে তুমি লাভ বলো?'

ফন হামেল আর পেরিয়াসকে ছাড়িয়ে সামনে চলে গেল রানার দৃষ্টি। টানেলের কাছে কার্নিসটা খালি হয়ে গেছে। সশস্ত্র দু'জন গার্ড ছিল ওখানে, তাদেরকে এখন দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু ঝুলে থাকা কার্নিসে এখনও দাঁড়িয়ে আছে পাঁচজন স্টেনগানধারী।

প্রসঙ্গ বদল করল রানা। বলল, 'আপনাদের প্রস্তুতি দেখে বোঝা যায়, আমাদেরকে আশা করছিলেন।'

'অবশ্যই!' ব্রেস্ট পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করল ফন হামেল। 'তোমরা যে আসছ, আভাসটা পেরিয়াসের কাছ থেকে পেয়েছিলাম। ব্লু লিডারকে সন্দেহজনক ভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দেখে নির্দিষ্ট সময়টা জেনে নিলাম। থাসোস ক্লিফের অত কাছে কোন ক্যাপ্টেন তার জাহাজকে নিয়ে আসে না।'

ফন হামেল থামতেই আবার প্রসঙ্গ বদলে নতুন আরেকটা প্রশ্ন করল রানা, 'পেরিয়াসকে কিনে নিতে কত খরচ পড়ল আপনার?'

'তা জেনে তোমার কোন লাভ নেই। দশ বছর ধরে আমার চাকরি করছে পেরিয়াস। বলতে পারো, এতে আমরা দু'জনেই সাংঘাতিক লাভবান হয়েছি।'

পেরিয়াসের কয়লার মত কালো চোখে চোখ রাখল রানা। তারপর তাকাল ফন হামেলের দিকে। 'আপনার দু'নম্বর ভুল, পেরিয়াসকে ভাড়া করা। ওর চেহারাতেই লেখা রয়েছে, ও একটা মস্ত বিপদ। একটা অশুভ লক্ষণ। এ-ধরনের চরিত্র শুধু শত্রুর নয়, প্রভুরও সর্বনাশ ডেকে নিয়ে আসে।'

রানার নাভি লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করল পেরিয়াস। রাগে থর থর করে কেঁপে উঠল সে। 'আপনি আর আমাকে বাধা দেবেন না, স্যার।' ফন হামেলের দিকে ফিরে কাঁপা গলায় বলল সে। 'একবার শুধু হ্যাঁ বলুন, বজ্জাতটাকে আমি...'

'কি?' ভুরু নাচিয়ে রানাকে জিজ্ঞেস করল ফন হামেল, 'হ্যাঁ বলব?'

রানার শিরদাঁড়া বেয়ে ঘামের ধারা নেমে এল। পাঁজরে ধড়াস ধড়াস শব্দে বাড়ি খেল হার্ট। অনেক কষ্টে চেহারাটা শান্ত করে রাখল ও। বলল, 'ইচ্ছে হলে বলুন। আমার কাছে এখন মরাও যা একটু পরে মরাও তাই।'

'বলেছি শাস্তি দেব, মেরে ফেলব তা তো বলিনি। বুঝলে কিভাবে? আবার সেই প্রিমনিশন, মেজর রানা?'

সাথে সাথে বলল রানা, 'হঠাৎ কিছু ঘটে যাওয়া আমার পছন্দ নয়। বলতে পারেন সারপ্রাইজের ওপর আমার সাংঘাতিক ঘৃণা। বলুন—কিভাবে, কখন?'

বাঁ হাতটা ঝাঁকি দিয়ে চোখের সামনে তুলল ফন হামেল, রিস্টওয়াচের ডায়ালে চোখ বুলাল। 'ঠিক এগারো মিনিট পর। তার বেশি দেবার মত সময়

আমার হাতে সত্যি নেই, মেজর রানা। আমি দুঃখিত।'

'এগারো মিনিট পরে কেন? এখুনি নয় কেন?' ঘড় ঘড় করে উঠল পেরিয়াসের গলা। 'স্যার, কি লাভ অপেক্ষা করে? কত কাজ আমাদের হাতে...'

'ঠিক, অনেক কাজ পড়ে আছে,' পেরিয়াসের দিকে ফিরে বলল ফন হামেল। 'সেই কাজের কিছুটা ওদেরকে দিয়ে করিয়ে নিতে পারলে মন্দ কি? সাবমেরিনে সাপ্লাই লোড করতে হবে, ভুলে গেছ?' রানার দিকে ফিরল সে। 'তুমি পালের গোদা, তোমার একটা সম্মান আছে, তার ওপর জখম হয়েছ, কাজেই তোমাকে রেহাই দেয়া হলো। লোডিং শুরু করতে বলো ওদেরকে। ডকে ওই যে ইকুইপমেন্ট দেখছ, ফরওয়ার্ড হ্যাচে তুলতে হবে ওগুলো।'

'যদি না বলি?' শান্ত ভাবে প্রশ্ন করল রানা। যদিও মনে মনে খুশি হয়েছে ও। একটা কিছু কাজে লাগতে পারলে ফন হামেলের কাছ থেকে আরও কিছু সময় পাওয়া যাবে।

রানার দিকে নয়, পেরিয়াসের দিকে তাকাল ফন হামেল। 'কাজটা ওরা যদি করতে না চায়,' কথা শেষ না করে মুখ টিপে একটু হেসে নিল সে। 'প্রথমে মেজর রানার কানে গুলি করবে, তারপর পাশ থেকে নাকে।'

'ইয়েস, স্যার!' উৎসাহে ঝিক্ করে উঠল পেরিয়াসের চোখ।

'ঠিক আছে, লোড করব আমরা,' তাড়াতাড়ি বলল ডিক।

ডকের ওপর পাহাড় হয়ে আছে কাঠের ভারী বাক্স, সিকো আর লিন এক একটা করে তুলে ধরিয়ে দিল খালেদ আর নিমোর হাতে। হ্যাচের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে ডিক, শুধু বাক্স ধরার সময় হ্যাচের ভেতর থেকে উঠে এল তার হাত।

এই সময় হঠাৎ করে আবার যন্ত্রণা শুরু হলো রানার পায়ে। মনে হলো, খুদে একটা লোক জ্বলন্ত মশাল নিয়ে ক্ষতের ভেতর ছুটোছুটি করছে। অসহ্য ব্যথায় কয়েকবারই জ্ঞান হারাবার মত অবস্থা হলো ওর। শুধু ইচ্ছেশক্তির জোরে গলার আওয়াজটাকে স্বাভাবিক রাখতে পারলে ও।

'প্রশ্নের সবটা উত্তর কিন্তু আমি পাইনি। কিভাবে?'

'কখন মরতে হবে সেটা জানাই কি যথেষ্ট নয়?'

'আগেই বলেছি, চমক আমি পছন্দ করি না।'

কয়েক সেকেন্ড স্থির দৃষ্টিতে রানার চোখে তাকিয়ে থাকল ফন হামেল। মুচকি একটু হাসল সে। সিগারেট ধরাল। আরেকবার রিস্টওয়াচ দেখল। তারপর বলল, 'আমার পদ্ধতিটা নিষ্ঠুর নয়। মানুষকে ধরে ধরে যারা জ্যান্ত কবর দেয় তারা আমার এই পদ্ধতি দেখে বলতে বাধ্য হবে, আমি দয়ার সাগর, আমার মনটা ভারি নরম। ভাবছ, কি সেই পদ্ধতি, তাই না?' ঠোঁট টিপে হাসল আবার। 'তোমার খুব চেনা সেটা। একেবারে সহজ।' একটু থেমে, ধীরে ধীরে, নাটকীয় সুরে বলল সে, 'তোমাদেরকে পিস্তলের গুলি দিয়ে মারা হবে!'

ঝোড়ো একটা লাথি কষল রানা বুড়ো হামেলের তলপেটে, শয়তানটা কোঁক করে একটা আওয়াজ তুলেই ডেকের ওপর ছটফট করতে করতে মারা গেল দেখে অদ্ভুত এক তৃপ্তি আর আনন্দে আপ্লুত হয়ে উঠল ওর শরীর আর মন। আসলে এটা কল্পনা। লাথি মারা তো দূরের কথা, এক চুল নড়তে পর্যন্ত পারল না ও। একমুহূর্ত

চিন্তা করে বলল ও, 'সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্ট লোড করছেন, বিধ্বস্ত অ্যালব্যাট্রস থেকে মেশিনগান খুলে নিলেন, এসব দেখে বুঝতে পারা যায়, আপনারা কেটে পড়ছেন। পাততাড়ি গুটিয়ে কোথাও পালিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাই না?' ফন হামেলের চেহারায় ভাবের কোন প্রকাশ লক্ষ্য করা গেল না। আবার বলল রানা, 'আপনারা কেটে পড়ার পাঁচ, দশ কি ত্রিশ মিনিট পর এক্সপ্লোসিভ চার্জ ডিটোনেট করা হবে। টন টন পাথরের নিচে চিরকালের জন্যে চাপা পড়ে যাবে টানেল, গুহা, অর্থাৎ আপনার গোপন সাবমেরিন ঘাঁটি আর আন্ডারওয়াটার স্মাগলিং অপারেশনের অস্তিত্ব।'

ক্ষীণ একটু বিমূঢ়ভাব লক্ষ্য করা গেল ফন হামেলের চেহারায়। 'বলে যাও, মেজর। তোমার আন্দাজের বহর দেখে তাজ্জব বনে গেছি আমি।'

'আপনার ভেতর ভয় বাসা বেঁধেছে, ফন হামেল। এই ডেকের নিচে একশো ত্রিশ টন হিরোইন রয়েছে। ম্যাকাও বন্দর থেকে সাবমেরিনে লোড করা হয়েছে ওটা। ভারত মহাসাগর হয়ে, সুয়েজ ক্যানেলের ভেতর দিয়ে ওটাকে বয়ে নিয়ে এসেছে মুনমুন লাইন্সের ফ্রেটার, ডলফিন।' হঠাৎ মুচকি একটু হাসল রানা। 'এর মধ্যে কিন্তু ভারি একটা মজার ব্যাপার আছে!'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ফন হামেল। 'মজার ব্যাপার?'

'ডলফিন হিরোইন বহন করছে এই খবর দুনিয়ার কারও জানতে বাকি নেই—মজাটা এখানেই। যুক্তরাষ্ট্রের নারকোটিক ব্যুরো জানে, ইন্টারপোল জানে। সবাই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন ডলফিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্দরে নোঙর ফেলবে। ফেলতে যা দেরি, সাথে সাথে সার্চ করা হবে ডলফিনকে। মজার ব্যাপারটা হলো, আপনিও ঠিক তাই চান। কারণ, ডলফিনকে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেললেও তার ভেতর থেকে এক ছটাক হিরোইন বেরুবে না।' একটু থেমে নাটকীয় ভঙ্গিতে শেষ ঢিলটা ছুঁড়ল রানা, 'এবং, ডলফিনে যে হিরোইন আছে সেটা আপনিই রটিয়েছেন। তাই খবরটা জানে সবাই।'

পরিষ্কার বিহ্বল ভাব ফুটে উঠল ফন হামেলের চেহারায়। কিন্তু কোন কথা বলল না সে।

নড়েচড়ে বসে আহত পায়ের ওপর থেকে চাপ একটু কমাল রানা। লক্ষ্য করল, খালেদ আর নিমো ডিকের সাথে হ্যাচে নেমে গেছে। 'আপনার আস্ত টোপটা গিলে ফেলেছে ইন্টারপোল। তারা জানে না, সাবমেরিন আর হিরোইন কাল রাতে এখানে রেখে যাওয়া হয়েছে। মুনমুন লাইন্সের পরের জাহাজ মিনারভা আসছে, হিরোইনসহ সাবমেরিনটাকে সেটার সাথে পাঠানো হবে। মিনারভা যাবে নিউ অরলিয়ন্সে, তার হোল্ডে আছে টার্কিশ টোবাকো।' রিস্টওয়াচ দেখল রানা। 'এখন থেকে ঠিক দশ মিনিট পর তীর থেকে এক মাইল দূরে নোঙর ফেলবে মিনারভা। সেজন্যেই আপনি এত ব্যস্ত, ফন হামেল। সেজন্যেই ভয় বাসা বেঁধেছে আপনার মনে। কারণ, এই প্রথমবার দিনের উজ্জ্বল আলোয় স্মাগলিং অপারেশন চালাতে বাধ্য হচ্ছেন আপনি।'

'তোমার কল্পনাশক্তির প্রশংসা করতে হয়,' মৃদু গলায় বলল বুড়ো জার্মান। চিন্তার রেখা ফুটে উঠল তার চেহারায়। 'কিন্তু যা বললে তার কিছুই তুমি প্রমাণ

করতে পারবে না।'

'প্রমাণ করার চেষ্টাই বা করব কি করে? কতক্ষণই বা বেঁচে আছি?'

'ঠিক, মেজর। ঠিক বলেছ। তুমি কি জানো না জানো তাতে আমার কিছু আসে যায় না। মরতে তোমাকে হচ্ছেই। আর সেজন্যেই তোমার কাছে সত্য গোপন করারও কোন মানে হয় না। যা যা আন্দাজ করেছ, সবই সত্যি। শুধু একটা তথ্যে ভুল আছে। মিনারভা নিউ অরলিয়ন্সে নয়, শেষ মুহূর্তে কোর্স বদলে ভিড়বে টেক্সাসের গালভেস্টনে।'

দ্বিতীয় সাবমেরিনের ডেকে দাঁড়িয়ে অ্যালব্যাট্রস থেকে মেশিনগান নামাচ্ছিল তিনজন লোক, কাজ শেষ করে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেছে তারা। ডক থেকে নেমে হ্যাচের ভেতর দিয়ে একটা কাঠের বাক্স সিকোর হাতে ধরিয়ে দিল লিন। নিমো, খালেদ আর ডিকের সাথে সিকোও এখন হ্যাচের ভেতর নেমে পড়েছে। তাড়াতাড়ি কথা বলল রানা, এখন ওর প্রতিটি সেকেন্ড দরকার।

'আমাদেরকে পেরিয়াসের হাতে তুলে দেবার আগে একটা প্রশ্নের উত্তর আশা করি আমি,' বলল ও। 'স্রেফ কৌতূহল থেকে জানতে চাইছি গালভেস্টনে আনলোড করার পর কিভাবে বিলি করা হবে হিরোইন?'

সিগারেটে টান দিয়ে ঠোঁট টিপে হাসল ফন হামেল। 'ছোট একটা ফিশিং-বোট ফ্লিটেরও মালিক আমি। তেমন আয় হয় না, তবে মাঝেমধ্যে ভারি কাজে লাগে। ঠিক এই মুহূর্তে, গালফ অফ মেক্সিকোয় জাল ফেলছে ওগুলো। আমার সিগন্যালের অপেক্ষায় আছে ওরা। সিগন্যাল পেলেই জাল গুটিয়ে নিয়ে পোর্টে পৌঁছুবে, মিনারভার সাথে একই সময়ে। বাকিটা পানির মত সহজ।—জাহাজ থেকে খসে যাবে সাবমেরিন, ফিশিং-বোটগুলো তাকে সাথে করে নিয়ে যাবে একটা ক্যানারিতে। তারপর বিল্ডিঙের নিচে কার্গো খালাস করা হবে। 'ক্যাটফুড' লেবেল সাঁটা ক্যানে ভরা হবে হিরোইন। ওখান থেকে ট্রাকে করে যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশটা রাজ্যে পৌঁছে যাবে ক্যানগুলো। নারকোটিক ব্যুরো কিছু সন্দেহ করার আগেই কেল্লা ফতে!'

'মাত্র কিছু ডলারের জন্যে এই রকম একটা জঘন্য পেশা কেন আপনি বেছে...'

'মাত্র? হাফ বিলিয়ন ডলারকে তুমি মাত্র কিছু বলবে?' আহত দেখাল ফন হামেলকে।

'কিন্তু ডলারগুলো গোণার সময় আপনি পাবেন বলে মনে করেন?' বিদ্রূপের পর হাসি দেখা গেল রানার ঠোঁটে।

'কে বাধা দেবে আমাকে? তুমি, মেজর রানা? সম্ভবত আকাশ থেকে নেমে এসে আমার মাথায় বাজ হয়ে পড়বে?'

'অভিশাপে বিশ্বাস করেন না?' জানতে চাইল রানা।

'যথেষ্ট হয়েছে, স্যার! এবার অনুমতি দিন, আমি শোধ তুলি!' এক পা এগিয়ে এল পেরিয়াস।

'উঁহুঁ,' মাথা নেড়ে বলল রানা। তাকিয়ে আছে ফন হামেলের দিকে। 'এগারো মিনিট পুরো হয়নি এখনও।'

রানার দিকে নয়, হাতের জ্বলন্ত সিগারেটের দিকে এক দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ

তাকিয়ে থাকার পর মৃদু কণ্ঠে বলল ফন হামেল, 'একটা ব্যাপারে মনটা খুঁত খুঁত করছে। মেজর রানা, তুমি আমার নাতনীকে কিডন্যাপ করলে কেন?'

সাথে সাথে উত্তর দিল রানা। 'আপনি মোনার কথা বলছেন? কে বলল সে আপনার নাতনী?'

আট

বিস্ময়ে ঝুলে পড়ল পেরিয়াসের মুখ। 'নাতনী নয়, আপনি জানলেন কিভাবে?'

'আপনার সাম্রাজ্যে স্পাই ঠিকই ঢুকিয়েছিল ইন্সপেক্টর বোথাস,' ফন হামেলকে বলল রানা। 'কিন্তু আপনি সেটা টের পেয়ে যান। আসল নাতনীকে ইংল্যান্ডের নিরাপদ কোথাও সরিয়ে ফেলে সে, অনেকটা তার মত দেখতে আরেকটা মেয়েকে খুঁজে বের করে। আসল মোনাকে আপনি বিশ বছর দেখেননি, কাজেই তার চেহারা মনে থাকার কথা নয়।'

নির্লিপ্ত দেখাল ফন হামেলকে। শুধু রানাকে সমর্থন করে মৃদু একটু মাথা ঝাঁকাল সে।

'মেয়েটা যে আসল নয়, নকল, সেটা আপনি জানতে পারেন পেরিয়াসের কাছ থেকে,' বলল রানা। 'সে-সময় আপনার সামনে দুটো পথ খোলা ছিল। নকল বলে তিরস্কার করে ভিলা থেকে তাকে বের করে দেয়া, অথবা সব জেনেও চুপ করে থাকা। আপনি দেখলেন, চুপ করে থাকাই ভাল, তাতে ইন্সপেক্টর বোথাসকে ভুল তথ্য সরবরাহ করার সুবর্ণ একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।'

'নিজেদের পাতা ফাঁদে ওরা নিজেরাই ধরা পড়ল, অথচ সেটা জানতেও পারল না, তাই নয় কি?' ঠোঁট মুচড়ে হাসল ফন হামেল।

'মেয়েটা ভিলায় পা রাখার পর থেকেই তার ওপর নজর রাখতে শুরু করল কার্ল। রোজ সকালে সৈকতে সাঁতার কাটতে যেত মোনা, আসল উদ্দেশ্য ইন্সপেক্টর বোথাসের সাথে যোগাযোগ করা। ইচ্ছে করেই সুযোগটা তাকে দেয়া হত, কারণ বোথাসকে তথ্য সরবরাহ করার ওটাই একমাত্র পথ ছিল। কিন্তু এমন কোন একটা ঘটনা ঘটে, যার ফলে সন্দেহ দেখা দিল বোথাসের মনে। সম্ভবত কার্লকে দেখতে পেয়েছিল সে। বুঝতে পেরেছিল, মোনাকে কার্ল অনুসরণ করছে। মোনার সাথে তার আগের সাক্ষাৎকারগুলোও কার্লের চোখে পড়েছে, ধরে নেয় সে। বুঝতে পারে, তার প্ল্যানটা ভেস্তে গেছে।'

'বোথাসের মন থেকে সন্দেহ দূর করতে পারতাম আমরা,' বলল ফন হামেল। 'কিন্তু তুমি এসে সব গোলমাল করে দিলে।'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'সেদিন সৈকতে আমাকে দেখল মেয়েটা। দিনের আলো তখনও ফোটেনি, আমাকে সে ইন্সপেক্টর বোথাস বলে মনে করেছিল। সৈকতে শুয়ে ছিলাম আমি, দেখে ধরে নেয় আপনার কোন লোক বোথাসকে খুন করে ফেলে রেখে গেছে। হঠাৎ আমাকে নড়তে দেখে ভূত দেখার মত চমকে উঠেছিল

সে।'

পায়ের ব্যথাটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, ক্ষতের ওপরটা দু'হাত দিয়ে খামচে ধরে ব্যথা সহ্য করার চেষ্টা করল রানা। 'ইন্সপেক্টর বোথাস সৈকতে আসেনি সেদিন। আমাকে নড়তে দেখে মোনা ধরে নিল, আমি আপনারই লোক। মেয়েটার মাথা ভাল, দ্রুত চিন্তা করতে পারে। শেখানো বুলি আওড়ে নিজের পরিচয় দেয় সে, তারপর ভিলায় গিয়ে নানার সাথে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানায়। ইচ্ছে, যেন কিছুই জানে না এই রকম একটা ভাব করে আপনার নিজের ভাড়া করা লোকের সাথে আপনারই পরিচয় করিয়ে দেবে।'

'মজার ব্যাপার কি জানো? তুমি ব্র্যাডি ফিল্ডের গারবেজ কালেক্টর, কথাটা মোনা বিশ্বাস না করলেও আমি কিন্তু বিশ্বাস করেছিলাম।'

'বিশ্বাস করেছিলেন, তার কারণ, আপনি জানতেন, কোন সুস্থ, ট্রেনিং পাওয়া এজেন্ট এ-ধরনের কাভার ব্যবহার করে না। তাছাড়া, আপনার আতঙ্কিত হবার কোন কারণ ছিল না। পেরিয়াসের কাছ থেকে আপনি কোন সতর্ক সংকেত পাননি।'

বেল্টটা অ্যাডজাস্ট করে নিয়ে ক্ষতের ওপর থেকে চাপ একটু কমাল রানা। 'ডিনার খেতে এসে যখন বললাম, আমি একজন মেজর, সাথে সাথে আপনি আমাকে বোথাসের এজেন্ট বলে ধরে নিলেন। আপনার সন্দেহ আরও দৃঢ় হলো ব্র্যাডি ফিল্ডে হামলা চালাবার জন্যে আমি যখন দায়ী করলাম আপনাকে। কাজেই আমাকে মেরে ফেলার প্ল্যান করলেন আপনি। জানতেন, টানেলে লাশের যেটুকু অবশিষ্ট থাকবে তা কারও চোখে পড়বে না কোনদিন। ইতিমধ্যে মোনা টের পেয়ে যায়, আমাকে ডিনার খেতে আনিয়ে মারাত্মক ভুল করে ফেলেছে সে। বুঝতে পারে, আমি আপনার ভাড়া করা লোক নই। কিন্তু যা হবার হয়ে গিয়েছিল, তার আর কিছু করার ছিল না।'

চিন্তিত দেখাল ফন হামেলকে। 'নিশ্চয়ই তখনও তুমি ওকে আমার নাতনী বলেই জানতে। তা না হলে কিডন্যাপ করবে কেন?'

'ওকে কিডন্যাপ করার পিছনে আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল আমার, তথ্য আদায় করা,' বলল রানা। 'কেউ যদি আমাকে খুন করার চেষ্টা করে, কারণটা জানতে চাই আমি। কিন্তু মেয়েটাকে নিয়ে টানেল থেকে বেরুতে যাব, এই সময় বাধা দিল কর্নেল রেনো। সে যাই হোক, মেয়েটাকে বের করে নিয়ে এসে বোথাসের উপকারই করি আমি।'

'কি রকম?'

'বোথাস বুঝতে পারছিল, মেয়েটাকে ভিলায় রাখার আর কোন মানে হয় না। বরং যতক্ষণ সেখানে থাকবে ও, ততক্ষণ তার প্রাণের এক কানাকড়িও দাম নেই।'

'অনেক কথা বলছ তুমি, মেজর রানা,' গম্ভীর শোনাল ফন হামেলের কণ্ঠস্বর। 'আমিও আগ্রহ নিয়ে শুনছি। কিন্তু এসবে লাভ আছে কিছু? আমি দু'জনেরই লাভের কথা বলছি।'

'ঠিক বুঝলাম না।'

'আমি যদি তোমাকে একটা লোভনীয় প্রস্তাব দিই, তুমি সেটা বিবেচনা করে

দেখবে?' জানতে চাইল ফন হামেল। 'আগেই বলেছি, বুদ্ধিমান, যোগ্য, সাহসী লোক দরকার আমার। উত্তর দেবার আগে ভাল করে ভেবে দেখো ব্যাপারটা। শুধু প্রাণে বেঁচে যাবে তাই নয়, আমার ডান হাত হিসেবে কাজ করার দুর্লভ সুযোগও পাবে।'

'আপনি আমাকে পেরিয়াস মনে করবেন না,' বলল রানা। ফন হামেলকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে আগের প্রসঙ্গে ফিরে এল রানা। '...কিন্তু, বোথাসের সামনে নতুন একটা সমস্যা দেখা দিল—আমি আর বেন। সে জানত, আমরা আপনার পেছনে লেগেছি। সে-ও অনেক দিন থেকে লেগেই আছে। অথচ আমাদেরকে বাধা না দিয়ে তার উপায় ছিল না। লিগ্যালি, জোর করে আমাদেরকে আটকে রাখার অধিকার তার ছিল না। কাজেই প্রস্তাব দিল আমরা যেন ইন্টারপোলের সাথে সহযোগিতা করতে রাজি হই। তাহলে আমাদের ওপর নজর রাখতে তার সুবিধে হবে।'

'ঠিক বলেছ, মেয়েটাকে খুন করার প্ল্যানই করেছিলাম আমি,' গম্ভীর গলায় বলল ফন হামেল।

'সেজন্যেই আমি যখন প্রস্তাব দিলাম মেয়েটাকে ব্লু লিডারে আমার হেফাজতে রাখব, বোথাস কোন আপত্তি তোলেনি। দুটো সুবিধে দেখতে পাচ্ছিল সে। আমার আর বেনের ওপর নজর রাখতে পারবে মোনা, সেই সাথে আপনার নাগালের বাইরেও থাকতে পারবে। তখনও আমি মেয়েটার আসল পরিচয় আন্দাজ করতে পারিনি। পারলাম এই আজ সকালে।'

'আশ্চর্য!' অবিশ্বাসের সাথে মাথা নাড়ল পেরিয়াস। 'এত কথা আপনি জানলেন কিভাবে?'

'সবটা জেনেছি তা নয়,' বলল রানা। 'কিছু কিছু জেনেছি, বাকিটা আন্দাজ করে নিতে হয়েছে। নিরীহ একটা মেয়ের পায়ে টেপ দিয়ে আটকানো টু-ফাইভ ক্যালিবারের অটোমেটিক মাউজার থাকে না। এ থেকেই বোঝা গিয়েছিল, মেয়েটা প্রফেশনাল। সৈকতে আমার সাথে যখন দেখা হলো, তখন তার কাছে ছিল না ওটা। ভিলার স্টাডি থেকে তাকে আমি যখন কাঁধে নিই তার খানিক পর ওর পা থেকে ওটা পড়ে যেতে দেখে তুলে নেয় বেন। তারমানে, ভেতরের কাউকে ভয় করছিল সে, ভিলার বাইরের কাউকে নয়।'

'তুমি দেখছি আমাকে মুগ্ধ করে ছাড়লে, হে!' ভারী গলায় বলল ফন হামেল। 'তুমি যে এতটা ধুরন্ধর, তা বুঝিনি। যদিও যতই কিনা মুগ্ধ করো আমাকে, তোমার তাতে কোন লাভ নেই।'

ফন হামেলের কথা রানা যেন শুনতেই পায়নি, বলল, 'আমরা যে এখানে এসেছি তা কিন্তু ইন্সপেক্টর বোথাস জানে।'

'জানে নাকি?' মুচকি একটু হাসি দেখা গেল ফন হামেলের ঠোঁটে। 'কিভাবে জানে, বলবে?'

'মেয়েটাকে আমি সুযোগ দিয়েছিলাম, যাতে বোথাসকে মেসেজ পাঠাতে পারে সে। জাহাজের রেডিও অপারেটরকে কফির সাথে ড্রাগ খাইয়ে রেডিও রুম থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বের করে আনে, তারপর বোথাসকে জানায় আমরা এখানে

আসার প্ল্যান করছি।'

'মেসেজটা রিসিভ করে বোথাস নয়, আমাদের পেরিয়াস,' আবার সেই মুচকি হাসি দেখা গেল ফন হামেলের ঠোঁটে। 'বোথাসকে কথাটা বলতে ভুলে গেছে ও!'

পায়ের ব্যথাটা আবার বাড়তে শুরু করেছে। এখনই উচিত সময় কিনা ভাবল রানা। ওর দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে আসছে, এখনই ঝাপসা দেখতে শুরু করেছে ও। ব্যথা এর চেয়ে বাড়লে হয়তো কথাই বলতে পারবে না। মাথাটা একটু কাত করে পেরিয়াসের দিকে তাকাল ও। হাতের পিস্তলটা এখনও ওর নাভি লক্ষ্য করে ধরে আছে সে। না, আর দেরি করার কোন মানে হয় না।

'কিন্তু অ্যাডমিরাল কেসারলিং, আপনার সময় ঘনিয়ে এসেছে!'

প্রথমে কোনরকম সাড়া দিল না ফন হামেল। আগের মতই ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল, ভাবলেশহীন চেহারা। তারপর ধীরে ধীরে চোখের দৃষ্টিতে ফুটে উঠতে শুরু করল নিখাদ বিস্ময় আর অবিশ্বাস। রানার দিকে এক পা বাড়ল সে, চোখ দুটো কোটর ছেড়ে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে যেন। 'কি—কি নামে ডাকলে আমাকে?' কেউ যেন গলা চেপে ধরেছে তার, বোজা গলা থেকে হিস হিস করে আওয়াজ বেরিয়ে এল।

'অ্যাডমিরাল কেসারলিং,' আবার বলল রানা। 'অ্যাডমিরাল কার্ট কেসারলিং—নাজী জার্মানীর ট্র্যান্সপোর্টেশন ফ্লিটের কমান্ডার। অ্যাডলফ হিটলারের ফ্যানাটিক অনুসারী। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের একজন হিরো, আলবার্ট কেসারলিঙের আপন ভাই।'

'তুমি···তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে!'

'ইউ-নাইনটিন। ওটাই আপনার চরম ভুল।'

'প্রলাপ···অর্থহীন প্রলাপ!' বিড়বিড় করে বলল বুড়ো জার্মান।

'ইউ-নাইনটিনের মডেলটা আপনার স্টাডিতে আছে,' বলল রানা। 'দেখেই মনটা খুঁত খুঁত করে উঠেছিল। একজন এক্সকমব্যাট পাইলটের ঘরে একটা প্লেন আশা করতে পারি আমরা, সাবমেরিন নয়। মজার ব্যাপার কি জানেন? আপনার ভাড়া করা লোক পেরিয়াসকে দিয়েই বার্লিনের জার্মান ন্যাভাল আর্কাইভের সাথে যোগাযোগ করি আমি। ও তো আর আপনার সত্যিকার পরিচয় জানে না, কাজেই কিছুই সন্দেহ করেনি। বোথাসের রেডিও ব্যবহার করে ও।'

বোকার মত রানার দিকে তাকিয়ে আছে পেরিয়াস। 'ও, তাহলে এই মতলব ছিল আপনার!'

'সাধারণ রুটিন এনকোয়্যারি ছিল ওটা। ইউ-নাইনটিনের ক্রুদের তালিকা চাই আমি। মিউনিখে আমার এক বুড়ো বন্ধু আছে, তাঁর সাথেও যোগাযোগ করি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফন হামেল নামে কোন পাইলট ছিল কিনা খোঁজ নিয়ে জানাতে বলি আমাকে। যে উত্তরটা পেলাম, ভারি মজার। জার্মান ইমপিরিয়াল এয়ার সার্ভিসে একজন ফন হামেল ফ্লায়ার ছিল বটে।' বুড়ো জার্মানের দিকে তাকাল রানা। 'কিন্তু আপনি বলেছিলেন আলবার্ট কেসারলিঙের সাথে জাস্টা থ্রীতে পোস্টেড ছিলেন, প্লেন নিয়ে উঠতেন ম্যাসেডোনিয়ার জান্তি অ্যারোড্রোম থেকে। অথচ আমার যোগাড় করা তথ্যে দেখা যাচ্ছে আসল ফন হামেল পোস্টেড ছিল ফ্রান্সে, জাস্টা

লাইনে—একদিনের জন্যেও ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট ছেড়ে যায়নি সে। ইউ-লাইনটিনের ক্রুদের তালিকায় প্রথম নামটা ছিল কমান্ডার কার্ট কেসারলিং। মনটা খুঁত খুঁত করতে থাকায় আবার বার্লিনের সাথে যোগাযোগ করলাম, এবার জাহাজ থেকে। উত্তরে কার্ট কেসারলিং সম্পর্কে এমন সব তথ্য পেলাম, যা দিয়ে জার্মান অথরিটিকে কাঁপিয়ে দেয়া যায়।'

'উদ্ভট, ভিত্তিহীন প্রলাপ!' হাত দুটো শক্ত মুঠো করে রানার মুখের সামনে নাড়ল বুড়ো জার্মান। 'তোমার এই রূপকথায় কেউ কান দেবে না। শুধু একটা মডেল সাবমেরিন—আমার আর কেসারলিঙের মাঝখানে ওটা কোন ভ্যালিড কানেকশন হতে পারে না।'

'কিছু প্রমাণ করার দরকার নেই আমার,' বলল রানা। 'ফ্যাক্টগুলো নিজেরাই কথা বলছে। হিটলার যখন ক্ষমতায় এল, আপনি তার অন্ধ অনুসারী হয়ে উঠলেন। আপনার বিশ্বস্ততা লক্ষ করে, সেই সাথে মূল্যবান কমব্যাট অভিজ্ঞতা আছে দেখে, পদোন্নতি ঘটিয়ে আপনাকে সে ট্রান্সপোর্টেশন ফ্লিটের কমান্ডিং অফিসার বানিয়ে দেয়। এই টাইটেল যুদ্ধের শেষ পর্যন্ত, জার্মানীর আত্মসমর্পণের ঠিক আগে পর্যন্ত, ব্যবহার করেন আপনি। কিন্তু তারপরই গায়েব হয়ে যান।'

'এসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই!' গর্জে উঠল বুড়ো জার্মান।

তার কথায় কান না দিয়ে বলল রানা, 'এবার আসল ফন হামেলের কথায় ফিরে আসি। ধনী এক জার্মান ব্যবসায়ীর মেয়েকে বিয়ে করে ফন হামেল। ব্যবসায়ী শ্বশুরের অনেক ব্যবসার মধ্যে একটি ছিল সওদাগরী জাহাজের ছোট একটা বহর—গ্রীসের পতাকা উড়িয়ে চলাচল করত। স্বার্থ উদ্ধারের সম্ভাবনা কোথাও দেখতে পেলে সেটাকে সহজেই চিনতে পারত ফন হামেল। গ্রীক নাগরিকত্ব যোগাড় করে মুনমুন লাইন্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে বসল সে। তার আগে পর্যন্ত কোম্পানিটা লোকসান দিচ্ছিল, কিন্তু তার ছোঁয়া পেয়ে ব্যবসাটা যেন রাতারাতি জমে উঠল। জার্মানীতে বেআইনী আর্মস স্মাগল করতে শুরু করল সে। সেই সূত্রেই তার সাথে পরিচয় ঘটে গেল আপনার। অপারেশনটা নিখুঁত ভাবে চালাবার ব্যাপারে তাকে আপনি সাহায্য করেন। কিন্তু ফন হামেল বোকা ছিল না, সে বুঝতে পারে, শেষ পর্যন্ত জার্মানী হেরে যাবে। তাই জার্মানীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মিত্রপক্ষের সাথে সখ্যতা গড়ে তোলে।'

'কিন্তু যোগাযোগটা কোথায়?' প্রশ্নটা এল পেরিয়াসের কাছ থেকে।

পেরিয়াসের দিকে তাকালই না রানা, বলে চলল, 'আর কেউ হলে যুদ্ধের শেষে পালিয়ে যেত। কিন্তু আপনি, অ্যাডমিরাল কার্ট কেসারলিং অন্য ধাতুতে গড়া। যেভাবেই হোক ইংল্যান্ডে চলে যান আপনি। ওখানে বাস করছিল আমাদের আসল ফন হামেল। তাকে আপনি খুন করেন, খুন করে তার জায়গায় বসিয়ে দেন নিজেকে।'

'তা কিভাবে সম্ভব?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল পেরিয়াস।

'আকার এবং গড়ন দু'জনের প্রায় একই রকম ছিল,' বলল রানা। বিস্তর টাকা খরচ করে একজন সার্জেনের সাহায্য নেন আপনি। সে আপনার চোখ, কান, ঠোঁট, মুখের চামড়া ইত্যাদি বদলে ফন হামেলের মত করে দেয়। এবং নিজের চেষ্টায়

আপনি আপনার বাচনভঙ্গি, অভ্যেস, ব্যবহার, আচরণ এই সব বদলে ফেলেন। প্র্যাকটিস করে এসব নিখুঁত করে তোলেন আপনি। লোকজন আপনাকে সন্দেহ করেনি। কে করবে? ফন হামেল শুধু যে ঘরকুনো, নিঃসঙ্গ, বন্ধুহীন পুরুষ ছিল তাই নয়, লোকটার কোন আত্মীয়-স্বজনও ছিল না এক কথায়, কেউ তাকে ব্যক্তিগত ভাবে চিনত না। ছেলেপিলে হওয়ার আগেই মারা যায় তার স্ত্রী। থাকার মধ্যে ছিল এক ভাগ্নী, জন্ম এবং মানুষ হয়েছে গ্রীসে। এমনকি অনেকদিন পর্যন্ত সে-ও নকল ফন হামেলকে সন্দেহ করেনি। যখন একটু একটু সন্দেহ হতে শুরু করল, ব্যাপারটা টের পেয়ে গেলেন আপনি, এবং তাকে ও তার স্বামীকে খুন করলেন। কিন্তু সবাই জানল বোট অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে ওরা। মোনা ছিল ওদের একমাত্র মেয়ে। সে তখন শিশু। ভাগ্যগুণে বেঁচে গেল সে, কিন্তু আপনি রটালেন আপনিই তাকে ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচিয়েছেন। পরে তাকেও মেরে ফেলার ইচ্ছে হয়েছিল আপনার, এ আমি হলপ করে বলতে পারি, কিন্তু আরেকটা মিথ্যে দুর্ঘটনা সাজাতে সাহস পাননি।'

চোখে ঘৃণা নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে রয়েছে বুড়ো।

'ফন হামেলের চোরাকারবারের ব্যবসা আপনার হাতে পড়ে আরও ফুলে ফেঁপে উঠল, নদীর স্রোতের মত আসতে শুরু করল টাকা। কিন্তু আপনি স্বস্তি পেলেন না। মনে আপনার শান্তি এল না। কারণ, আপনার অতীতটা বড় ভয়ঙ্কর। নুরেমবার্গ ওয়র ট্রাইব্যুনালে যাদের বিচার হবার কথা, তাদের মধ্যে আপনিও ছিলেন। মার্টিন বোরম্যানের নিচেই ছিল আপনার নাম। কিন্তু আপনাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। যাবে কিভাবে? আপনি ইতিমধ্যে গ্রীসে পালিয়ে এসে থাসোসে গা ঢাকা দিয়েছেন, মস্ত একটা ভিলা তৈরি করে লুকিয়ে আছেন সবার চোখের আড়ালে। আপনার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ ছিল, তাও জানতে পেরেছি। বন্দীদেরকে ভাঙাচোরা জাহাজে ভরে গভীর সাগরে পাঠিয়ে দিতেন আপনি, মিত্রপক্ষের পাইলটরা ওগুলোকে ডুবিয়ে দিত। ওদেরকে দিয়েই ওদের খুন করাতেন আপনি। আপনার অবর্তমানেই বিচার হয়, শাস্তি হয় মৃত্যুদণ্ড। সেই দণ্ড এতদিনে কার্যকর হতে যাচ্ছে!'

ভয়ঙ্কর অসুস্থ, দুর্বল বোধ করছে রানা। একটানা এত কথা বলে হাঁপিয়ে উঠেছে। ক্লান্ত চোখে গার্ডদের দিকে, তারপর টানেল আর জাপানী আই-বোটের দিকে তাকাল ও। জানে, শেষ তাসটা খেলা হয়ে গেছে ওর, সময় পাবার আর কোন উপায় নেই। বলল, 'যা বললাম তার সবটুকু সত্য সে দাবি করি না, এর সাথে যুক্তি দিয়ে তৈরি করা কিছু অনুমানও আছে। জার্মানদের ফাইলে সব তথ্য পাওয়া যায়নি। খুঁটিনাটি বিবরণ কোনকালেই জানা সম্ভব নয়। অবশ্য আপনি যদি স্বেচ্ছায় স্বীকার করেন তাহলে আলাদা কথা।'

শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন চোখে রানার দিকে তাকাল বুড়ো। 'ওর কথায় কান দিয়ো না, পেরিয়াস। যা বলল, সবটাই গাঁজাখুরি গল্প...'

এই সময় আবার ফিরে আসতে শুরু করল কুয়াশা। ডকের ওপর দিয়ে কেউ একজন এগিয়ে আসছে। ভারী বুট জুতোর আওয়াজ পেল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছন দিকে তাকাল বুড়ো জার্মান। সবুজ ইউনিফর্ম পরা একজন লোককে দেখা

গেল। এগিয়ে এসে বুড়োর সামনে থামল সে। 'এইমাত্র মিনারভা নোঙর ফেলল, স্যার।'

'ব্যাটা, ঘুদ্ধু!' রাগে কেঁপে উঠল বুড়ো। 'পোস্ট ছেড়ে কে আসতে বলেছে তোকে?'

ছুটে চলে গেল সবুজ ইউনিফর্ম।

'আরও দেরি করবেন, স্যার?' জানতে চাইল পেরিয়াস। রানার নাভি লক্ষ্য করে ধরা ল্যুগারটা তার হাতে একটুও কাঁপল না। 'দিই শালার পেট ফুটো করে?'

'দুঃখিত, মেজর,' রানার চোখে চোখ রেখে বলল বুড়ো জার্মান। 'তোমাকে বাঁচিয়ে রাখার কোন ইচ্ছে বা উপায় নেই আমার।'

গুলি হবে, বুঝতে পারল রানা। কোথায় লাগবে বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত হয়ে উঠল শরীরটা।

নয়

গুলি হলো। ল্যুগারের তীক্ষ্ণ শব্দ নয়, শোনা গেল ফরটি-ফাইভ কোল্ট অটোমেটিকের ভরাট, ভারী আওয়াজ। ব্যথায় ককিয়ে উঠল পেরিয়াস, তার হাত থেকে ছিটকে পানিতে পড়ল ল্যুগারটা। গায়ে ফিট করেনি, খুবই ঢোলা একটা সবুজ ইউনিফর্ম পরা বেন নেলসন লাফ দিয়ে ডক থেকে নামল সাবমেরিনের ডেকে। হাতের কোল্টটা বুড়ো জার্মানের কানের ওপর চেপে ধরল সে। উঁকি দিয়ে রানার দিকে তাকাল, বলল, 'বিশ্বাস করো, এবার সেফটি ক্যাচ অফ করতে ভুল হয়নি আমার!'

'এত দেরি করছ দেখে ভাবলাম দুনিয়ার মায়া বুঝি ছাড়তেই হলো…'

হতভম্ব দেখাল বুড়ো জার্মান আর পেরিয়াসকে। ঝুল-কার্নিসে দাঁড়ানো গার্ডরা একযোগে স্টেন তুলল ডেকের দিকে।

'বোকামি করো না!' সাবধান করে দিল বেন। 'তোমরা মেজর রানাকে গুলি করলে আমিও তোমাদের বসের মগজ উড়িয়ে দেব। তোমাদেরও মরতে হবে। বিশ্বাস না হয়, টানেলের দিকে তাকাও।'

দেখা গেল, টানেলের মুখে দশজন লোক বিভিন্ন পজিশনে দাঁড়িয়ে, বসে, হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে অপেক্ষা করছে। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মেশিন পিস্তল।

'এবার আমার পিছনে, সাবমেরিনের দিকে তাকাও,' বলল বেন।

জাপানী আই-বোটের কোনিং টাওয়ারে দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল রেনো। মেশিনগানের ট্রিগারে রয়েছে তার হাত। দেখে গুলি করার সাধ মিটে গেল গার্ডদের। হাতের স্টেন পানিতে ফেলে দিল তারা। কাউকে কিচ্ছু বলতে হলো না, সবাই হাত তুলল মাথার ওপর। টানেলের মুখ থেকে বেনের লোকেরা এগোল তাদের দিকে।

'এত দেরি করলে কেন?'

'কি আশ্চর্য, দেরি হবে না? সাঁতরে তীরে যেতে হলো, খুঁজে বের করতে হলো কর্নেল বোথাস আর কর্নেল রেনোকে, ওদের কমান্ডো বাহিনীকে তৈরি হবার জন্যে সময় দিতে হলো, তারপর অ্যাম্ফিথিয়েটার হয়ে টানেলের ভেতর দিয়ে এলাম, দেরি হবে না? রোম কি একদিনে গড়ে উঠেছিল?' ঝাঁঝের সাথে, কিন্তু মুখে হাসি নিয়ে এক দমে কথাগুলো বলে গেল বেন।

'আমি যেখানটায় বলেছিলাম···'

'কোন সমস্যাই হয়নি। তুমি যেখানে বলেছিলে ঠিক সেখানেই পেয়েছি এলিভেটর শ্যাফট।'

ঠাণ্ডা চোখে রানার দিকে তাকাল ফন হামেল ওরফে অ্যাডমিরাল কার্ট কেসারলিং। 'এলিভেটরের কথা কে বলল তোমাকে।'

'কেউ বলেনি,' জানাল রানা। 'টানেল থেকে বেরুবার চেষ্টা করছিলাম, এই সময় শাখা প্যাসেজে একটা ভেন্টিলেটর শ্যাফট দেখতে পাই। ফাঁকটার ওদিক থেকে জেনারেটরের আওয়াজও শুনতে পেয়েছিলাম। পরে যখন আন্দাজ করলাম আপনি আন্ডারওয়াটার ঘাঁটি ব্যবহার করছেন, তখনই এলিভেটরের সম্ভাবনাটা জাগল মনে। ভিলা থেকে পানির তলার ঘাঁটিতে নামার একমাত্র উপায় এলিভেটর ছাড়া আর কি হতে পারে?'

ডকে কি যেন নড়ে উঠল, মুখ তুলে সেদিকে তাকাল রানা। এগিয়ে এসে ওর সামনে দাঁড়াল ইন্সপেক্টর বোথাস। কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে রানাকে দেখল সে, তারপর জানতে চাইল, 'পায়ের কি অবস্থা?'

'দিন দশেক বিছানায় পড়ে থাকতে হতে পারে,' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল রানা।

'রেনো স্ট্রেচার নিয়ে আসার জন্যে লোক পাঠিয়েছে। এখুনি পৌঁছে যাবে।'

'আমাদের আলাপ বোধহয় আড়ি পেতে শুনেছেন?'

'হ্যাঁ। সব।'

'কিন্তু কিছুই আমার বিরুদ্ধে প্রমাণ করতে পারবে না তোমরা,' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল অ্যাডমিরাল কার্ট কেসারলিং। ঠোঁটের কোণে ঘৃণার ভাব, কিন্তু মুখের চেহারায় পরাজয়ের ছায়া ফুটে উঠেছে।

'আগেই বলেছি, ফ্যাক্ট নিজেই কথা বলবে, কথার জাল বুনে কিছু প্রমাণ করার দরকার হবে না। চারজন ওয়র ক্রিমিন্যাল ইনভেস্টিগেটর জার্মানী থেকে এরই মধ্যে রওনা হয়ে গেছে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে তারা। তাদের চোখকে ফাঁকি দেবার কোন উপায় নেই। আপনার প্লাস্টিক সার্জারী ধরে ফেলবে তারা। গলার আওয়াজ বদলেছেন, সেটাও ধরা পড়বে। আপনি খামোকা এখনও আশা করছেন, অ্যাডমিরাল। মেনে নিন। শেষ হয়ে গেছে আপনার শয়তানী।'

'আমি গ্রীক নাগরিক,' জেদের সুরে বলল কেসারলিং। 'আমাকে জোর করে জার্মানীতে নিয়ে যাবার কোন অধিকার নেই ওদের।'

'গ্রীক নাগরিক ছিল ফন হামেল, আপনি নন,' মুচকি হেসে বলল রানা।

আবার কিছু বলতে যাচ্ছিল বুড়ো শয়তান, কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে বোথাস বলল, 'প্যাচাল বন্ধ করুন তো! আপনার কথা শোনার ধৈর্য নেই আমাদের। ফের

যদি মুখ খোলেন, রুমাল গুঁজে দেব।'

ফিক্ করে হেসে ফেলল বেন।

'গালভেস্টনে কে যাচ্ছে?'

'খবর পাঠিয়ে দিয়েছি,' উত্তরে রানাকে বলল বোথাস। 'বোর্ডিং পার্টি অপেক্ষা করছে ওখানে। বন্দরে তো বটেই, সেই সাথে ক্যানেরিতেও। মেডিটেরেনিয়ানের টেনথ্ ফ্লিটকেও সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, মিনারভা কোর্স বদলে অন্য কোন দিকে চলে যাবার চেষ্টা করলে বাধা দেয়া হবে। মিনারভা গালভেস্টনে পৌঁছুলে ড্রাগস সাপ্লাইয়াররাও ভিড় করে আসবে, তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্যেও ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছে। আমার না গেলেও চলবে, তবু যাব। ভাল কথা, মেজর রানা, আমার একটা কৌতূহল আছে।'

'বলুন।'

'পেরিয়াস যে একজন ইনফরমার, সেটা আপনি জানলেন কিভাবে?'

'খুঁত খুঁতে ভাবটা আসে ডলফিন সার্চ করার সময়। রেডিও কেবিনের ট্র্যান্সমিটার, এবং আপনার অফিসের ট্র্যান্সমিটার একই ফ্রিকোয়েন্সিতে সেট করা ছিল। তখন মনে হয়েছিল, আপনাদের তিনজনের যে-কেউ ইনফরমার হতে পারেন। কিন্তু বেন জানাল, ডলফিনের নোঙর ফেলা থেকে নোঙর তোলা পর্যন্ত সারাটা সময় আপনার রেডিওর সামনে একা বসে ছিল পেরিয়াস। আপনি আর কর্নেল রেনো যখন মশার কামড় খেয়ে ভিলার ওপর চোখ রাখছেন, পেরিয়াস তখন আরামে বসে বিয়ারের গ্লাসে চুমুক দিচ্ছে আর অ্যাডমিরাল কেসারলিংকে আপনাদের গতিবিধির সমস্ত খবর পাচার করছে। সেজন্যেই জাহাজটাকে সম্পূর্ণ খালি দেখতে পাই আমি। জাহাজ থেকে সাবমেরিনকে ছাড়াবার কাজে ব্যস্ত ছিল সবাই। ক্যাপ্টেন কোন পাহারা বসায়নি, কারণ পেরিয়াস তাকে গ্যারান্টি দিয়ে জানিয়েছিল আপনারা ভিলার ওপর নজর রাখছেন, জাহাজে ওঠার কোন পরিকল্পনা করেননি। আর আমরা আপনাকে বলেছিলাম তীর থেকে জাহাজের ওপর নজর রাখব, ওটাতে চড়ার কথা বলিনি। বললে অবশ্যই বাধা দিতেন আপনি।'

'দুঃখিত, দুঃখিত, মেজর রানা। বুঝতে ভুল হয়েছিল আমার।' দুঃখ প্রকাশ করতে হলো বলে, তাও একজন মেজরের কাছে, বোথাসের চেহারাটা বেশ খানিকটা ম্লান দেখাল। 'আরও একটা কৌতূহল, মেজর রানা। মিনারভার কথা কোত্থেকে জানলেন আপনি?'

'এয়ারফোর্সের ট্রাকটা ফিরিয়ে দেবার জন্যে ব্র্যাডি ফিল্ডে যেতে হয়েছিল আমাদের,' বলল রানা। 'গিয়ে দেখি, কর্নেল কোসকি আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মর্নিং পেট্রলের চোখে ধরা পড়েছিল মিনারভা, তথ্যটা জানিয়ে দিল সে আমাকে। এরপর আমরা মুনমুন লাইন্সের এথেন্স এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করি। সাথে সাথে কার্গো আর ডেসটিনেশন জানা হয়ে গেল। ডলফিনের মত মিনারভাও থাসোস হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে শুনে অ্যাডমিরাল কেসারলিঙের কৌশলটা ধরে ফেললাম। বুঝলাম, ডলফিন থেকে ছাড়িয়ে সাবমেরিনটাকে মিনারভার সাথে জোড়া লাগানো হবে।'

'এসব কথা আমাকে জানানো উচিত ছিল,' একটু গম্ভীর হয়ে বলল ইন্সপেক্টর।

'মি. বেন আমার অফিসে এসে বললেন, টানেল হয়ে আন্ডারওয়াটার ঘাঁটিতে নামার একটা এলিভেটর পাওয়া গেছে। বিশ্বাস করুন, দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিলাম। একবার ভাবুন তো, মি. বেনের কথা হেসে উড়িয়ে দিয়ে তাকে আমি যদি গ্রেফতার করতাম, কি হত? আমাকে জানানো উচিত ছিল না?'

'যত কম লোক জানে ততই ভাল, আমার কাজের এটাই ধারা। আপনাকে জানালে পেরিয়াস কিছু একটা সন্দেহ করতে পারত। সাবধান হয়ে যেত সে।'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও মাথা ঝাঁকিয়ে যুক্তির কাছে হার মানল বোথাস। 'তা অবশ্য ঠিক।'

ইতিমধ্যে ফন হামেল ওরফে অ্যাডমিরাল কার্ট কেসারলিংকে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে দিয়েছে বোথাসের লোকেরা। নির্দিষ্ট কারও দিকে না তাকিয়ে বিড় বিড় করে কি যেন বকছে বুড়ো জার্মান, কেউ শুনতে পেল না। বেন গুলি করার পর থেকে পেরিয়াসও তার জায়গা থেকে নড়েনি। তার হাতেও হ্যান্ডকাফ পরানো হয়েছে। বিশাল দৈত্যটা মাথা নিচু করে আছে।

তাকে দেখিয়ে জানতে চাইল রানা, 'ওর কি দশা হবে?'

'বিচার শেষ হতে পাঁচ-সাতদিনের বেশি লাগে না,' বলল বোথাস। 'এখুনি লিখে দিতে পারি, ওর কপালে ফায়ারিং স্কোয়াড ঝুলছে।'

বোথাসের লোকেরা বুড়ো শয়তান কেসারলিং আর পেরিয়াসকে নিয়ে চলে গেল।

বেন বলল, 'রানা, চোখের মণি বিজ্ঞানীদের কি হলো ভেবে কমান্ডার হ্যানিবল বোধহয় নিজের মাথার চুল ছিঁড়ছেন। তুমি বললে, ওদেরকে নিয়ে আমি নাহয়···'

ডেক হ্যাচ থেকে উঠে এল খালেদ। তার পিছু পিছু ডিক, সিকো, লিন আর নিমো।

'ইশ্,' দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রানা। 'একটা কথা একদম ভুলে গেছিলাম!'

'কি?'

বিজ্ঞানীদের দিকে ফিরল রানা। 'সিকো, তুমি এদিকে এসো।'

দ্রুত এগিয়ে এসে রানার সামনে হাঁটু গেড়ে বসল মেরিন বায়োলজিস্ট। 'বলুন, মেজর।'

'আমার শুভেচ্ছা আর উপহার কমান্ডার হ্যানিবলকে পৌঁছে দিতে হবে তোমার,' বলল রানা।

'অবশ্যই, মেজর!'

'ওদিকের গুহায়, বিশ ফুট নিচে, উত্তর দেয়ালের গোড়া বরাবর কয়েকটা ছোট ফাটল আছে। একটা ফাটলের মুখে দেখতে পাবে সমতল পাথর। এরমধ্যে যদি বেরিয়ে গিয়ে না থাকে, ওর ভেতর একটা টীজার মাছ দেখতে পাবে তুমি। সেটাই আমার উপহার।'

হতভম্ব দেখাল সিকোকে। 'টীজার আছে! আপনি সিরিয়াস, মেজর?'

'টীজারের এত ছবি দেখেছি, জ্যান্ত একটা দেখে চিনতে পারব না সেটা একটা কথা হলো?' ঠাট্টার সুরে পাল্টা প্রশ্ন করল রানা। 'দেখো, ধরতে গিয়ে ওটাকে যেন পালিয়ে যেতে দিও না।'

'এখন আমি নেট পাই কোথায়!' সবার দিকে অসহায় ভাবে তাকাল সিকো।

'নেটের কোন দরকার নেই,' হেসে উঠে বলল রানা। 'টীজার বন্দী করার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো, ওটার ফিন চেপে ধরা।'

পায়ের ব্যথাটা আবার কমতে শুরু করেছে। অসাড় ভাবটা ফিরে আসছে ধীরে ধীরে। খানিক পর মনে হলো, পা-টা যেন ওর শরীরের কোন অংশ নয়।

স্ট্রেচার নিয়ে আসা হলো। তাতে তোলা হলো রানাকে। 'ইন্সপেক্টর বোথাস,' হঠাৎ জানতে চাইল ও, 'মেয়েটার আসল নাম?'

'ক্রিস্টি। নার্সিঙের ট্রেনিং নেয়া আছে ওর, কাজেই আপনার সেবা শুশ্রূষার কোন অসুবিধে হবে না।' মুচকি একটু হাসল বোথাস।

'ধন্যবাদ,' বলেই চোখ বুজল রানা। বোধহয় জ্ঞান হারিয়ে ফেলল।

* * * *

A. H. M. Mohit
Boi Lover's Pulapan